পলাশি থেকে ধানমণ্ডি

পলাশি থেকে ধানমণ্ডি

[প্রথম খণ্ড]

মনযূর আহমাদ

চেতনা
প্রকাশন

বই : পলাশি থেকে ধানমণ্ডি (১-৩)
লেখক : মনযূর আহমাদ
প্রকাশকাল : মে, ২০২৪ খ্রি.
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ
✆ ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার

Polashi Theke Dhanmondi by Manzur Ahmad
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657, 01303-855 225

শুরুর কথা

সিন্ধু থেকে বঙ্গ প্রকাশিত হওয়ার পর দুবছর পার হয়েছে। মাঝের এ সময়টায় পাঠকরা নানাভাবে এই কাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করেছেন। ইতিমধ্যে বোদ্ধা মহলে ইতিহাসের কিছু বিষয় নতুন করে পর্যালোচনার ডাক উঠেছে। বইটির সবচেয়ে বড় সাফল্য নতুন প্রজন্মের একাংশ নিজেদের ইতিহাসকে আপন করে নিয়েছে, শেকড়ের সন্ধানে গবেষণায় ব্রত হয়ে উঠছে অনেকে। বইটি পাঠককে ভাবতে শেখাক এটাই ছিল আমাদের চাওয়া। সম্ভবত এ উদ্দেশ্যে বইটি কিছুটা হলেও সফলতা পেয়েছে। *সিন্ধু থেকে বঙ্গ* যে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দায়বদ্ধতা বেড়েছে। আমরা হয়েছি আরও সতর্ক ও ধীর। সিন্ধু থেকে বঙ্গের দুবছর পর প্রকাশিত হচ্ছে *পলাশি থেকে ধানমণ্ডি*। এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত নয়, বাস্তবতা।

সিন্ধু থেকে বঙ্গ ধারণ করেছে ইতিহাসের এক বৃহৎ ক্যানভাস। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষদিকে আমরা পৌঁছেছিলাম মুগল শাসনামলে। পলাশি থেকে ধানমণ্ডির সূচনা হয়েছে মুগল আমলের শেষ সময় থেকে। সম্রাট আলমগিরের ইন্তেকালের পর মুগল সাম্রাজ্যকে যে ঘুণপোকা ঘিরে ধরে পরবর্তী কয়েক দশকে তা আরও বেগবান হয়। এ সময় গড়ে ওঠে আঞ্চলিক নবাবি শাসন। বাহ্যত দিল্লির সম্রাটের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল থাকলেও কাজকর্মে তারা ছিল অনেকটাই স্বাধীন। এমনকি তাদের কেউ কেউ সামরিক শক্তিতে মুগল সম্রাটের চেয়েও এগিয়ে ছিল। সময়টা ছিল অস্থির। একদিকে মারাঠা বর্গিদের উপর্যুপরি আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙ্গালা, অন্যদিকে ক্রমেই শক্তি অর্জন করছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলো। এই সময়টায় মুগলরা তাদের প্রভাব হারাতে থাকে, একের পর এক হাতছাড়া হয় বিভিন্ন শক্তিশালী রাজ্য। এ সময়কার প্রধানতম ইলমি ব্যক্তিত্ব শাহ ওয়ালিউয়ল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তিনি বারবার শাসকদেরকে সতর্ক করে পত্র লিখছিলেন।

পলাশি থেকে ধানমণ্ডির শুরুতে পাঠক মুখোমুখি হবেন উত্তাল ভারতবর্ষের। একদিকে পতনোন্মুখ মুগল সাম্রাজ্য, অন্যদিকে ঘাপটি মেরে থাকা ইউরোপীয় শক্তি। উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল যাকে বলেছেন এনার্কি, সম্ভবত এই শব্দটিই তখনকার সার্বিক পরিস্থিতি সবচেয়ে নির্মহভাবে তুলে ধরেছে। দুঃখজনকভাবে সত্য অস্থির এই সময়ের ইতিহাস নিয়ে বাংলায় যথেষ্ট কাজ হয়নি। যেই কাজগুলো হয়েছে সেখানে তথ্যের অভাব, দুর্বল তথ্যসূত্র, কিংবা উপস্থাপনার

দুর্বলতা প্রায়শই চোখে পড়ে। বক্ষ্যমাণ বইটিতে যেমন বিশুদ্ধ তথ্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে তেমনই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ভাষাগত জটিলতা। প্রচলিত বইপত্রে প্রায়শই দেখা যায় লেখকরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। হিন্দু লেখকদের কলমে থাকে মুসলমান শাসকদের প্রতি অন্যায় বিষোদগার ও নানা অপবাদ। মুসলমান লেখকরাও হন প্রান্তিকতার শিকার। মুসলিম শাসকদের যেকোনো অন্যায় অপবাদ ঢাকতে তারা হয়ে উঠেন মরিয়া। দুপক্ষের এই অযৌক্তিক রেষারেষিতে প্রায়ই ইতিহাস পরিণত হয় এক চোরাপথে যেখানে পাঠক হারিয়ে যান বিভ্রান্তির অতলে। মনযূর আহমাদ সাফল্যের সাথে এ পরিণতি এড়াতে পেরেছেন। তিনি বেছে নিয়েছেন সরল ভারসাম্যপূর্ণ পথ। কারও ওপর যেমন অন্যায় অপবাদ দেননি, তেমনই কারও অপরাধ ঢাকার চেষ্টাও করেননি। পরবর্তী মুগলদের অযোগ্যতা ও ভোগলিপ্সার নিপুণ চিত্র ফুটে উঠেছে তার কলমে।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন পতনের প্রথম ধাপ বলা যায় পলাশির যুদ্ধকে। যদিও বইটির সূচনা হয়েছে আরও পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনাপ্রবাহ থেকে, তবু লেখক নামকরণের জন্য বেছে নিয়েছেন পলাশিকেই। এখানে পাঠক স্পষ্ট বার্তা পান লেখক আলোচনা করতে চলেছেন পতনকালের ইতিহাস। পলাশির যুদ্ধ ও নবাব সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র বিচার নিয়ে গত দুইশত বছর ধরে লেখালেখি হচ্ছে। ইংরেজ ও ভারতীয় উভয়পক্ষই এ বিষয়ে লিখেছেন। ভারতীয় লেখকদের কেউ কেউ ইংরেজ লেখকদের অন্ধ অনুসরণ করেছেন আবার কেউ ইংরেজদের অন্ধ বিরোধিতাকেই সমাধান ভেবেছেন। কিন্তু দুই অবস্থানের কোনোটিই ধ্রুব নয়। তথ্যের নিখুঁত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবল সত্যের কাছাকাছি পৌঁছা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন নির্মোহভাবে সকল পক্ষের আলোচনা সামনে রেখে বিশ্লেষণ করা।

পলাশির যুদ্ধ ও সিরাজুদ্দৌলার পতন অংশে আমরা এই মূলনীতি সামনে রেখেই কাজ করেছি। কিছু তথ্য পাঠকের কাছে নতুন মনে হতে পারে কিংবা বিশ্লেষণের সাথে দ্বিমতও রাখতে পারেন। যেকোনো ইলমি দ্বিমতকে আমরা আনন্দের সাথে স্বাগত জানাই। কারণ জ্ঞানকে যখন নানা মাত্রা থেকে পর্যালোচনা করা হয় তখনই জ্ঞান তার স্বমহিমায় বিকশিত হয়। ইতিহাসের তথ্য ধ্রুব হলেও বিশ্লেষণ কিন্তু ধ্রুব নয়।

ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রেও লেখকদের মাঝে দ্বিধা ও সংশয় লক্ষ করা যায়। প্রায়ই তাদের লেখা ইংরেজদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে পরিণত হয়। সেখানে অনুপস্থিত থাকে ব্রিটিশদের শোষণ, অত্যাচার, ভারতীয় মুসলমানদের মানসিক কষ্টের কথা। ফলে ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, লর্ড ম্যাকলের শিক্ষানীতি, ভারতীয় রেলপথ নির্মাণ, এসব বিষয় আলোচনা হলেও

এড়িয়ে যাওয়া হয় ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মসমাজ ও রাজনীতি ভাবনা। মনযূর আহমাদ দক্ষতার সাথে এ সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন লেখকদের রচনাবলি, আত্মজীবনী, সাময়িকপত্র ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছেন। তার লেখায় দ্বিধার ছাপ নেই, সেখানে আছে সত্য প্রকাশের অনমনীয় ঋজু ভাব।

খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, দেশভাগ ইত্যাদি ইস্যুগুলো একদিকে যেমন স্পর্শকাতর অপরদিকে এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। প্রচলিত ইতিহাসে মিথ্যা ও বাস্তবতার মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় প্রায়ই। বক্ষ্যমাণ বইতে চেষ্টা করা হয়েছে বিভ্রান্তির চাদর সরিয়ে সত্যের ওপর আলো ফেলার। পাঠক হয়তো প্রথমে চমকে উঠবেন, পুরোনো বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক তথ্য দেখে দ্বিধান্বিত হবেন, কিন্তু একটু সচেতন হয়ে এ বিষয়ে পড়াশোনা করলে দেখা যাবে বইতে নতুন কিছুই বলা হয়নি; বরং অনাদরে পড়ে থাকা তথ্য তুলে এনে মালা গাথা হয়েছে মাত্র।

দেশভাগের যে বিস্তৃত পটভূমি তার মনোজ্ঞ বিবরণ পাঠককে মুগ্ধ করবে। সমকালীন সকল রাজনীতিবিদ ও তাদের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে নির্মোহভাবে। তুলে ধরা হয়েছে নানা অপপ্রচারের ফাঁক-ফোকর। বিশেষত সমকালীন হিন্দু চিন্তাধারার সাথে পাঠককে পরিচয় করানো হয়েছে নানা তথ্যের ভেতর দিয়ে। দেশভাগ এড়ানো যেত কিনা কিংবা এর মূলদায়ভার কার—সেই প্রশ্ন চলছে গত সত্তর বছর ধরে। প্রতিটি পক্ষ নিজেদের দলিল উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করে চলছে স্বমহিমায়। এই বইতে লেখক সবগুলো বিষয় সামনে রেখে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিবিশেষের ওপর দোষ চাপানোর পরিবর্তে তুলে ধরেছেন সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের নানা দিক। দেশভাগের সাথে জড়িয়ে আছে ভাষা-সংক্রান্ত জটিলতার মূল উৎস। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, আলেম-সমাজ ও মুসলমানদের ভূমিকার উজ্জ্বল দিকটি উঠে এসেছে বক্ষ্যমাণ বইতে। ফরমায়েশি ইতিহাসে এড়িয়ে যাওয়া অনেক সত্য তুলে আনা হয়েছে নিপুণ দক্ষতায়।

বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্ভবত একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ। এই যুদ্ধকে প্রায়ই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধী ভূমিকায় এনে দাঁড় করানো হয়। চিত্রায়ণ করা হয় এমন এক ইতিহাস, সত্যের সাথে যার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বিশেষ করে আলেম-সমাজকে নেতিবাচক উপস্থাপন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান এক শ্রেণির লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিকর্মীরা। তাদের এ অপপ্রচারের মুখে এই বইটি জোঁকের মুখে লবণের কাজ করবে। বইটি পাঠে পাঠক জানতে পারবেন মুক্তিযুদ্ধে আলেম-সমাজের

নৈতিক অবস্থান, ভূমিকা ও পদক্ষেপ। বিশেষ করে আলেমদের অন্যতম প্রধান দল জমিয়তের যুদ্ধকালীন ভূমিকা বেশ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ শোষণের হাত ধরে কী করে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং জন্মের মাত্র ২৩ বছরের ভেতর সে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, এর পেছনে কী কী প্রেক্ষাপট ক্রিয়াশীল থাকে, এই গ্রন্থে রয়েছে তার সবিস্তার আলোচনা। ফলত, মুগল শাসনের পতনের মধ্য দিয়ে বইয়ের আলোচনা শুরু হয় এবং এর সমাপ্তি ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের উদয়ের মধ্য দিয়ে। সিন্ধু অববাহিকার নির্জন বালুকাভূমি থেকে সূচনা হওয়া আলোচনা সমাপ্তিবিন্দুতে পৌঁছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে।

বইটি শুধু নতুন তথ্য জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং পাঠককে ভাবতে শেখায়, তার সামনে খুলে দেয় জ্ঞানের বদ্ধ দুয়ার।

প্রকাশক

বর্ণনাধারা...

📖 **প্রথম অধ্যায় : অস্তাচলে মোগল শাসন**

সম্রাট আলমগিরের তিরোধানের পর ২১
আজমের ব্যর্থতা ও তার কারণসমূহ ২২
কাম বখশের ব্যর্থতার কারণ ২৬
শাহ আলম বাহাদুর শাহের শাসনকাল ২৮
বাহাদুর শাহ উদাসী চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন ২৯
মন্ত্রীর পদে ভুল নির্বাচন ২৯
জাহাঁদার শাহের পরাজয় ৩১
ফররুখ সিয়ারের শাসনকাল ৩২
আসাদ খান ও জুলফিকার খানের শোচনীয় পরিণতি ৩৩
ফররুখ সিয়ারের দিল্লি প্রবেশ ৩৪
ফররুখ সিয়ারের সঙ্গে সৈয়দ পরিবারের দ্বন্দ্ব ৩৭
ষড়যন্ত্র ও দুমুখো নীতির সূচনা ৩৮

▶ **প্রথম পরিচ্ছেদ : মুহাম্মদ শাহের শাসনকাল** ৪০

জয় সিংয়ের সাথে আপস ৪০
গিরিধর বাহাদুরের সাথে সন্ধি ৪০
নিজামুল মুলকের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত ৪১
সৈয়দদ্বয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ ৪৩
নিজামুল মুলক দাক্ষিণাত্যে ৪৫
দেলোয়ার আলি খানের পরাজয় ৪৭
নিজামুল মুলকের নামে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারির ফরমান ৪৮
হোসেন আলি খানের প্রাণনাশ ৫০
দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে নিজামের আচরণ ৫৩
নিজামুল মুলকের মন্ত্রিত্ব ৫৬
সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রীর মতবিরোধ ৫৮
মুহাম্মদ শাহের ঘনিষ্ঠ সহচরবৃন্দ ৫৯
নিজামুল মুলকের সংস্কারপ্রস্তাব ৬২

মালোহ ও গুজরাটের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ৬৩
নিজামুল মুলকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত..... ৬৪
সাম্রাজ্যের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি ৬৫
নিজামুল মুলক আবার দাক্ষিণাত্যে ৬৬
নিজামের বিরুদ্ধে মুবারেজ খানকে প্ররোচনা ৬৭
নিজামুল মুলক পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত ৭০
মুবারেজ খানের পরাজয় ৭১
সম্রাটের নামে নিজামুল মুলকের পত্র ৭৩
নিজামুল মুলকের মালোহ ও গুজরাট থেকে পদচ্যুতি ও দাক্ষিণাত্যে নিয়োগ লাভ..... ৭৪
আসফিয়া রাজ্যের স্বরাজ ৭৪
সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ও দাক্ষিণাত্যের বিচ্ছিন্নতার কারণসমূহ ৭৫

▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নিজামুল মুলক আসফজাহ ৮৩

আসফিয়া রাজ্য ও মোগল সাম্রাজ্যের সম্পর্কের ধরন ৮৩
দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে দ্বন্দ্ব ৮৭
উত্তর ভারতের পরিস্থিতি ৯৩
গুজরাটে মারাঠাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ৯৮
মালোহ প্রদেশে মারাঠা আধিপত্য ১০১
বুন্দেলখণ্ডে মারাঠা আধিপত্যের বিস্তৃতি ১০৪
মারাঠাদের দিল্লি আক্রমণ..... ১০৫
নিজামুল মুলক দিল্লিতে ১১১
নাদির শাহের আক্রমণ ১১৫

▶ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ১৩৪

বিশৃঙ্খল ভারতে আবদালির অভিযান..... ১৩৪
যুদ্ধের পটভূমি..... ১৩৪
ঐতিহাসিক ময়ূর সিংহাসন ১৩৫
ভারতবর্ষে মারাঠা সম্প্রদায়ের অধিভুক্ত অঞ্চল..... ১৩৫
আবদালির ভারত অভিযান ১৩৫
আহমদ শাহ আবদালি ১৩৫
মারাঠা-আফগান খণ্ডযুদ্ধ ১৩৬
মারাঠা নেতৃত্বের পরিবর্তন..... ১৩৬
মারাঠা অধিপতি সাদাশিভরাও ভাও..... ১৩৭
দুই বাহিনীর বিবরণ ১৩৭

তৃতীয় যুদ্ধ ১৩৮
যুদ্ধের ফলাফল ১৩৮
তিনটি যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে এই পানিপথ প্রান্তর ১৩৯

📖 দ্বিতীয় অধ্যায় : বেনিয়া থেকে রাজা

পর্তুগিজদের আগমন ১৪১
ভারতের প্রথম পর্তুগিজ প্রতিনিধি ১৪২
পর্তুগিজদের পতনের কারণ ১৪৩
ভারতে ওলন্দাজরা ১৪৩
দিনেমারদের আগমন ১৪৪
ইংরেজদের ভারতে আগমন ১৪৪
ফরাসি বণিকদের আগমন ১৪৭

▶ প্রথম পরিচ্ছেদ : ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব : ব্রিটিশের উত্থান ১৪৮
ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের সময় ভারত ১৪৮
ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষ ১৪৮
প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ, ১৭৬৪-৪৮ খ্রি. ১৪৮
দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ, ১৭৪৮-১৭৫৪ খ্রি. ১৪৯
জোসেফ ডুপে ১৫০
ডুপ্লের কৃতিত্ব ১৫১
তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ, ১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রি. ১৫১
ফরাসিদের বিফলতার কারণ ১৫২

▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বঙ্গে ব্রিটিশের অভ্যুত্থান ১৫৪
বঙ্গের নবাবরা ১৫৪
নবাব আলিবর্দি খান : ১৭৪০-৫৬ খ্রি. ১৫৪
সিরাজুদ্দৌলা : ১৭৫৬-৫৭ খ্রি. ১৫৬
ইংরেজদের সাথে সিরাজের সংঘর্ষের কারণ ১৫৮
কলকাতা অধিকার ১৬১

▶ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পলাশির যুদ্ধ ১৬৫
পলাশির যুদ্ধ ১৬৫

▶ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের কারণ ১৭২
পলাশি যুদ্ধের ফলাফল ১৭২
সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র বিচার ১৭৩

সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রের সমালোচনা ১৭৫
সিরাজুদ্দৌলার শেষ সময় ১৮২
তরবারি আর ছুরি দিয়ে হত্যা করা হলো সিরাজকে ১৮৩
সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা ১৮৪
মির জাফর : ১৭৫৭-৬০ খ্রি. ১৮৭
মির জাফরের পতন ১৮৮
মিরনের বর্বরতা ১৯০
মির কাসিম : ১৭৬০-৬৪ খ্রি. ১৯০
মির কাসিমের কার্যাবলি ১৯১
ইংরেজদের সাথে মির কাসিমের সংঘর্ষের কারণ ১৯২
কোম্পানির দেওয়ানি লাভ (১৭৬৫ খ্রি.) ১৯৩
ক্লাইভের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ১৯৪
ক্লাইভের অন্যান্য সংস্কার ১৯৪
ক্লাইভের কৃতিত্ব-বিচার ১৯৫
ক্লাইভের স্বদেশ গমনের পর বঙ্গদেশ ১৯৫

▶ পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হায়দার আলির অভ্যুদয় ১৯৬
প্রথম মহীশূর যুদ্ধ ১৯৭

▶ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ গভর্নর ১৯৭
ওয়ারেন হেস্টিংসের ক্ষমতা লাভ ১৯৮
হেস্টিংসের ব্যর্থতা ১৯৮
হেস্টিংসের শাসনসংস্কার ১৯৯
হেস্টিংসের অযোধ্যানীতি ২০০
রোহিলা যুদ্ধ (১৭৭৩-৭৫ খ্রি.) ২০১
রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩ খ্রি.) ২০২
হেস্টিংস ও পরিষদ ২০৩
হেস্টিংস ও নন্দকুমার ২০৪
হেস্টিংসের পররাষ্ট্রনীতি ২০৫
প্রথম মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫ খ্রি.) ২০৫
দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০-৮৭ খ্রি.) ২০৭
হায়দার আলির চরিত্র ও কৃতিত্ব ২০৯
হেস্টিংস ও চৈতসিংহ : অনৈতিকতা ও জুলুমের আরেক দৃষ্টান্ত ২০৯
হেস্টিংস ও অযোধ্যার বেগম ২১০
পিটের ভারতীয় আইন (১৭৮৪ খ্রি.) ২১০

হেস্টিংসের পদত্যাগ ও ইম্পেচমেন্ট ২১০
হেস্টিংসের কৃতিত্ব-বিচার ২১১
লর্ড কর্নওয়ালিস ২১৪
লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনসংস্কার ২১৪
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রি.) ২১৭
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-গুণ ২১৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ২১৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ২২০
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মুসলিমরা ২২১
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষত্রুটি ২২২
পররাষ্ট্রনীতি ২২২
তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ ২২৩
স্যার জন শোর : ১৭৯৫-৯৮ খ্রি. ২২৫
লর্ড ওয়েলেসলি ২২৬
ওয়েলেসলির সমস্যা ২২৭
ওয়েলেসলির লক্ষ্য ও নীতি ২২৭
বৈদেশিক নীতি ২২৭
চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ : ১৭৯৯ খ্রি. ২২৮
টিপু সুলতানের কৃতিত্ব ও চরিত্র ২২৮
ওয়েলেসলির সম্প্রসারণনীতি ২৩১
ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ২৩২
ওয়েলেসলির মারাঠানীতি ২৩২
দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ২৩৩
হোলকারের সাথে যুদ্ধ ২৩৪
ওয়েলেসলির কৃতিত্ব ২৩৪

▶ সপ্তম পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ প্রাধান্যের পরিপূর্ণতা মারাঠা শক্তির পতন ২৩৬

লর্ড কর্নওয়ালিস ২৩৬
স্যার জর্জ বার্লো : ১৮০৫-০৭ খ্রি. ২৩৬
লর্ড মিন্টো : ১৮০৭-১৩ খ্রি. ২৩৭
রণজিৎ সিংহ ও শিখ জাতির অভ্যুত্থান ২৩৮
১৮১৩ সালের সনদ ২৪০
লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংস : ১৮১৩-১৮২৩ খ্রি. ২৪১
গুর্খাদের সাথে যুদ্ধ (১৮১৪-১৮১৬ খ্রি.) ২৪১

পিন্ডারি যুদ্ধ ২৪২
তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ ২৪৩
রাজপুতনায় ব্রিটিশ প্রাধান্য ২৪৪
লর্ড হেস্টিংসের সংস্কার ২৪৪
মারাঠাদের পতনের কারণ ২৪৫
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ২৪৬
সূচনা ২৪৬
লর্ড আমহার্স্ট : ১৮২৩-২৮ খ্রি. ২৪৭
প্রথম ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধ (১৮২৪-৩৪ খ্রি.) ২৪৭
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক : ১৮২৮-৩৫ খ্রি. ২৪৮
বেন্টিংকের সংস্কারকার্যাদি ২৪৯
বেন্টিংকের পররাষ্ট্রনীতি ২৫১
১৮৩৩ সালের সনদ ২৫১
স্যার চার্লস মেটকাফ : ১৮৩৫ খ্রি. ২৫২
লর্ড অকল্যান্ড : ১৮৩৬-৪২ খ্রি. ২৫২
▶ অষ্টম পরিচ্ছেদ : আফগান-নীতি ২৫৬
প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ ২৫৪
লর্ড এলেনবরা : ১৮৪২-৪৪ খ্রি. ২৫৬
সিন্ধু বিজয় ২৫৬
গোয়ালিয়রের যুদ্ধ ২৫৭
শাসনসংস্কার ২৫৮
লর্ড হার্ডিঞ্জ ২৫৮
প্রথম শিখযুদ্ধ ২৫৮
লর্ড ডালহৌসি : ১৮৪৮-১৮৫৭ খ্রি. ২৫৯
১. যুদ্ধের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার ২৫৯
দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ ২৫৯
দ্বিতীয় বার্মাযুদ্ধ ২৬১
২. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ দ্বারা রাজ্য জয় ২৬১
৩. 'কুশাসনের' অভিযোগ ও রাজ্যজয় ২৬২
ডালহৌসির শাসনব্যবস্থা ২৬৩
১৮৫৩ সালের সনদ ২৬৪
লর্ড ডালহৌসির কৃতিত্ব-বিচার ২৬৪

📖 তৃতীয় অধ্যায় : পলাশিপূর্ব বাংলা

▶ প্রথম পরিচ্ছেদ : মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান ২৬৫

▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভাষা ও সাহিত্য : যে কারণে মৌল বৈশিষ্ট্য হারায় ২৭৬

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয় ২৭৯

📖 চতুর্থ অধ্যায় : বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্তির পশ্চাৎ পটভূমি

▶ প্রথম পরিচ্ছেদ : পলাশির যুদ্ধের পর মুসলিম সমাজের দুর্দশা ২৮৫

১. নবাব ২৮৮
২. সম্ভ্রান্ত বা উচ্চশ্রেণির মুসলিম.....২৮৮
৩. নিম্নবিত্তশ্রেণির মুসলিম : কৃষক ও তাঁতি.....২৯২
তাঁতি.....২৯৪

▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলার মুসলিম শাসন পতনের রাজনৈতিক কারণ ২৯৮
সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা.....৩০৫

▶ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পলাশির পর ইংরেজ ও হিন্দুদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূচনা ৩০৮

▶ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পলাশির যুদ্ধ ও সম্পদ পাচার ৩২৮
সম্পদ পাচারের সূত্রপাত.....৩৩৩

▶ পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলায় গণবিদ্রোহ ৩৪০
ফকির ও কৃষক বিদ্রোহ.....৩৪০
ফরায়েজি ও জিহাদ আন্দোলন.....৩৪২
তিতুমিরের লড়াই.....৩৪৫
১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ৩৪৭
আপসহীন বিপ্লবী ধারার অবসান.....৩৫০

▶ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উনিশ শতকের কলকাতায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাষাবাদ ৩৫১

📖 পঞ্চম অধ্যায় : পলাশির পরবর্তী আন্দোলন [১৭৬০-১৮০০]

▶ প্রথম পরিচ্ছেদ : নবাব নুরুদ্দিন মুহাম্মদ বাকের জং ৩৬১

ক. 'জাগো বাহে কোনঠে সবাই' ৩৬১
খ. তার রাজধানী ছিল কোথায়? ৩৬২
গ. ব্রিটিশদের ঘৃণ্য ইতিহাসবিকৃতি ৩৬৩
ঘ. কী জঘন্য মানসিকতা! ৩৬৪
ঙ. নবাব নুরুদ্দিন বাকের জং ৩৬৫

▸ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতিরোধ আন্দোলন ৩৬৬

রংপুরের ঐতিহাসিক পরিচয় ৩৭০
রেশমশিল্পের আদিপিতা ৩৭১
রেশমশিল্পের উৎসভূমি ৩৭২

▸ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাঙালির চারিত্রিক অবনতি ও তার কারণ এবং নেশাকর দ্রব্যের প্রচলন ৩৭৫

বাঙালির শরীর ও সৌন্দর্যের অবনতি ৩৭৯
নামবিকৃতির সূচনা ৩৮২
সুলতানা আমিরন নেসা ওরফে আজিজন ৩৮৩

তৃতীয় অধ্যায়

পলাশিপূর্ব বাংলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান

বাংলার মুসলিমদের বিপর্যয় কোন কোন পথে নেমে এসেছিল এবং রঙ্গমঞ্চের অন্তরাল থেকে কোন অশুভ শক্তি ইন্ধন জোগাচ্ছিল, তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে আমাদের জানতে হবে, সেকালে তাদের ধর্মবিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতি কতখানি মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেছিল ও কীভাবে মারাত্মক বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাংলার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় থেকে। হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের দ্বারা পুষ্ট ও পরিবেষ্টিত সভাসদ দ্বারা পরিচালিত হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের[১] প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণববাদের প্রবল প্লাবন বাংলার মানবসমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমকে সহজেই আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছিল হিন্দু তান্ত্রিকদের যৌনাবেদনময়ী অশ্লীল ও জঘন্য সাধন পদ্ধতি—বামাচারীদের পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ যৌনধর্মী নোংরা আচার-অনুষ্ঠান, বৈষ্ণব-প্রেমলীলা প্রভৃতি। এসব আচার-অনুষ্ঠান ও প্রেমলীলা হিন্দু সমাজের বোধের পরিচ্ছন্নতা, রুচির শিষ্টতা ও নৈতিক অনাবিলতা বহুলাংশে বিনষ্ট করলেও নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গের এ কৌশলে ধর্মবিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়েছিল এ সময়ের মুসলিম নামধারী কবি-সাহিত্যিকরা—যাদের তারা

১. চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) ছিলেন পূর্ব ও উত্তর ভারতের এক বহু লোকপ্রিয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছিলেন শ্রীমদ্ভগবৎ পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযোগ ভগবৎ দর্শনের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা ও প্রচারক।

কাষ্ঠপুত্তলিকাস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন—বাংলা ভাষার উন্নয়নের নামে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু রেনেসাঁস আন্দোলনের ধ্বজাবাহীরা। দ্বিতীয় যুগের হিন্দু কবিদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এসব মুসলিম কবি হিন্দু দেব-দেবীর স্তুতিমূলক কবিতা, পদাবলি ও সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়। তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা, যৌন আবেদনঘন কীর্তন, মনসার ভাসান সংগীত, দুর্গা ও গঙ্গার স্তোত্র ও হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে বহু পুথিপুস্তক রচনা করে।

শেখ ফয়জুল্লাহ 'গোরক্ষ বিজয়' নামক একখানা মহাকাব্য রচনা করে। এটি ছিল বাংলার নাথ সম্প্রদায় ও কলকাতা কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গোরক্ষ নাথকে নিয়ে, যার নাথ অনুরক্তরা সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র রচনা করে।[২] অনুরূপ আবদুস শুকুর ও সৈয়দ সুলতান শৈব ও তান্ত্রিক মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে সাহিত্য রচনা করে।[৩]

কবি আলাউল ও মির্জা হাফেজ যথাক্রমে শিব ও কালীর স্তবস্তুতি বর্ণনা করে কবিতা রচনা করে।[৪] সৈয়দ সুলতান নবি বংশের তালিকায় ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণকে সন্নিবেশিত করে।[৫] হোসেন শাহের আমলে সত্যনারায়ণকে সত্যপীর নাম দিয়ে মুসলিমরা পূজা শুরু করে।

উপর্যুক্ত কবি-সাহিত্যিকদের ধর্মমত ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছু জানার উপায় নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু তাদের নাম পাওয়া যায়। হয়তো তারা ধর্মান্তরিত মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে মাত্র এবং পরিপূর্ণ হিন্দু পরিবেশে তাদের জীবন গড়ে উঠেছে। অথবা মুসলিম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে হরিদাসের ন্যায় মুরতাদ হয়ে গেছে। তবে তাদের কবিতা, সাহিত্য, পাঁচালি, সংগীত প্রভৃতি তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

পরবর্তীকালে ইসলামবৈরীরা বাদশাহ আকবরকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। জয়পুরের রাজা বিহারীমলের সুন্দরী রূপসি কন্যা যোধবাই আকবরের মহিষী হিসাবে মোগল হারেমের শোভাবর্ধন করে। আকবরের একাধিক হিন্দু পত্নী ছিল বলে জানা যায়। সেকালে হিন্দু রাজারা আকবরের কাছে তাদের কন্যা সম্প্রদান করে তাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এসব হিন্দু পত্নীর জন্য রাজপ্রাসাদে মূর্তিপূজা ও যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা ছিল। তখন মোগল শাহি মহল মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত হয়েছিল। এভাবে আকবরের ওপরে শুধু হিন্দু মহিষীদেরই নয়, হিন্দুধর্মেরও বিরাট প্রভাব পড়েছিল। এসব মহিষীর গর্ভে

---

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন।

৩. গোলাম রসুল কর্তৃক প্রকাশিত শুকুর মাহমুদের পাঁচালি দ্রষ্টব্য।

৪. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন।

৫. ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান, এ আর মল্লিক।

যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে এমন পরিবেশে জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, লালিতপালিত হয়েছে ও বেড়ে উঠেছে, তাদের মানসিকতায় পৌত্তলিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব কতখানি ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। এর স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে আমরা দেখতে পাই, হিন্দু মহিষীর গর্ভজাত সম্রাট জাহাঙ্গির দেওয়ালি পূজা করতেন এবং শিবরাত্রিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও যোগীদের তাঁর সাথে একত্রে নৈশভোজে নিমন্ত্রিত করতেন। তিনি তাঁর শাসনের অষ্টম বছরে আকবরের সমাধিসৌধ সেকেন্দ্রায় হিন্দু প্রথানুসারে পিতার শ্রাদ্ধ পালন করেন।

শাহজাহান পুত্র দারা শিকোহ তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মাজমাউল বাহরাইনে' হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলিবর্দি খানের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহামত জং ও সাওলান জং মতিঝিল রাজপ্রাসাদে সাতদিন ধরে হোলিপূজার অনুষ্ঠান পালন করেন। এ অনুষ্ঠানে আবির ও কুমকুম স্তূপীকৃত করা হয়। মির জাফরও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ হোলির অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। কথিত আছে, মির জাফর মৃত্যুকালে কীরিটেশ্বরী দেবীর পদোদক (মূর্তি ধোয়া পানি) পান করেন।[৬]

হোলি বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের 'অবতার' শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণববাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব অন্যতম। অতএব বৈষ্ণববাদের প্রভাব যে মুসলিম সমাজের মূলে তখন প্রবেশ করেছিল, ওপরের বর্ণনায় তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মুসলিম সমাজের এমন ধর্মীয় অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করে ঐতিহাসিকরা বলেছেন, মুসলিম সমাজে পৌত্তলিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রধান কারণ হলো ভারতীয় নও-মুসলিমদের পৌত্তলিক থেকে অর্ধমুসলিম (Half-Conversion) হওয়া। অর্থাৎ একজন পৌত্তলিকের ইসলাম না বুঝে মুসলিম হওয়া এবং ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ না পাওয়া। যাতে সে পৌত্তলিকতার অসারতা ও এর বিপরীতে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ পেতে পারে। তারা ইসলামি পরিবেশে জীবনযাপন করে আচার-আচরণ, স্বভাবচরিত্র ও মানসিকতার পরিবর্তন ও সংশোধন করার সুযোগ পায়নি। যে কারণে এ ধরনের মুসলিমরা হিন্দুদের দুর্গোৎসবের অনুকরণে শবে বরাতে আলোকসজ্জা ও বাজি পুড়িয়ে হয়তো কিছুটা আনন্দ লাভের চেষ্টা করে। আকবর, জাহাঙ্গির ও বাংলার পরবর্তী শাসকরা প্রকাশ্যে হিন্দুদের পূজায় যোগ দিতে দ্বিধা করেননি।

---

৬. ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান, এ আর মল্লিক; মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মওলানা আকরাম খাঁ।

ঐতিহাসিক এম. গ্রাসিন ডি ট্যাসিন বলেন, মুহাররমের তাজিয়া অবিকল হিন্দুদের দুর্গাপূজার অনুকরণ। দুর্গোৎসব যেমন ১০ দিন ধরে চলে এবং শেষ দিন ঢাকঢোল-বাদ্যবাজনা বাজাতে বাজাতে পূজারিরা প্রতিমা নিয়ে মিছিল করে তাকে নদী অথবা পুকুরে বিসর্জন দেয়, মুসলিমরাও অনুরূপ ১০ দিন মুহাররমের উৎসব পালন করে। শেষ দিন দুর্গা বিসর্জনের ন্যায় ঢাকঢোল বাজিয়ে মিছিল করে তাজিয়া বিসর্জন দেয়।

ডা. জেমস ওয়াইজও মুহাররম উৎসবকে হিন্দুদের রথযাত্রা উৎসবের অনুরূপ বলে মন্তব্য করেছেন। মিসেস এইচ আলি বলেন, দীর্ঘদিন হিন্দুদের সংস্পর্শে থেকে মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলোকে হিন্দুদের অনুকরণে মিছিলের আকারে বাহ্যিকভাবে জাঁকালো করে তুলেছে। ইউরোপীয়দের ন্যায় বিদেশি মুসলিমরাও বাংলার মুসলিমদের এ ধরনের ধর্মীয় উৎসবাদিকে ইসলামের বিকৃতকরণ ও অপবিত্রকরণ মনে করেছেন।[৭]

ইসলাম ও মুসলিমদের এমন পতনযুগে পিরপূজা ও কবরপূজার ব্যাধি মুসলিম সমাজে ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক এম টি টিটাসের মতে এ কুসংস্কার আফগানিস্তান, ইরান ও ইরাক থেকে আমদানি হয়েছে। হিন্দুদের প্রাচীন গুরু-চেলা পদ্ধতি এবং স্থানীয় বহু দেব-দেবীর পূজায় তাদের অদম্য বিশ্বাস মুসলিম সমাজকে এ কুসংস্কারে লিপ্ত হতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি বলেন, ইসলামের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা বহুগুণ উৎসাহ-উদ্যম সহকারে তারা পিরপূজা করে। অতীতে যে-সকল অলি-দরবেশ ইসলামের মহান বাণী প্রচার করে গেছেন, পরবর্তীকালে অজ্ঞ মুসলিমরা তাদেরই কবরগুলো পূজার কেন্দ্র বানিয়েছে।

একমাত্র বাংলায় যেসব অলি-দরবেশের কবরে মুসলিমরা তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য ফুলশিরনি ও নজর-নিয়াজ দিত, তার কতক ডা. জেমস ওয়াইজের মতে নিম্নরূপ :

সিলেটের শাহ জালাল, পাঁচ পির, মুন্নাশাহ দরবেশ, সোনারগাঁয়ের খোন্দকার মুহাম্মদ ইউসুফ, মিরপুরের শাহ আলি বাগদাদি, চট্টগ্রামের পির বদর, ঢাকার শাহ জালাল এবং বিক্রমপুরের আদম শহিদ প্রমুখের দরগা।

এ ছাড়া চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামির দরগা—হয়তো একেবারে কল্পিত, সম্ভবত এই তথ্য ডা. জেমস ওয়াইজের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে—প্রসিদ্ধ।

বাংলা বিহারে এ ধরনের বহু দরগার কথা ব্লকম্যানের গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

---

৭. ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান, এ আর মল্লিক।

সোনারগাঁয়ের হিন্দু-মুসলিম উভয়ে একত্রে পূজাপার্বণ পালন করত বলে কথিত আছে। কৃষক ভালো ধান্য-ফসল লাভ করতে কয়েক আঁটি ধান দরগায় দিয়ে আসত। সর্বপ্রকার ব্যাধি ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরগায় চাউল ও বাতাসা দেওয়া হতো।

ঢাকা শহরের পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে একটি দরগায় কালো রঙের একটি প্রস্তর রাখা ছিল, যাকে বলা হতো কদম রসুল (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদচিহ্ন)। আজও তা বিদ্যমান আছে। ডা. জেমস ওয়াইজ বলেন, গয়ার ব্রাহ্মণরা তীর্থযাত্রীদের বিষ্ণুপদ (বিষ্ণুর পদচিহ্ন) দেখিয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করে। অনুরূপ দরগার মুতাওয়াল্লিরাও গ্রামের অজ্ঞ ও বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের কদম রসুল দেখিয়ে প্রচুর অর্থ আয় করে।

আজমিরে খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি রহ.-এর মাজারে গিলাফ চরিয়ে বেহেশতের দরজা (?) দেখিয়ে মাজারের দালালরা জিয়ারতকারীদের নিকট থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার করে।

এ ধরনের অসংখ্য অগণিত কবর ও দরগা রয়েছে উপমহাদেশে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে যতটুকু ইসলামি মূল্যবোধ অবশিষ্ট ছিল, তাও নিঃশেষ করে দেয় এই শ্রেণির ভণ্ড পির-ফকিররা। এমনকি ধর্মের নামে তারা বৈষ্ণব ও বামাচারী তান্ত্রিকদের অনুকরণে যৌন অনাচারের আমদানিও করে। মুসলিম নামে তারা যে মত ও পথ অবলম্বন করে তার উৎস যেহেতু বাংলার বৈষ্ণববাদ, সেজন্য বৈষ্ণবদের আচারানুষ্ঠান ও রীতিনীতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ এখানে প্রয়োজন মনে করি।

মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

চৈতন্যদেব হইতেছেন বাংলার বৈষ্ণবদের চৈতন্য সম্প্রদায়ের পূজিত দেবতা। হিন্দুদের সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের একজন অবতার অথবা পরিপূর্ণ অর্থেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই কারণেই তাঁহার ভক্তগণ, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সত্তা হইতে মানুষ চৈতন্যকে বাদ দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণচৈতন্যে উন্নীত করে এবং অতি মারাত্মকভাবে কৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ধর্মের নামে নেড়ে-নেড়ি তথা মুণ্ডিত কেশ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে যে জঘন্য যৌন অনাচারের স্রোত বহিয়া চলে, তাহা পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের যৌন আবেগমূলক প্রণয়লীলার পুনরাবৃত্তি বা প্রতিরূপ ব্যতীত কিছুই নহে।

তান্ত্রিক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশনা দিতেছেন যে, 'কলিকালে (বর্তমান যুগে) মদ্যপান শুধু সিদ্ধই নহে বরং মদ্যপানের রীতি যেমন পূর্বকালে প্রচলিত ছিল, তেমনই এই কলিযুগেও বর্ণধর্ম-নির্বিশেষে তোমরা ইহা পান করিবে।'[৮]

এরপর—'মহাদেব গৌরীকে বলিতেছেন : পাথরে বীজ বপন করিলে তাহার অঙ্কুরিত হওয়া যেমন অসম্ভব, পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা-উপাসনাও তেমনই নিষ্ফল। অধিকন্তু পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা-উপাসনা করিলে পূজারিকে নানা বিপদ-আপদ ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়।'[৯]

মহাদেবের নিজমুখে এ পঞ্চতত্ত্ব রহস্যের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আমরা পাঠকগণকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি :

'হে আদ্যে, শক্তিপূজা পদ্ধতিতে অপরিহার্য করণীয় হিসেবে মদ্যপান মাংস, মৎস্য ও মুদ্রাভক্ষু এবং সঙ্গমের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।'[১০]

'আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ বামাচারী তান্ত্রিকদের এই পূজা-পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিতেছেন : বামাচারীগণ বেদবিরুদ্ধ এই সকল মহা অধর্মের কার্যকে পরম ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও যৌন সঙ্গমের এক বিস্বাদ মিশ্রণকে তাহারা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ যৌন সঙ্গমের ব্যাপারে প্রত্যেক পুরুষ নিজেকে শিব ও প্রত্যেক নারীকে পার্বতী কল্পনা করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবেই সঙ্গমে লিপ্ত হইতে পারে। ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু বামাচারীগণ তাহাদিগকে অর্থাৎ রজস্বলা স্ত্রীলোকদিগকে অতি পবিত্র জ্ঞান করেন।'

'বামাচারীদের শাস্ত্র রুদ্রমংগলতন্ত্রে বলা হইয়াছে : রজস্বলার সহিত সঙ্গম পুকুরে স্নানতুল্য, চণ্ডালী সঙ্গম কাশীযাত্রার তুল্য, চর্মকারিণীর সহিত সঙ্গম প্রয়াগে স্নানের তুল্য, রজকী সঙ্গম মথুরা যাত্রার তুল্য এবং ব্যাধ কন্যার সহিত সঙ্গম অযোধ্যা তীর্থ পর্যটনের তুল্য।'

'যখন বামাচারীরা ভৈরবী চক্রে (নির্বিচারে অবাধে যৌনসম্ভোগের জন্য মিলিত নরনারীদের একটি চক্র) মিলিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের কোনো ভেদ থাকে না। একদল নরনারী অন্যলোকের অগম্য একটি নির্জনস্থানে মিলিত হইয়া ভৈরবীচক্র নামে একটি চক্র রচনা করিয়া উপবেশন করে অথবা দণ্ডায়মান হয়। এই কামুকদের সকল পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বাছিয়া লইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার পূজা করে। অনুরূপ সকল নারী একজন পুরুষকে বাছিয়া বাহির করে এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পূজা করে। পূজাপর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হয়

---

৮. মহানির্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস, ৫৬ শৎ শ্লোক।

৯. মহানির্বাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাস, ২৩-২৪ শ্লোক।

১০. মদ্যং মাংসর ততো মৎস্যং মৈথুনে মেরচ শক্তিপূজা বিবাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকৃতিতম।—মহানির্বাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাস, ২২ শ্লোক।

উদ্দাম মদ্যপানের পালা। মদ্যপানের ফলে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে পরিধানের সকল বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং যাহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত এবং যতজনের সঙ্গে সম্ভব ততজনের অবাধ যৌন সঙ্গমে মাতিয়া উঠে—যৌন সঙ্গী যদি মাতা, ভগ্নি অথবা কন্যাও হয় তাহাতেও তাহাদের কিছু যায় আসে না। বামাচারীদের[১১] তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, একমাত্র মাতা ব্যতীত যৌন সঙ্গম হইতে অবশ্যই অন্য কোনো নারীকে বাদ দেবে না এবং কন্যা হউক অথবা ভগ্নি হউক আর সকল নারীর সঙ্গেই যৌন কার্য করিবে।'[১২] এসব বৈষ্ণবতান্ত্রিক বামাচারীদের আরও এত জঘন্য অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ আছে যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।[১৩]

ওপরে বর্ণিত জঘন্য ও নোংরা পরিবেশের প্রভাবে বাংলার তৎকালীন মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন এবং সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিশৃঙ্খলার শোচনীয় স্তরে নেমে আসে। এ অধঃপতনের চিত্র পাঠকসমাজের নিকট পরিস্ফুট করে তুলে ধরতে হলে এখানে মুসলিম নামধারী মারেফতি বা নেড়ার পির-ফকিরদের সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন। এ ভণ্ড ফকিরেরা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যথা : আউল, বাউল, কর্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি। এগুলো হচ্ছে হিন্দু বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ, যাতে সাধারণ অজ্ঞ মুসলিমদের সহজে বিপথগামী করা যায়।

এদের মধ্যে বাউল সম্প্রদায় মনে হয় সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও যৌনপ্রবণ। মদ্যপান, নারী-পুরুষে অবাধ যৌনক্রিয়া এদের সকল সম্প্রদায়েরই সাধনপদ্ধতির মধ্যে অনিবার্যরূপে শামিল। বাউলরাও তান্ত্রিক বামাচারীদের ন্যায় যৌনসংগমকে যৌনপূজা বা প্রকৃত পূজারূপে জ্ঞান করে। তাদের এ যৌনপূজার মধ্যে 'চারিচন্দ্র ভেদ'[১৪] নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। একে তারা অনিবার্য পবিত্র মনে করে। তাদের মতে মানুষ এ চারিচন্দ্র বা মানবদেহের নির্যাস যথা : রক্ত, বীর্য, মল ও মূত্র পিতার অণ্ডকোষ ও মাতার গর্ভ থেকে লাভ করে থাকে। অতএব এ চারিচন্দ্র সাধনের সাথে 'পঞ্চরস সাধন'-ও করে থাকে। পঞ্চরস হচ্ছে তাদের ভাষায় কালো সাদা লাল হলুদ ও মুর্শিদবাক্য। এ চারবর্ণ যথাক্রমে মদ, বীর্য, রজ ও মলের অর্থজ্ঞাপক। আপন স্ত্রী অথবা পরস্ত্রীর সাথে সংগমের পর তারা মুর্শিদবাক্য পালনে এ চারবর্ণের পদার্থ ভক্ষণ করে থাকে।

---

১১. হিন্দু সমাজের তান্ত্রিক আচার; স্ত্রী-পুরুষের মিলিতভাবে একপ্রকার তান্ত্রিক সাধনা। মদ-মাংস-মৈথুন প্রভৃতি পঞ্চ 'ম'-কার যুক্ত তান্ত্রিক সাধনা।

১২. জ্ঞান সংকলনীতন্ত্র : মাতৃং যোনিং পরিত্যাজ্য বিহারেং সর্বযোনীষু।

১৩. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মওলানা আকরাম খাঁ।

১৪. শুক্র, রজ, বিষ্ঠা ও মূত্র—দেহের এই চার পদার্থকে প্রতীকের ভাষায় 'চারি-চন্দ্র' বলা হয়। এই তত্ত্ব দ্বারাই বাউলরা অন্যান্য উপাসক সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন। যা প্রমাণ করে, বাউল একটি আলাদা ধর্ম।

মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে এসব বাউলের সম্পর্কে বলেছেন :

'কোরআন মজিদের বিভিন্ন শব্দ ও মূলতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এই সমস্ত শয়তান নেড়ার ফকিরের দল দিয়াছে, তাহাও অদ্ভুত। 'হাওজে কাওসার' বলিতে তারা বেহেশতি সঞ্জীবনী সুধার পরিবর্তে স্ত্রীলোকের রজ বা ঋতুশ্রাব বুঝে। যে পূজা-পদ্ধতিতে এ ঘৃণ্য ফকিরের দল বীর্য পান করে, তাহার সূচনায় বীজ মে আল্লাহ (মাআজাল্লাহ, মাআজাল্লাহ) অর্থাৎ বীর্যে আল্লাহ অবস্থান করেন—এই অর্থে 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করে থাকে।'

'এই মুসলিম ভিক্ষোপবীজী নেড়ার ফকিরের দলের পুরোহিত বা পীরেরা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্র হরণের অনুরূপ এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যখন পীর তাহার মুরিদানের বাড়ি তশরিফ আনে, তখন গ্রামের সকল যুবতী ও কুমার উত্তম বসনে সজ্জিত হইয়া, বৃন্দাবনের গোপিনীদের অনুকরণে একটি গৃহকক্ষে পীরের সহিত মিলিত হয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে এই সকল স্ত্রীলোক নৃত্যগীত শুরু করে। নিম্নে এই সখীসংগীতের গদ্যরূপ প্রদত্ত হইল :

'ও দিদি যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসিতে চাও,
আর আত্মপ্রতারণা না করিয়া শীঘ্র আস,
আঁখি তোল, তাহার প্রতি তাকাও
গুরু আসিয়াছে তোমাদের উদ্ধারের জন্য
এমন গুরু আর কোথাও পাইবে না।
হ্যাঁ, গুরুর যাহাতে সুখ
তাহা করিতে লজ্জা করিও না।'

'গানটি গীত হইলে পর এ সমস্ত নারী তাহাদের গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। পীর এখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষে তুলিয়া লইয়া গৃহের একটি উঁচু তাকে রক্ষা করে। এই ফকির কৃষ্ণের যেহেতু বাঁশি নাই, তাই সে নিম্নোক্তভাবে মুখে গান গাহিয়াই এইসব উলঙ্গ রমণীগিগকে যৌনভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে :

'হে যুবতীগণ! তোমাদের মোক্ষের পথ ভক্তকুলের পুরোহিতকে অর্ঘস্বরূপ দেহদান কর।'

'কোনোরূপ সংকোচ বোধ না করিয়া পীরের যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করাই ইহাদের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।'[১৫]

---

১৫. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।

যৌনক্রিয়া, আনন্দদায়ক ও সুখকর বস্তু সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ অবৈধ যৌনসংগমে ভীত শঙ্কিত হয়, লজ্জাসংকোচ অনুভব করে—পাপের ভয়ে, ধর্মের ভয়ে। কিন্তু ধর্ম স্বয়ং যদি ঘোষণা করে যে, এ কাজ পাপের নয়, পুণ্যের এবং এতেই মোক্ষলাভ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ এ পথে আকৃষ্ট হবে না কেন? একশ্রেণির লম্পট পাপাচারী ধর্মের নামে এভাবে অজ্ঞ-মূর্খ মানুষকে ফাঁদে ফেলে প্রতারিত ও বিপথগামী করেছে।

ওপরে বর্ণিত ভণ্ড পির-ফকিরদের আরও বহু অপকীর্তি ও অশ্লীল ক্রিয়াকাণ্ড আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওপরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো। এর থেকে তৎকালীন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন। যদিও গোটা মুসলিম সমাজের অধঃপতন এতটা হয়েছিল না, কিন্তু সমাজে পৌত্তলিক ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রবল কম্পন যে মুসলিমদের বিশ্বাস ধসিয়ে দিয়ে তাদের সাথে একাকার করে দিচ্ছিল, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের ছিল না। কারণ তৎকালীন মুসলিম শাসকরা এদের প্রতি নমনীয়তা পোষণ করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর জিহাদ আন্দোলন, কেউ কেউ বিকৃত করে একে 'ওহাবি আন্দোলন' বলতে নাকি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন! সাইয়েদ মাওলানা তিতুমির ও হাজি শরিয়তুল্লাহও এসবের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তথাপি ওসব গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতার বিষক্রিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত মুসলিম সমাজের একটা অংশকে জর্জরিত করে রেখেছিল। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে। বলা হয় যে, লোক গণনার সময় এমন কিছু সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া গেছে, যারা নিজেরা স্বীকারোক্তি করেছে, তারা হিন্দুও নয় মুসলিমও নয়। বরঞ্চ উভয়ের মিশ্রণ।[১৬]

কিন্তু কিছুসংখ্যক মুসলিমের পৌত্তলিক ভাবধারার রস এখনো সঞ্জীবিত রেখেছে বাংলা ভাষার কতিপয় বৈষ্ণববাদ ভক্ত ও পৌত্তলিক ভাবাপন্ন মুসলিম কবি। কবি লাল মামুদ তাদের অন্যতম। তিনি বৈষ্ণববাদের প্রতি এতটা অনুরাগী ছিলেন, একটি বটবৃক্ষমূলে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করে রীতিমতো পুজো করতেন। যেদিন গোস্বামীপ্রভু লালুর আশ্রমে উপস্থিত হন, সেদিন নিম্নোক্ত গান গেয়ে প্রভুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন :

'দয়াল হরি কই আমার
আমি পড়েছি ভব কারাগারে, আমায় কে করে উদ্ধার।

---

১৬. Census of India Report, 1911 A. D.

শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে
বিফলে গেল দিন আমার।'

তারপর আসে কবি লালন সাঁইয়ের কথা। তাঁর কয়েকটি গান নিম্নে প্রদত্ত হলো :

'পার কর, চাঁদ গৌর আমায়, বেলা ডুবিল
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিনত বয়ে গেল।
আছে ভব নদীর পাড়ি
নিতাই চাঁদ কান্ডারি।
ও চাঁদ গৌর যদি পাই, ও চাঁদ গৌর হে,
কুলে দিয়ে ছাই
ফকির লালন বলে শ্রীচরণের দাসী হইব।'

ওপরে কবি লাল মামুদ আক্ষেপ করে বলেন, মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করে তাঁর জীবন বিফল হলো। লালন সাঁই বলেন, গৌর নিতাইকে পেলে মুসলমানি ত্যাগ করে তাঁর শ্রীচরণের সেবায় রত হবেন।

লালন সাঁইয়ের কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কীয় গান :

'কৃষ্ণপ্রেম করব বলে, ঘুরে বেড়াই জনমভরে
সে প্রেম করব বলে ষোলআনা
এক রতির সাধ মিটল নারে।
রাধারানির ঋণের দায়
গৌর এসেছে নদিয়ায় বৃন্দাবনের কানাই আর বলাই
নৈদে এসে নাম ধরেছে গৌর আর নিতাই।'

অথচ মুসলিম সমাজের একশ্রেণির পৌত্তলিকমনা আঁতেল লালন সাঁইয়ের মতবাদকে মুসলিম সমাজে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

মুসলিম সমাজের এমন অধঃপতনের কারণ বর্ণনা করে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন :

'পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেমন বিজিত জাতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তেমন ভারতীয় মুসলিমরাও বিজিত হিন্দুদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব এখনো স্পষ্ট। ইসলাম ও হিন্দুধর্ম পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতি মুসলিম শাসনামলে বহাল ছিল। বিভিন্ন সময়ে এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধরন ও পরিমাণ মুসলিম শাসকদের নীতির ফলে বর্ধিত হয়েছে আবার হ্রাস পেয়েছে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে ইসলাম এমন এক রূপ ধারণ করে যার জন্য ইসলামি রেনেসাঁস অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ভারতীয় মুসলিমরা, বিশেষ করে বাংলা ও বিহারের মুসলিমরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে এমনসব কুফরি আচার-বিশ্বাস অবলম্বন করে, যা ছিল অন্যান্য দেশের মুসলিমদের মধ্যে বিরল। বাংলা-বিহারে

মুসলিমদের সংখ্যা ছিল যেমন বিরাট, তাদের রীতিনীতি ও আচার-আচরণও ছিল তেমনই অস্পষ্ট ও নীতিবর্জিত।'[১৭]

ভারতীয় মুসলিমদের জীবন-সংস্কৃতিতে ইসলাম অস্বীকৃত রীতিপদ্ধতি অনুপ্রবেশ করার কারণ হচ্ছে, অমুসলিমদের ধর্মান্তরগ্রহণ ছিল অপূর্ণ।[১৮] ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের চিত্র ওপরে তুলে ধরা হয়েছে। তাওহিদে বিশ্বাসী মুসলিম যখন এমনই বিকৃতির জালে আবদ্ধ এবং তখন ভেতর ও বাইর থেকে যে বিরুদ্ধ শক্তি তাদের পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়, সে আক্রমণ প্রতিহত করার প্রাণশক্তি তখন তাদের ছিল না। যাদের মাত্র ১৭ জন এককালে বাংলায় রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, কয়েক শতাব্দী পরে তাদের লক্ষ লক্ষ জন মিলেও সে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে সক্ষম হলো না।

১৭. ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান, এ আর মল্লিক।

১৮. ভারতের ইতিহাস, ইলিয়ট ও ডাউসন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাষা ও সাহিত্য : যে কারণে মৌল বৈশিষ্ট্য হারায়

ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে বাংলা ভাষার উন্নতি হয়েছে, তাতে মুসলিম শাসক, প্রচারক ও লেখকদের অবদান মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। ভৌগোলিক অঞ্চল বিচারে বাংলাকে যেমনই মুসলিম শাসকগণ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তেমনই তাদের হাতেই মৃত ও অবহেলিত বাংলা ভাষা নবজীবন লাভ করেছে। এমনকি বাংলা গদ্যের যে নমুনা পাওয়া যায়, তাও মুসলিম শাসনামলে রচিত ও সম্পাদিত। ষোলো শতাব্দীর আগেই চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজের প্রয়োজনে গদ্যের প্রচলন হয়েছিল। মুসলিম শাসনকালে সাহিত্যের প্রয়োজন ছাড়াও সরকারি দফতরখানা, খাজাঞ্চিখানা, কাজির বিচারালয় ইত্যাদিতে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল। সেই গদ্যের পরিচয় জানিয়ে সুকুমার সেন লিখেছেন :

> 'ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলা গদ্যে লেখা চিঠির নমুনা পাওয়া যাইতেছে। দলিল পাইতেছিল সপ্তাদশ শতাব্দী হইতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা চিঠি ও দলিল অনেকগুলিই মিলিয়াছে। এই সময়ে লেখা দলিল এবং কাজ-কর্মের চিঠিতে আরবি-ফারসি শব্দের বড়ই আতিশয্য। এমনকি ভাষা ঠিক বাংলা বলতে বাধে।'[১৯]

সুকুমার সেন বা পরবর্তীকালের বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে বাংলা ভাষার আদি গদ্য-রূপটি 'বাংলা বলতে বাধলে'-ও এটাই ছিল বাংলা ভাষার আদি রূপ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবিদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য—নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, দৌলত কাজি, ভারতচন্দ্র, সৈয়দ আলাওল, শ্রীকর নন্দী, হোসেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ, আবদুল গফুর, ফয়জুল্লাহ, মুন্সি মুহাম্মদ আবেদ আলি, মুন্সি আইজুদ্দিন, মুন্সি আসমত—প্রমুখের লেখায়ও আরবি-ফারসিবহুল বাংলা ভাষাই লক্ষ করা যায়।

বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন সম্পর্কে আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন :

> 'বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শনে আরবি-ফারসি শব্দের অকুণ্ঠিত ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মহারাজ নন্দকুমার প্রমুখের পত্রে এবং পরবর্তী সময়ে

---

১৯. ড. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য; মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, মুসলিম সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪।

পাদ্রী জেকব বিশ্বাসের গদ্য রচনায় এইরূপটিই প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাষার সহিত পুঁথির ভাষার পার্থক্য খুব বেশি নহে। অতএব, আরবি-ফারসিবহুল বাংলা যে কেবল অশিক্ষিত মুসলিম শায়েরদের রচনায়ই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে—তাহা আরও অধিক বিস্তৃত ও তাহার মূল আরও গভীরে প্রোথিত ছিল।'[২০]

পলাশির বিপর্যয়ের পর মুসলিমদের বিষয়ে ইংরেজরা যে নীতি গ্রহণ করে, তার ফলে মুসলিম অভিজাতশ্রেণি বাংলা সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা দানের ক্ষমতা হারায়। ফোর্ট উইলিয়ামি ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে যে নতুন ভাষা ও সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে তাতে বাংলা ভাষার চেহারা সম্পূর্ণরূপে পালটে ফেলার সযত্ন প্রয়াসের ছাপ লক্ষ করা যায়। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থমালা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং ইংরেজ-প্রসাদপুষ্ট ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষার রূপ ও সাহিত্যের গতি পালটাতে শুরু করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় হিন্দু সাহিত্যিক ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের এমন এক প্রেরণা যুক্ত হয়েছিল, যার সাথে বিপর্যস্ত মুসলিমদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুর হলো। হিন্দু সাহিত্য, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দুধর্ম আর হিন্দুর সমাজদর্শনই বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সবটুকু জায়গাজুড়ে ঠাঁই করে নিল। ভাষার সংস্কারে এবং বাংলা গদ্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিষ্টানরা এ সময় ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছিল। তার পেছনে কাজ করেছিল খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধা সৃষ্টির প্রেরণা। বর্ণ হিন্দুরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার কারণেই ছাপাখানার ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলা ভাষার আদল পরিবর্তনের এ কাজটি এত ব্যাপক হলো, যার ফলে বাংলা হরফ ঠিক থাকল বটে, কিন্তু রক্তে-মাংসে সে ভাষা হয়ে উঠল অনেকাংশেই সংস্কৃত; যা ছিল আসলে বাংলা হরফে সংস্কৃত লেখারই নামান্তর। সংস্কৃত পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের হিংসা ও আক্রোশ এড়িয়ে সংস্কৃতের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই করে বাংলা ভাষা তার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা টিকিয়ে রেখেছিল। অথচ ইতিহাসের এই পর্যায়ে ইঙ্গ-হিন্দু মিলিত ষড়যন্ত্রের মুখে বাংলা ভাষা আখ্যায়িত হলো তার চিরবৈরী সংস্কৃত ভাষারই দুহিতা নামে।

এ প্রসঙ্গে কাজী আমিনুল ইসলাম লিখেছেন :

'ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক কারণে মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটে। ফলে বাংলা সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করার লোক মুসলিমদের মধ্যে থাকল না। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

---

২০. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, মাহে নও, কার্তিক, ১৩৬৩।

আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাব হলো, মঙ্গল-কাব্যরূপ সাহিত্য এগিয়ে গেল। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকারী হিন্দুদের মধ্য থেকেই আধুনিক সাহিত্যিক তৈরি হলো। হিন্দু দেব-দেবীদের নাম জড়িয়ে যে সাহিত্য, তারই মধ্যে তারা বিচরণ করে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলাকে টেনে নামালেন। বাংলা সাহিত্যের গতি ঘুরে গেল। একচেটিয়া হিন্দুরা বাংলা সাহিত্য লালন করাতেই সাহিত্যের যে মুসলিম ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহারের গন্ধ ছিল, তা অনেকাংশে তিরোহিত হলো। ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে নন্দনকুমার, জগতধীর রায় প্রভৃতির রচনায় যে বাংলা ভাষার আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য ছিল তা মুছে গেল। সেই থেকে ইংরেজি শিক্ষার ফলে হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিল।'[২১]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এ মোড় পরিবর্তনের ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়াল, বাংলা ভাষা মুসলিমদের মাতৃভাষা কি না, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিমের উত্তরাধিকার রয়েছে কি না, সে সম্পর্কেও নানা দ্বিধা-সংশয় ও বিতর্ক সৃষ্টি হলো। বাংলার মুসলিম বাঙালি, যখন থেকে বাঙালির জন্ম (পাল-যুগ), তখন থেকে তাদেরও জন্ম।[২২]

এই ঐতিহাসিক সত্যও অনেকেই বিস্মৃত হয়ে বসেছে। এ প্রসঙ্গেই মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ লিখেছেন :

'পলাশি ক্ষেত্রে বাংলার মুসলিমদের ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ পরিবর্তন এবং বাংলা গদ্যের চর্চায় বাঙালি মুসলিমের আত্মনিয়োগ ও সাধনার ব্যাপারটি বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাদের উত্তরাধিকার রয়েছে কি না এসব প্রশ্নও অনেক মুসলিম সাহিত্যিকের মনে নানা দ্বন্দ্ব, দ্বিধা-সংশয় ও আলোড়ন-বিলোড়নের জন্ম দেয় এবং এ নিয়ে কম বাক-বিতণ্ডাও হয়নি।'[২৩]

বাংলা ভাষার এ অবস্থার জন্য পলাশিতে বাংলার মুসলিমদের ভাগ্যবিপর্যয়ই যে কারণ ছিল, সে সম্পর্কে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন :

'যদি পলাশিতে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়তো এই পুঁথির ভাষাই বাংলা হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।'[২৪]

---

২১. কাজী আমিনুল ইসলাম, বাংলার রূপরেখা, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৭-৭০।

২২. কাজী আমিনুল ইসলাম, বাংলার রূপরেখা, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৭।

২৩. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, মুসলিম সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৫।

২৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, শহীদুল্লাহ সংবর্ধনাগ্রন্থে সংকলিত, পৃষ্ঠা ৪২১।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয়

মুসলিম শাসনামলে মুসলিমদের ধর্মীয় জীবন ইসলামি শরিয়তের আলোকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক পল্লিতে মুফতি, কাজি, মুহতাসিব ও নায়েব নিযুক্ত করা হতো। তারা মুসলিমদের শরিয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দিতেন, তাদের ধর্মীয় সমস্যাগুলো সমাধান করতেন এবং তাদের ঈমান-আকিদা হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতেন, বিয়েশাদি সম্পাদন করতেন, জানাজা ও জুমার নামাজ প্রভৃতিতে ইমামতি করতেন। পলাশির বিপর্যয় মুসলিমদের ইসলামি জীবনের সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে। এই স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করতে পীর-ফকির-খন্দকার প্রভৃতি নামে একশ্রেণির 'ধর্মীয় লোকের' আবির্ভাব ঘটে। তাদের প্রভাব নিজ নিজ মুরিদদের মধ্যে সীমিত থাকে। সর্বশ্রেণির মুসলিমদের তত্ত্বাবধান করার সামর্থ্য তারা রাখতেন না।

মুসলিম সমাজে এ সময় বিভিন্ন বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটে। একদল স্বল্পশিক্ষিত পির-ফকির-খন্দকার এসব সমস্যার মোকাবিলা না করে বরং এগুলোকে প্রশ্রয় দিতেন। ফলে বাংলার মুসলিমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয় নেমে আসে। তাদের বিপথগামী হওয়ার পথ অবারিত হয়। প্রতিবেশী হিন্দুদের প্রভাবে ও অনুকরণে বহু কুসংস্কার ও শরিয়াপরিপন্থি রীতি-রেওয়াজ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। মুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুধর্মীয় বহু অনুষ্ঠান ও সামাজিক আচার-আচরণ এ সময় ঢুকে পড়ে এবং সেগুলো তাদের ধর্মীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। অনেকে সেগুলোকে ইসলামি লেবাস পরিয়ে জাতে তোলার চেষ্টা করেন। মুসলিম সমাজে মা বরকত, ওলা বিবি ও শীতলা দেবীর পূজা, কালোজিরা পড়া, কাঞ্জিপাড়া, তাবিজ-কবজ ইত্যাদি বহু নতুন উপসর্গ বেশ শক্তিশালী হয়ে আসন গেড়ে বসে। হিন্দুদের মনসা পূজার অনুকরণে খোয়াজ খিজিরের পূজা, দুর্গাপূজা, দশোহরার অনুকরণে মুহাররমের ১০ তারিখে হাসান-হুসাইনের তাজিয়া বিসর্জন, হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণের অনুকরণে মুসলিম সমাজে নানা পার্বণ চালু হয়।

পলাশির পরাজয় মুসলিম সমাজজীবনে যে সর্বমুখী বিপর্যয় ও অবনমন বয়ে আনে সে সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের বিশ্বস্ত মুখপাত্র ইউলিয়াম হান্টার ১৮৭২ সালে লিখেছেন :

> 'তারা (মুসলিমরা) অভিযোগ করেছে যে, তাদের ধর্ম প্রচারকদের সম্মানজনক জীবনযাপনের একটি রাস্তা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। ...আমরা এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি, যার ফলে তাদের গোটা সম্প্রদায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং তারা অবমাননাকর

জীবনযাপনের অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে।... তাদের যে-সমস্ত আইন-অফিসার বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মীয় অনুমোদন দান করতেন এবং যারা স্মরণাতীতকাল থেকে ইসলামি পারিবারিক আইনের ব্যাখ্যা দান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পালন করে এসেছেন, তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে আমরা হাজার হাজার পরিবারকে শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি। ...মুসলিমদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনের উপায়গুলি থেকে বঞ্চিত করে আমরা তাদের আত্মার ওপর পীড়ন চালাচ্ছি। অসদুদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অপব্যবহার করেছি এবং তাদের শিক্ষা তহবিলের বিরাট অঙ্ক আমরা দখল করে নিয়েছি। তারা প্রচার করে থাকে যে, আমরা যারা মুসলিম সাম্রাজ্যের ভৃত্য হিসেবে বাংলার মাটিতে পা রাখবার জায়গা পেয়েছিলাম, তারাই বিজয়ের সময় কোনোরূপ পরদুঃখ-কাতরতা দেখাইনি এবং গর্বোদ্ধত রূঢ়তা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের সাবেক প্রভুদের কর্দমে প্রোথিত করেছি। এককথায়, ভারতীয় মুসলিমরা ব্রিটিশ সরকারকে সহানুভূতিহীন, অনুদার ও তহবিল আত্মসাৎকারী এবং দীর্ঘ এক শতাব্দীব্যাপী অন্যায়কারী হিসেবে অভিযুক্ত করে থাকে।'[২৫]

পলাশি যুদ্ধোত্তর বাংলার মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন :

'বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারির সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াফত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তি স্বত্ব লোপ, ১৮৩৭ সালে ফারসির রাজভাষাচ্যুতি—পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসকশ্রেণি নিঃস্ব-রিক্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এই রূপটি হয়েছে।'[২৬]

ইংরেজরা বাংলার শাসনক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে শঠতা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও বিভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্রের ভাগীদার হিন্দু শেঠ বেনিয়ারাও কখনো সে প্রতারণার শিকার হয়ে জব্দ হয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা এই হিন্দু সম্প্রদায়কে তাদের নিরাপত্তার প্রধান সহায়ক বিবেচনা করে করে যেটুকু করুণা করেছে, তার দ্বারা তাদের ঋণ শতকরা শতভাগের বেশিই শোধ হয়েছে। বাংলার মুসলিমদের জন্য যা ছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম বিপদ-বিপর্যয়, এই বর্ণহিন্দু শ্রেণির জন্য তা ছিল প্রভু পরিবর্তন এবং নব্য-প্রভুর কিঞ্চিৎ আশীর্বাদে জীবনের সকল দিক কানায় কানায় পূর্ণ ও পুষ্ট করার সুযোগ।

---

২৫. ডবলিউ ডবলিউ হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮।

২৬. ড. ওয়ালি আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১।

সে কারণেই মুসলিমদের লাঞ্ছনার পটভূমিতে বঙ্কিম-ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখের কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হলো ইংরেজ-প্রভুর বিজয়বন্দনা :

'ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।'

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্তির পশ্চাৎ পটভূমি

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ভারতীয় মুসলিমদের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্যোগ। নামেমাত্র একটি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষক-শাসন দিল্লিতে অবশিষ্ট থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল যার সুযোগে বিভিন্ন সুবার মুসলিম নবাবরা একপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ করছিলেন। তারা জমিদার-জায়গিরদার ও ধনিক-বণিক শ্রেণির সন্তুষ্টি সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তারা স্বভাবত হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পড়েছিলেন। সুযোগসন্ধানী বিজিত জাতি এ সুযোগে মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস ও তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সাহস করে। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ, প্রচার ও প্রসার, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন, বৈষ্ণব সমাজের নোংরা, অশ্লীল ও যৌন উত্তেজক ক্রিয়াকলাপ মুসলিম সমাজকে অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত করে। শত্রুকে সম্মুখসমরে পরাজিত করার উপায় না থাকলে তখন তার ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলে তাকে সহজেই পরাজিত করা যায়। ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার সুচতুর হিন্দুরা তাদের কয়েক শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রতিশোধ এভাবেই নিয়েছে। উপরন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে তারা মুসলিম জাতির অধঃপতন ত্বরান্বিত করে তাদের অভীষ্ট সাধনের জন্য তাদেরই একান্ত মনঃপূত নামধারী কোনো মুসলিমকে নির্বাচন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। এই কাষ্ঠপুত্তলিকার দ্বারা তারা তাদের স্বার্থ ষোলো আনা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। তার সাথে আকিদা-বিশ্বাসে কুফর ও পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ এবং মুসলিম সংস্কৃতির ওপর হিন্দুত্বের প্রাধান্য মুসলিমদের তাদের মানসিক গোলামে পরিণত করেছে। তার অতি স্বাভাবিক পরিণাম যা হওয়ার তাই হয়েছে।

ড. এ. আর. মল্লিক তাঁর গ্রন্থে বলেছেন :

> 'Thus long years of association with a non-Muslim people who far outnumbered them, cut off from original home of Islam, and living with half converts from Hinduism, the Muslims had greatly deviation from the faith and had become Idianised. This deviation from the faith apart, the

Indian Muslims in adopting the caste system of the Hindus, had given a disastrous blow to the Islamic conception of brotherhood and equality in which their strength had rested in the past and presented thus in the 19th century the picture of a distrupted society, degenerated and weakened by division and sub-division to a degree, in seemed, beyond the possibility of repair. No wonder, Sir Mohammad Iqbal said, surely we have out-Hindued the Hindu himself—we are suffering and social caste system—religious caste system, sectarian and social caste system—which we have either learned or inherited from the Hindus. This is one of the quiet ways on which the conquered nation revenged themselves on their conquerors.'[২৭]

'মুসলমানরা ইসলামের মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের আধা ধর্মান্তরিত মুসলিমসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমদের সাথে বহু বছর একত্রে বসবাস করে মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে পড়েছিল এবং হয়ে পড়েছিল ভারতীয়-পৌত্তলিক ভাবাপন্ন। অধিকন্তু এই ভারতীয় মুসলিমরা হিন্দুদের বর্ণপ্রথা অবলম্বন করে—অতীতের যে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যে তাদের শক্তি নিহিত ছিল—তার প্রতি চরম আঘাত হানে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তারা বহু ভাগে বিভক্ত, ছিন্ন ও অধঃপতিত জাতি হিসেবে চিত্রিত হয়, যার সংশোধনের কোনো উপায় থাকে না। তাই স্যার মুহাম্মদ ইকবালের এ উক্তিতে বিস্ময়ের কিছু নেই :

'নিশ্চিতরূপে আমরা হিন্দুদের ছাড়িয়ে গেছি। আমরা দ্বিগুণ বর্ণপ্রথার রোগে আক্রান্ত—ধর্মীয় বর্ণপ্রথা, ফেরকা-উপফেরকা এবং সামাজিক শ্রেণিবিভাজন—যা আমরা শিক্ষা করেছি অথবা হিন্দুদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি—যেসব নীরব পন্থায় বিজিতরা প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে, এ হলো তার একটি।'

এ এক অনস্বীকার্য সত্য, বাংলা তথা ভারতের হিন্দুজাতি মুসলিম শাসন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা মুসলিম সংহতি সমূলে ধ্বংস করার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী নীরবে কাজ করেছে। তাদের প্রচেষ্টায় তারা পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। মুসলিমদের ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ও তাদের তাহজিব-তামাদ্দুনে পৌত্তলিকতার কলুষ সংযুক্ত করতে পেরেছে। তাদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত না করে হিন্দুভাবাপন্ন মুসলিম বানিয়ে তাদের দ্বারা হিন্দুস্বার্থ চরিতার্থ করা যে অতিসহজ—এ তত্ত্বজ্ঞান তাদের ভালো করেই জানা ছিল এবং এ কাজ তারা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

---

২৭. British Policy and the Muslims in Bengal, A. R. Mallick.

প্রথম পরিচ্ছেদ

পলাশির যুদ্ধের পর মুসলিম সমাজের দুর্দশা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা বিনষ্ট হওয়ার পর মুসলিম সমাজের যে সীমাহীন দুর্দশা নেমে এসেছিল, তা নিম্নের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হবে :

প্রথমত, পলাশি যুদ্ধের পূর্বে সামরিক ও বেসামরিক চাকরিক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের প্রাধান্য ছিল। কোম্পানির নিকট ক্ষমতা হস্তগত করার পর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রথম ধাপেই মুসলিম সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়ায় বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়।

দ্বিতীয়ত, দেশের গোটা রাজস্ব বিভাগ ইংল্যান্ডের পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করার ফলে বহুসংখ্যক মুসলিম কর্মচ্যুত হয়। সরকারের ভূমিরাজস্বনীতি অনুযায়ী বহু মুসলিম জমিদার জমিদারি থেকে উচ্ছেদ হয়। ১৭৯৩ সালে গ্রাম্য পুলিশি প্রথা রহিতকরণের ফলেও হাজার হাজার মুসলিম কর্ম হারায়। এভাবে এ দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চশ্রেণির মুসলিম শুধু সরকারি চাকরি থেকেই বঞ্চিত হয়নি, জীবিকার্জনের সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়।

দরিদ্র শ্রেণির মুসলিমদের পেশা ছিল সাধারণত কৃষি ও তাঁত। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে ম্যানচেস্টারের মিলজাত বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে আমদানির ফলে বাংলার তাঁতশিল্প ধ্বংস হয় এবং লক্ষ লক্ষ তাঁতির বিনাশ হয়ে যায়। এরপর শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করা তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এ দেশে কোম্পানির আগমনের পর থেকেই কলকাতার হিন্দু বেনিয়ারা তাদের অধীনে চাকরিবাকরি করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এদের বলা হতো 'গোমস্তা'।[২৮] পলাশি যুদ্ধের পর নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় এদের হয়েছিল পোয়াবারো। কোম্পানির একচেটিয়া লবণ ব্যবসায় এবং অভ্যন্তরীণ অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যে এসব গোমস্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু দেশীয় ব্যবসা ধ্বংস করে জনগণকে চরম দুর্দশাগ্রস্ত করলেও এরা

২৮. তহসিলদার, খাজনা আদায়কারী; জমিদার বা মহাজনের পাওনা আদায়কারী কর্মচারী বা প্রতিনিধি বা হিসাবরক্ষক। [ফা. গুমাশ্‌তা]।

ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকে। কোম্পানির দেশি-বিদেশি কর্মচারীরা ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদি অত্যধিক চড়ামূল্যে খরিদ করতে এবং দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি অল্পমূল্যে বিক্রয় করতে জনসাধারণকে বাধ্য করে। তাদের উৎপীড়ন-নির্যাতনের বিবরণ দিতে হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করতে হবে। কোম্পানির এই অত্যাচার-উৎপীড়নে সহায়তা করে বাংলার এই শ্রেণির সুবিধাবাদী হিন্দুরা। ১৭৮৬ সালে কালীচরণ নামে জনৈক গোমস্তার জুলুম-নিষ্পেষণে ত্রিপুরা অঞ্চলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার অপরাধে তাকে সেখান থেকে অপসারিত করে চট্টগ্রামে রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান বা ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়েছিল। এক বৎসরে সে চট্টগ্রামের জমিদারের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে ৩০ হাজার টাকা আদায় করেছিল। লর্ড কর্নওয়ালিসের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলে, চট্টগ্রামের রাজস্ব কন্ট্রোলার মি. বার্ড বলেন, কালীচরণকে চাকরি থেকে অপসারণ করে তার স্থলে তার গোমস্তা নিত্যানন্দনকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কলকাতার অতি প্রভাবশালী গোমস্তা জয় নারায়ণ গোঁসাইর হস্তক্ষেপের ফলে বিষয়টির এখানেই থেমে যায় এবং কালীচরণ তার পদে সসম্মানে বহাল থাকে।

এ একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, কোম্পানির হিন্দু কর্মচারীরা গ্রামবাংলার ধ্বংস সাধনে কী সর্বনাশা ভূমিকা পালন করেছিল। জনৈক ইংরেজ মন্তব্য করেন : ইংরেজ ও তাদের আইনকানুন যে একটিমাত্র শ্রেণিকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল তা হলো, তাদের অধীনে নিযুক্ত এ দেশীয় গোমস্তা-দালাল প্রতিনিধিরা। এসব লোক পঙ্গপালের মতো যেভাবে দ্রুতগতিতে গ্রামবাংলা গ্রাস করছিল তাতে তারা ভারতের অস্তিত্বের মূলেই আঘাত করছিল।[২৯]

ইংরেজদের পলিসি ছিল, যাদের সাহায্যে তারা এ দেশের স্বাধীনতা হরণ করে এখানে রাজনৈতিক প্রভুত্ব লাভ করেছে, তাদের সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিমদের উৎখাত করা, যাতে ভবিষ্যতে তারা কখনো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ না পায়। হেস্টিংসের ভূমি ইজারাদান নীতি ও কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দুরা মুসলিম জমিদারদের স্থান দখল করে। নগদ সর্বোচ্চ মূল্যদাতার নিকটে ভূমি ইজারাদানের নীতি কার্যকর হওয়ার কারণে প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদাররা হঠাৎ সর্বোচ্চ মূল্য নগদ পরিশোধ করতে অপারগ হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু বেনিয়া শ্রেণি, সুদি মহাজন, ব্যাংকার ও হিন্দু ধনিক-বণিক শ্রেণি এই সুবর্ণ সুযোগ লুফে নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রাচীন জমিদারির অধিকাংশ এসব ধনিক-

২৯. Muinuddin Ahmad Khan, Muslim Struggle for Freedom in Bengal, pp. 8.

বণিকদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জমিদারদের অধীনে নিযুক্ত হিন্দু নায়েব-ম্যানেজার প্রমুখের স্বীকৃতি দান। ১৮৪৪ সালের Calcutta Review-তে যে তথ্য প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় এক ডজন জমিদারির মধ্যে, যাদের জমিদারির পরিধি ছিল একটি করে জেলার সমান, মাত্র দুটি পূর্বতন জমিদারদের দখলে রয়ে যায় এবং অবশিষ্ট হস্তগত হয় প্রাচীন জমিদারদের নিম্নকর্মচারীর বংশধরদের হাতে। এভাবে বাংলার সর্বত্র এক নতুন জমিদার শ্রেণির আবির্ভাব হয়, যারা ছিল নতুন বিদেশি প্রভুদের একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন।

হান্টার তাঁর The Indian Mussalmans গ্রন্থে লেখেন : যেসব হিন্দু কর আদায়কারীরা ওই সময় পর্যন্ত নিম্নপদের চাকরিতে নিযুক্ত ছিল, নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণিতে উন্নীত হলো। নয়া ব্যবস্থা তাদের জমির ওপর মালিকানার অধিকার এবং সম্পদ আহরণের অবারিত সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করে। মুসলিমরা নিজেদের শাসনামলে এ সুযোগ-সুবিধাগুলো একচেটিয়া ভোগ করেছে।[৩০]

মুসলিম শাসনামলে আইন ছিল, জমিদাররা সমাজবিরোধী, দুষ্কৃতকারী ও দস্যু-তস্করের প্রতি কড়া নজর রাখবে। ধরা পড়লে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ তাদের সরকারের নিকটে সমর্পণ করবে। ১৭৭২ সালে কোম্পানি এ আইন রহিত করে। ফলে নতুন জমিদাররা দস্যু-তস্করকে ধরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতিপালন করে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অংশীদার হতে থাকে। এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, এসব দস্যু-তস্কর কারা ছিল এবং কারা ছিল গ্রামবাংলার লুণ্ঠিত হতভাগ্যের দল। ১৯৪৪ সালে Calcutta Review-এ প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়, এসব নতুন জমিদার দস্যু-তস্করদেরকে প্রতিপালন করত ধন অর্জনের উদ্দেশ্যে। ১৭৯৯ সালে প্রকাশিত ঢাকা-জালালপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টেও এসব দুষ্কৃতি সত্য বলে স্বীকার করা হয়।[৩১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুসলিম জমিদারদের উৎখাত করে শুধু এক নতুন জমিদার শ্রেণিরই পত্তন করেনি, নতুনভাবে জমির খাজনা নির্ধারণের অধিকার তাদের দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে তারা চরম স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেয়। এসব জমিদার সরকারি রাজস্বের আকারে অতি উচ্চহারে ঠিকাদার তথা পত্তনিদারদের নিকট তাদের জমিদারির ভার অর্পণ করত। তারা আবার চড়া খাজনার বিনিময়ে নিম্নপত্তনিদারদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করত। এভাবে সরকারের ঘরে যে রাজস্ব যেত, তার চতুর্গুণ-দশগুণ প্রজাদের নিকট থেকে জোরজবরদস্তি আদায় করা

---

৩০. Hunter, The Indian Mussalmans, অনুবাদ, আনিসুজ্জামান, পৃষ্ঠা ১৪১।

৩১. Muinuddin Ahmad Khan, Muslim Struggle for freedom in India, 10.

হতো। বলতে গেলে, এ নতুন জমিদার শ্রেণি রায়তদের জীবন-মরণের মালিক-মোখতার হয়ে দাঁড়ায়।

ফরিদপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অফিস থেকে এমন কিছু সরকারি নথিপত্র পাওয়া যায়, যার থেকে এ তথ্য প্রকাশিত হয়, অন্ততপক্ষে ২৩ প্রকার 'অন্যায় ও অবৈধ' আবওয়াব রায়তদের নিকট থেকে আদায় করা হতো। বুকানন বলেন : 'রায়তদের বাড়ি থেকে ধরে এনে কয়েক দিন পর্যন্ত আটকে রেখে মারপিট করে খাজনা আদায় করা একপ্রকার স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। উপরন্তু নিরক্ষর প্রজাদের নিকট থেকে জাল রসিদ দিয়ে জমিদারের খাজনা থেকে তারা আত্মসাৎ করত।'[৩২]

এসব অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শহিদ মাওলানা তিতুমির।

সামগ্রিকভাবে বাংলার মুসলিম সমাজের অবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কেমন ছিল, তার একটা নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করতে হলে জানতে হবে এ সমাজের তিনটি প্রধান উপাদান বা অঙ্গ ও অংশে কী অবস্থা বিরাজ করছিল। সমাজের সে তিনটি অঙ্গ ও অংশ হলো : নবাব, উচ্চশ্রেণি ও কৃষক-প্রজা শ্রেণি।

১. নবাব

পলাশি যুদ্ধের পর বাংলা শাসকরা কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম কোম্পানিকে ভ্যাটস্বরূপ দিতে হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসাবাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু কোম্পানি ও তাদের সাদা-কালো কর্মচারীদের বিপুল উপঢৌকনাদি দিতে হতো। মির জাফর যেসব উপঢৌকন দিয়েছিল, কোম্পানির ১৭৭২ সালের সিলেক্ট কমিটির হিসাব অনুযায়ী তার মূল্য ছিল ১২ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড। ১৭৬৫ সালের পর নবাবকে বার্ষিক ভাতা দেওয়া হয় ৫৩,৮৬,০০০ টাকা। ১৭৭০ সালে তা হ্রাস করে করা হয় ৩২ লাখ এবং ১৭৭২ সালে মাত্র ১৬ লাখ টাকা। পূর্বে নবাবরা তাদের অধীনে বহু মুসলিমকে চাকরিতে নিয়োজিত করতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য, জায়গির প্রভৃতি দান করতেন। সেসব বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অনেকে জীবিকার তাগিদে বাংলা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান এবং অবশিষ্টরা দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হতে থাকেন।

২. সম্ভ্রান্ত বা উচ্চশ্রেণির মুসলিম

সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা বিজয়ীর বেশে অথবা দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী হিসাবে বিভিন্ন সময়ে এ দেশে আগমন করেন। এরপর তারা এ দেশকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে একেই চিরদিনের আবাসভূমিরূপে গ্রহণ করেন। বিজয়ী হিসাবে স্বভাবতই তারা

---

৩২. M. Martin, The History, Antiquities, Topography & Statistics of Eastern India, London-1838, Vol. 2.

সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার রাখতেন। এ প্রসঙ্গে হান্টার বলেন, একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার তিনটি প্রধান সূত্র থেকে সম্পদ আহরণ করত—সামরিক বিভাগের নেতৃত্ব, রাজস্ব আদায় এবং বিচার ও প্রশাসন বিভাগে চাকরি থেকে।

প্রথমটি বলতে গেলে তাদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। অনেকের জানা আছে, মির জাফর ৮০ হাজার সৈন্যকে চাকরি থেকে অপসারণ করেছিলেন। নাজমুদ্দৌলা তার মর্যাদা রক্ষার্থে যে পরিমাণ সৈন্যের প্রয়োজন হতো তাই রাখতে পারত। তা না করায় বাংলা-বিহারের কয়েক লক্ষ মুসলিম বেকারত্ব ও দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়েছিল।

হান্টার বলেন, জীবিকার্জনের সূত্রগুলোর প্রথমটি হচ্ছে, সেনাবাহিনী। সেখানে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হয়ে যায়। কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান আর আমাদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে পারে না। যদিও কদাচ আমাদের সামরিক প্রয়োজনে তাদের কোনো পদ দেওয়া হলেও তা থেকে তার অর্থোপার্জনের কোনো সুযোগই থাকত না।

তাদের অর্থোপার্জনের দ্বিতীয় সূত্র ছিল রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। কিন্তু ওপরে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে নিম্নপদস্থ হিন্দু রাজস্ব আদায়কারীরা কোম্পানির অনুগ্রহে এক লাফে মুসলিমদের জমিদারির মালিক হয়ে বসে।

লর্ড মেটকাফ ১৮২০ সালে মন্তব্য করেন, দেশের জমিজমা প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে একশ্রেণির বাবুর নিকটে হস্তান্তরিত করা হয়, যারা উৎকোচ ও চরম দুর্নীতির মাধ্যমে ধনশালী হয়ে ওঠে। এ এমন এক ভয়াবহ নির্যাতনমূলক নীতির ভিত্তিতে করা হয় যার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।[৩৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত মুসলিম কর্মচারী ও ভূমির প্রকৃত মালিকের স্থান অধিকার করে বসে ইংরেজ ও হিন্দুরা।

আবহমানকাল থেকে ভারতের মুসলিম শাসকরা জনগণের শিক্ষা বিস্তারকল্পে মুসলিম মনীষীদের জায়গির, তমঘা, আয়মা, মদদে মায়াশ প্রভৃতি নামে লাখেরাজ ভূসম্পত্তি দান করতেন। বুকাননের মতে একমাত্র বিহার ও পাটনা জেলার ২১ প্রকারের লাখেরাজ ভূমি দান করা হয়েছিল বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে। ইংরেজ আমলে নানান অজুহাতে লাখেরাজদারকে তাদের মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্ধমানের স্পেশাল ডেপুটি কালেকটর মি. টেইলার একদিনে ৪২৯ জন লাখেরাজদারের বিরুদ্ধে তাদের অনুপস্থিতিতে রায় দান করেছিলেন।

---

৩৩. E. Thompson, The life of Charls Lord Metcalfe; A. R. Mallick, British Policy and the Muslims of Bengal.

ইংরেজ সরকারের Tribunals of Resumption-এর অধীনে লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারের পুনর্দখলে নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বোর্ড অব রিভেনিউয়ের জনৈক অফিসার নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন : সরকারের নিয়তের প্রতি লাখেরাজদাররা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ১৪৬৩টি মামলার মধ্যে সবকয়টিতে লাখেরাজদারদের অনুপস্থিতিতে সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর Tribunals of Resumption-এর প্রতি তারা আস্থাহীন হওয়ারই কথা।[৩৪]

মুসলিম লাখেরাজদারদের ন্যায্য ভূমির মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য নানাবিধ হীনপন্থা অবলম্বন করা হতো এবং ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে এ ব্যাপারে এক বিদ্বেষী মানসিকতা বিরাজ করত। লাখেরাজদারদের সনদ রেজেস্ট্রি না করার কারণে বহু লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। জেলার কালেকটররা ইচ্ছা করেই সময়মতো সনদ রেজেস্ট্রি করতে গড়িমসি করত। অনেক চেষ্টা করেও লাখেরাজদাররা সনদ রেজিস্ট্রি করাতে পারত না।

চট্টগ্রামে লাখেরাজদারদের কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য কোনো নোটিশ দেওয়া হতো না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, মামলার ডিক্রি জারি হওয়ার বহু আগে সম্পত্তি অন্যত্র পত্তন করা হয়েছে। ১৮২৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাংলা-বিহারে লাখেরাজদারদের মিথ্যা তথ্য সংগ্রহের জন্য চর, ভুয়া সাক্ষী ও রিজাম্পশন অফিসার পঙ্গপালের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিমদের মামলায় জড়িত করে। এসব মামলায় সরকার ছাড়াও তৃতীয় একটি পক্ষ বিরাট লাভবান হয়। যারা মিথ্যা সাক্ষ্যদান করে এবং যারা সরকারি কর্মচারীদের কাছে কাল্পনিক তথ্য সরবরাহ করে, তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। পক্ষান্তরে মুসলিম উচ্চবিত্ত শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধ্বংস হয়ে যায়। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন :

'ইংরেজরা যখন বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানে বহু মুয়াফি-লাখেরাজ ভূসম্পত্তি ছিল। এর কিছু ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিকাংশ ছিল শিক্ষায়তনগুলোর ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত। প্রায় সব প্রাইমারি স্কুল, মকতব ও বহু উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এসব মুয়াফির আয়নির্ভর ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলেতে তাদের অংশীদারদের মুনাফা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি টাকা তোলার প্রয়োজনবোধ করে। কারণ কোম্পানি ডিরেকটররা এজন্য খুব চাপ দিচ্ছিল। তখন এক পরিকল্পিত উপায়ে মুয়াফির ভূসম্পত্তি

---

৩৪. Comment by Smith in Harvey's Report of 19th June 1840; A. R. Mallick, British Policy and the Muslims of Bengal.

বাজেয়াপ্ত করার নীতি গৃহীত হয়। এসব ভূসম্পত্তির সপক্ষে কঠিন সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার হুকুম জারি করা হয়।

কিন্তু পুরোনো সনদ ও সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ইতিমধ্যে হয় হারিয়ে গেছে, নয় পোকায় খেয়ে ফেলেছে। অতএব প্রায় সব মুয়াফি বা লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বহু বনেদি ভূম্যধিকারী স্বত্বচ্যুত হলেন। বহু স্কুলকলেজের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে বহু জমি সরকারের খাস দখলে আসে। ফলে বহু বনেদি পরিবার নিঃসম্বল হয়ে পড়ে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উপর্যুক্ত মুয়াফির আয়নির্ভর ছিল, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। বহুসংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারী বেকার হয়ে পড়লেন।[৩৫]

উচ্চবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের জীবিকার্জনের তৃতীয় অবলম্বন ছিল সরকারের অধীনে চাকরি—বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগে। কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পরও প্রায় ৫০ বছর যাবৎ তারা চাকরিতে বহাল ছিলেন। কারণ তখন পর্যন্ত সরকারি ভাষা ছিল ফারসি। কিন্তু আকস্মিক ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করা হয়। মুসলিমরা তার জন্য পূর্ব থেকে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ১৮৩২ সালে সিলেক্ট কমিটির সামনে ক্যাপ্টেন টি ম্যাকাম প্রস্তাব পেশ করেন, ক্রমশ ইংরেজি ভাষার প্রচলন করা হোক এবং মুসলিম কর্মচারীদের অন্তত পাঁচ-ছয় বছরের অবকাশ দিয়ে নোটিশ দেওয়া হোক। হন্ট ম্যাকেঞ্জিও অনুরূপ প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, জেলাগুলোতে ক্রমশ এবং পরপর ইংরেজির প্রচলন করা হোক। কিন্তু সহসা সর্বত্র এ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে হাজার হাজার মুসলিম কর্মচারী চাকরি থেকে অপসারিত হন যাদের জীবিকা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত একমাত্র চাকরির ওপর। ১৮২৯ সালে সবরকম শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্কুলকলেজে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। ১৮৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে (তৎকালীন আর্থিক বৎসরের প্রথম দিন) সহসা সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজির প্রবর্তন হয়।

হান্টার সাহেবও এসব সত্য স্বীকার করে বিদ্রুপ করে বলেছেন :

'এখন কেবল জেলখানায় দু-একটা অধস্তন চাকরি ছাড়া আর কোথাও ভারতের এই সাবেক প্রভুরা ঠাঁই পাচ্ছে না। বিভিন্ন অফিসে কেরানির চাকরিতে, আদালতের দায়িত্বশীল পদে, এমনটি পুলিশ সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন পদগুলোতে সরকারি স্কুলের উৎসাহী হিন্দু যুবকদের নিযুক্ত করা হচ্ছে।'

এই পরিবর্তনের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ণ সুফল ভোগ করে। বিভিন্ন কলেজ থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করে তারা সর্বত্র সরকারি চাকরিতে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অঙ্গনে পটপরিবর্তনের ফলে সম্ভ্রান্ত

৩৫. Pandit Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, pp. 376-77.

মুসলিম পরিবারগুলো জীবিকা উপার্জনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র্য, অনাহার ও বিনাশের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. নিম্নবিত্তশ্রেণির মুসলিম : কৃষক ও তাঁতি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের যে চরম দুর্দশা হয়েছিল তার কিঞ্চিৎ ওপরে উল্লেখিত হয়েছে। এ কথা বলা হয়েছে, জমিদার ও প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে আরও দুটি স্তর বিরাজমান ছিল। যথা পত্তনিদার ও উপ-পত্তনিদার। জমিদারের প্রাপ্য খাজনার কয়েকগুণ বেশি এ দুই শ্রেণির মাধ্যমে রায়তদের কাছ থেকে আদায় করা হতো এবং তাতে করে রায়ত বা কৃষকরা চরমভাবে নিষ্পেষণের শিকার হতো। জমিদার-পত্তনিদারদের উৎপীড়নে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ত। বাধ্য হয়ে তাদের হিন্দু মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হতো। শতকরা ৩৭ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত হারে সুদে তাদের টাকা কর্জ করতে হতো। উপরন্তু তাদের গরু-মহিষ মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে হতো। অভাবের দরুন মহাজনের কাছ থেকে অগ্রিম শস্য গ্রহণ করতে হলে তার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হতো। আবার উৎপন্ন ফসল যেহেতু মহাজনের বাড়িতেই তুলতে হতো, এখানেও তাদের প্রতারিত করা হতো। মোটকথা হতভাগ্য কৃষকদের জীবন নিয়ে এসব জমিদার মহাজনরা ছিনিমিনি খেলে আনন্দ উপভোগ করত।

কৃষকদের এমন দুঃখদুর্দশার প্রতিকারের কোনো উপায় ছিল না। কারণ তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। উপরন্তু জমিদার ও তাদের দালালরা উৎকোচ ও নানাবিধ দুর্নীতির মাধ্যমে খরচ কয়েকগুণে বাড়িয়ে দিত। পরিণামে জমিদার মহাজন তাদেরকে ভিটেমাটি ও জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে পথের ভিখারিতে পরিণত করত।

কৃষকরা ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপন্নের সাথে সাথে নীলচাষও করত। এই নীলচাষের প্রচলন এ দেশে বহু আগে থেকেই ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারত থেকে নীল রং প্রথম ইউরোপে রপ্তানি হয়। ব্রিটিশ তাদের আমেরিকান ও পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশগুলোতে নীলচাষের ব্যবস্থা করে। এগুলো তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর বাংলা প্রধান নীল সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। ১৮০৫ সালে বাংলায় নীলচাষের পরিমাণ ছিল ৬৪,৮০৩ মণ এবং ১৮৪৩ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় দ্বিগুণ। বাংলা, বিহার ও বিশেষ করে ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলোতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশের তত্ত্বাবধানে ব্যাপক নীলচাষ করা হতো। কিন্তু বিদেশি শাসকরা নীলের এমন নিম্নমূল্য বেঁধে দেয় যে, চাষীদের বিঘাপ্রতি সাত টাকা করে লোকসান হয়, যা ছিল বিঘাপ্রতি খাজনার সাতগুণ। তথাপি চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করা হতো। বাংলার নীলচাষীদের ওপরে শাসকদের

অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের মর্মন্তুদ ও লোমহর্ষক কাহিনি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ক্ষমতায় মদমত্ত শাসক ও তাদের দালালদের মানবতাবোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। নতুবা কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে এমন নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো সম্ভব নয়।

দরিদ্র ও দুঃস্থ কৃষকরা বেঁচে থাকার জন্য নীলচাষের মাধ্যমে কিছু অর্থোপার্জনের আশা করত। তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সুযোগে ইংরেজ নীলকররা কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থি বিভিন্ন চুক্তি করতে তাদের বাধ্য করত। অনেক সময় অবাধ্য কৃষকের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। এতেও সম্মত করতে না পারলে জাল চুক্তিনামার বলে তাদের জমাজমি জবরদখল করে নীলকররা তাদের কর্মচারীদের দ্বারা সেসব জমিতে নীলচাষ করাত। কখনো কখনো অত্যাচারী জমিদার তার প্রজাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে নীলকরদের দিয়ে দিত। একবার অ্যাশলি ইডেন নীল কমিশনের সামনে ১৮৬০ সালে সাক্ষ্যদানকালে বলেন, বিভিন্ন ফৌজদারি রেকর্ড থেকে জানা যায়, উনপঞ্চাশটি ঘটনা এমন ঘটেছে, যেখানে নীলকররা দাঙ্গা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি, লুটতরাজ ও বলপূর্বক অপহরণ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে জড়িত রয়েছে। এর বহু বৎসর পূর্বে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট একজন খ্রিষ্টান মিশনারির সামনে মন্তব্য করেন, মানুষের রক্তে রঞ্জিত হওয়া ব্যতীত একবাক্স নীলও ইংল্যান্ডে প্রেরিত হয় না।[৩৬]

নীলচাষীদের দুঃখদুর্দশা প্রতিকারের কোনো উপায় ছিল না। চৌকিদার-দফাদারের সামনে চাষীদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হলেও চৌকিদারদের ঘুণাক্ষরেও সে কথা প্রকাশ করার সাধ্য ছিল না। একবার নিষ্ঠুর নীলকররা একটি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করলে তা নির্বাপিত করার জন্য এক ব্যক্তি চিৎকার করে লোকজন জড়ো করে। এর জন্য তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে আহত অবস্থায় একটি অন্ধকার কক্ষে চার মাস আটকে রাখা হয়। ওদিকে আবার নীলকররা পুলিশকে মোটা ঘুষ দিয়ে বশ করে রাখত।[৩৭]

হতভাগ্য অসহায় কৃষকরা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকেও কোনো প্রকারের প্রতিকার ও ন্যায়বিচারের আশা করতেন না। উক্ত নীল কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাদা চামড়ার ম্যাজিস্ট্রেটরা নিজ দেশবাসীর পক্ষই অবলম্বন করত। ফৌজদারি আইনকানুন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, ইংরেজ প্রজাকে শাস্তি দেওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। একজন দরিদ্র প্রজা সুদূর প্রত্যন্ত এলাকার তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ফেলে কলকাতায় গিয়ে মামলা দায়ের করার সামর্থ্য ও সাহস রাখতেন না। কারণ তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জানমাল-

---

৩৬. ১৮৬১ সালের নীল কমিশন রিপোর্ট এবং ক্যালকাটা খ্রিষ্টান অবজার্ভার, নভেম্বর, ১৮৫৫ সাল।

৩৭. নীল কমিশন রিপোর্ট, ১৮৬১।

ইজ্জত-আবরু নীলকরদের দ্বারা বিনষ্ট হতো। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে অধিক পরিমাণে নীলচাষ করা হতো। ফলে নিম্নবিত্ত মুসলিম নীলকররাই বেশি অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকারে পরিণত হতো।

তাঁতি

কৃষকদের মতো এ দেশে তাঁতিরাও চরম দুর্দশার শিকার ছিল। বাংলা-বিহারের লাখ লাখ মুসলিম তাঁতশিল্প দ্বারা জীবিকানির্বাহ করত। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই লাভজনক ব্যবসা তাঁতশিল্পের মৃত্যু ঘটেছিল। তবুও উপায়ান্তর না থাকায় যেসব মুসলিম তখন পর্যন্ত তাঁতশিল্প আঁকড়ে ধরে ছিল, ১৮৯১ সালের আদশুমারি অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বিহার প্রদেশ ও বাংলার কয়েকটি জেলায় ছিল ৭,৭১,২৩৭। নদিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের তাঁতিদের পরিসংখ্যান এতে তুলে আনা হয়নি। অতএব কোম্পানি আমলের প্রথমদিকে সমগ্র বাংলা ও বিহারে মুসলিম তাঁতির সংখ্যা অন্তত পক্ষে উপর্যুক্ত সংখ্যার চেয়ে যে ১০ গুণ বেশি ছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এসব তাঁত ব্যবসায়ীদের কীভাবে সর্বনাশ করা হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে আগমনের পূর্বে এ দেশের তাঁতশিল্প উৎকর্ষ সাধন করেছিল। প্রতিটি জেলায় বিশিষ্ট ধরনের অতি উৎকৃষ্ট তাঁতবস্ত্র নির্মিত হতো। চাহিদা মেটানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে কার্পাস আমদানি করা হতো। এসব তাঁতশিল্প থেকে মোটা ও মিহি উভয় প্রকারের বস্ত্র তৈরি হতো। ভারত ছিল মোটা বস্ত্রের বাজার এবং সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হতো। মুসলিম শাসকদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার রেশমজাত অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হতো। মুসলিম শাসকদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার রেশমজাত অতিসূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র দুই শতাব্দীব্যাপী ইউরোপীয় বাজার দখল করে রেখেছিল। মোটা বস্ত্র অথবা অতিসূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্র উভয় বস্ত্র মুসলিম কারকিরদের হাতেই তৈরি হতো।

উইলিয়াম বোল্ট নামক জনৈক ইংরেজ বণিক, কোম্পানি কর্তৃক তাঁতিদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরে বলেন, সকল ব্যবসাবাণিজ্যে ছিল কোম্পানিদের একচেটিয়া অধিকার। ইংরেজ ও তাদের অধীনে হিন্দু বেনিয়া ও গোমস্তারা খেয়াল-খুশিমতো কাপড়ের দর বেঁধে দিয়ে সে দরে নির্দিষ্ট পরিমাণের বস্ত্র সরবরাহ করতে তাঁতিদের বাধ্য করত। নীলকরদের মতো তাঁতিদেরও তাদের স্বার্থবিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হতো। নির্দিষ্ট মানের বস্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণে তাদের বেঁধে দেওয়া দরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে তাঁতিদের বাধ্য করা হতো—ওসব চুক্তিবলে। তাদের বেঁধে দেওয়া দর আবার

বাজারদর থেকে শতকরা ১৫ থেকে ৪০ ভাগ কম হতো। কোম্পানি ও তার অত্যাচারী দালালদের মনস্তুষ্টি লাভ করতে না পারলে তাঁতিদের বেত্রাঘাত করা হতো। এ যেন জ্যান্ত চামড়া খুলে মানুষের মাংস ভক্ষণ করা। আদিম যুগে অরণ্যনিবাসী বর্বর মানুষরা প্রয়োজনবোধে নর-নারীর মাংস দ্বারা যেভাবে ক্ষুধা নিবারণ করত, এ যেন তেমনই এক নির্মমতা।

পরে কোম্পানির ডিরেকটররা বাংলার বস্ত্রশিল্পে চরম আঘাত হানে। তারা বাংলা থেকে তৈরি বস্ত্র ইংল্যান্ডে আমদানি না করে কাঁচামাল হিসেবে কার্পাস ও রেশম আমদানি করতে থাকে। এরপর তারা সুপারিশ করে, রেশমি বস্ত্রের কারিগরদের তাদের তাঁতে কাজ করার পরিবর্তে কোম্পানির কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করা হোক। পরিণামে এ শিল্পপ্রধান দেশটি ইংল্যান্ডের বস্ত্র নির্মাতাদের কাঁচামালের বাজারে পরিণত হয়। ১৭৮৯ সালের পর থেকে ঢাকার সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্রের রপ্তানি হ্রাস পেতে থাকে। ১৭৯৯ সালে শুধু ঢাকা থেকে বস্ত্র রপ্তানি হয়েছিল মাত্র ১২ লাখ টাকার। সেকালের ১২ লাখকে এখনকার টাকার মূল্যমানে অনায়াসে ১২ কোটি বলা যেতে পারে। ১৮১৩ সালে রপ্তানি হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩ লাখ টাকায়। ১৮১৭ সালে ঢাকার উৎপন্ন বস্ত্রের রপ্তানি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

মোটকথা বাংলা বিহারের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করে উপার্জনহীন তাঁতি সম্প্রদায়ের রক্তমাংসে গড়ে ওঠে ম্যানচেস্টারের বস্ত্রশিল্প। ক্রমে রপ্তানিকারক দেশ আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এ দেশে বার্ষিক বস্ত্র আমদানি হতো ১২ লাখ পাউন্ড মূল্যের। ১৮০৯ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৮৪ লাখ পাউন্ড মূল্যের। ব্রিটিশের উদ্দেশ্য ছিল ধীরে ধীরে এ দেশের তাঁতি সম্প্রদায়কে নির্মূল করা, কেননা তারা যে মুসলিম।[৩৮]

তাঁতিদের দুঃখদুর্দশার করুণ চিত্র এঁকেছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর *The Discovery of India* গ্রন্থে। তিনি বলেছেন : 'এসব তাঁতির পুরোনো পেশা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নতুন কোনো পেশার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। উন্মুক্ত ছিল শুধু মরণের দ্বার। মরলও লাখ লাখ। লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৪ সালের রিপোর্টে বলেন, বাণিজ্যের ইতিহাসে তাদের দুঃখদুর্দশার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ নেই। তাদের কঙ্কালে ভারতের পথঘাট ভরে গিয়েছে।[৩৯]

মোটকথা, পলাশির যুদ্ধে এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দেওয়ার পর থেকে একশ বছরের সঠিক ইতিহাস ও বিভিন্ন তথ্যাবলি থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, এ সময়কালের ইতিহাস বাংলার মুসলিমদের শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ও হত্যাযজ্ঞের

---

৩৮. আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ।

৩৯. Pandit Nehru, The Discovery of India, p. 352.

শিকার হওয়ার করুণ ইতিহাস। এতে ইন্ধন জুগিয়েছে, সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করেছে কোম্পানির সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় 'বাবুর' দল। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য তারা লাভ করে পূর্ণমাত্রায়। আর তা হলো, দেশের প্রায় সব জমিদারি, জোতদারি প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসব 'বাবুর' হাতে 'চিরকালের' জন্য পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগের জন্য তুলে দেওয়া হয়। এরা অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের মালিক হয় উৎকোচ, সুদ ও দুর্নীতির মাধ্যমে।[৪০]

শোষণ-নিষ্পেষণের মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত হলো, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাংলার লোক মরেছে তিনভাগের একভাগ। চরম অবনতি ঘটে চাষাবাদের। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস হিসাব কষে ও কড়া চাপে নির্ধারিত রাজস্বেরও বেশি টাকা আদায় করলেও মুমূর্ষু কৃষকদের দুঃখ মোচনের জন্য তা থেকে সামান্যও খরচ করেনি। বরং বাকেরগঞ্জ জেলার ৩৩,৯১৩ মণ চাউল বিক্রি করে তিনি ৬৭,৫৯৩ টাকা মুনাফা করেছিলেন এবং ঢাকার ৪০,০০০ মণ চাউল বাঁকিপুরের সেনানিবাসে গুদামজাত করেছিলেন।[৪১]

আবদুল মওদুদ আরও বলেন, যে তাজমহলকে স্থপতিরা পৃথিবীর বুকে স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করেন, যার নির্মাণকর্মে ২৩ কোটি ডলার ব্যয়িত হয়েছিল এবং যার পরিকল্পনামানস সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিজয়ীর মানসকেও ম্লান করে লজ্জা দেয়, সেই তাজমহলটিকে ভেঙে তার মাল-মসলা আত্মসাৎ করার জন্য ভারতে অন্যতম পরম দয়ালু ও কল্যাণসাধক বড়লাট হিসাবে নন্দিত লর্ড বেন্টিংক একবার একজন হিন্দু কন্ট্রাক্টরকে মাত্র দেড় লাখ ডলারে বিক্রয় করারও চুক্তি করেছিলেন।[৪২] ওয়ারেন হেস্টিংস দেওয়ান-ই-খাসের হাম্মামখানাটি উপড়ে নিয়ে বিলাতে চতুর্থ জর্জকে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং লর্ড বেন্টিংক প্রাসাদটির অন্যান্য অংশ বিক্রয় করে ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন।[৪৩]

এমনকি লুণ্ঠিত মহামূল্য 'কোহিনুর' এখনো ইংল্যান্ডের শাহিমহলের শোভা বর্ধন করছে। এই হচ্ছে ইংরেজদের মুখোশের আড়ালের আসল রূপ।

---

৪০. E. Thompson, The life of Charles Lord Metcalfe; A. R. Mallic, British Policy & the Muslims of Bengal.

৪১. আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃষ্ঠা ৬৩।

৪২. The Round the World Traveller, Loreng, p. 379.

৪৩. India, Chirol, p. 54; The Story of Civilization, Our Oriental Heritage by Will Durant, pp. 609-10.

এডমন্ড বার্ক মির্মম সত্য উক্তি করেছেন : 'আজ যদি আমাদের ভারত ছাড়তে হয়, তাহলে ওরাং-ওটাং বা বাঘের চেয়ে কোনো ভালো জানোয়ারের অধিকারে যে এ দেশ ছিল তার প্রমাণ করার কিছুই থাকবে না।[৪৪]

কোম্পানির শাসনামল সমাপ্তির পূর্বক্ষণে জন ব্রাইট বলেছিলেন : 'ভারতের নিরীহ জনগণের ওপর একশ বছরের ইতিহাস হলো অকথ্য অপরাধসমূহের ইতিহাস।[৪৫]

৪৪. আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃষ্ঠা ৬৪।

৪৫. Oxford History of India, p. 680.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলার মুসলিম শাসন পতনের রাজনৈতিক কারণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় ও বাংলার স্বাধীনতার পতন কোনো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফসল নয়। যে রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের ফলস্বরূপ পলাশির বিয়োগান্ত 'নাটকের' সমাপ্তি ঘটে, তা সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের অবশ্যই জানতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের পতন গোটা উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতন ডেকে আনে।

১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত ৫০ বৎসরে কমপক্ষে সাতজন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কারও এ যোগ্যতা ছিল না যে পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবেন। অবশ্য কতিপয় অবিবেচক ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবকে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য দায়ী করেন। ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ধ্বংসের বীজ বহু পূর্বেই স্বয়ং বাদশাহ আকবর কর্তৃক বপন করা হয়েছিল এবং তা ধীরে ধীরে একটি বিশাল মহিরুহের আকার ধারণ করছিল। আওরঙ্গজেব সারাজীবন তাঁর মেধা ও বিচক্ষণতার বলে সে ধ্বংস ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা যদি তাঁর মতো শক্তিশালী ও বিচক্ষণ হতেন তাহলে হয়তো ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। মাওলানা আকরাম খাঁ লিখেছেন :

'আকবরের রাজত্বকালের সমস্ত অপকর্মের পরিণাম-ভোগ তাঁহার মৃত্যুর সাথেই শেষ হইয়া যায় নাই। মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার সকল উত্তরাধিকারীকে জীবনের যথাসর্বস্ব দিয়া এই অপকর্মের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারতের দশ কোটি মুসলমান আজ পর্যন্ত আকবরের অপকর্মের দরুন ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট উত্তরাধিকার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মুসলমান পাঠকদের নিকট এই উত্তরাধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।'[৪৬]

বলতে গেলে আকবর ছিলেন নিরক্ষর অথবা স্বল্পশিক্ষিত। ১৫-১৬ বৎসর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। একটি নিরক্ষর বালক রাজার পক্ষে শত্রু পরিবেষ্টিত দিল্লির রাজশাসন পরিচালনা কিছুতেই সম্ভব হতো না, যদি অতি

৪৬. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।

বিচক্ষণ ও পারদর্শী বাইরাম খান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য না করতেন। সৎসংসর্গ লাভের অভাবে আকবর বিরাট সাম্রাজ্য লাভের পর স্বভাবত ভোগবিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনৈতিকতায় নিমজ্জিত হন। বাইরাম খান তাকে বহু চেষ্টা করেও সুপথে আনতে পারেননি। মদ্যপান ও তার স্বাভাবিক আনুষঙ্গিক পাপাচার এবং তাঁর আশাতীত রাজনৈতিক সাফল্য তাকে চরিত্র গঠন বা সংশোধনের কোনো সুযোগই দেয়নি। কিন্তু তাঁর এই ব্যাধিগ্রস্ত প্রতিভা তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মরণবীজ বপন করে গিয়েছে। মুসলিমদের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল শক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে যে তাদের অপরের রাজনৈতিক ও মানসিক গোলামে পরিণত করে যাচ্ছিল, আকবরের তীক্ষ্ণ অথচ অসুস্থ প্রতিভা তার পূর্ণ সহায়ক হয়েছিল। ভারতে তাঁর রাজনৈতিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আকবর হিন্দুদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং তাদের মনস্তুষ্টির জন্য 'দ্বীনে এলাহি' নামে এক উদ্ভট ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমদের ধর্ম ও তামাদ্দুন ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। *আকবরনামায়* এ সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজন আকবরের জীবনের বৃহত্তম স্বপ্নসাধ এই স্বকপোলকল্পিত 'দ্বীনে এলাহি' হিন্দু জাতিকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারেনি। একমাত্র বীরবল ব্যতীত কেউ এ নবধর্মমত গ্রহণে সম্মত হননি। তাঁর দরবারের নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্ন মানসিংহ ও টোডরমল এ ধর্মমত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আকবর কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা জড়িয়ে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে দরবারে উপস্থিত হলে হিন্দুপণ্ডিত ও সভাসদরা 'দিল্লিশ্বরো' বা 'জগদীশ্বরো' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করতেন এবং ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে তাঁর প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও তাঁর উদ্ভট ধর্মের প্রতি কণামাত্র আনুগত্য প্রকাশ করেননি। অতএব, কোনো এক চরম অশুভ শক্তি শুধু মুসলিমদের তাওহিদ-আকিদা ও ইসলামি তামাদ্দুন ধ্বংসের জন্য আকবরের প্রতিভাকে ব্যবহার করেছে, তা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু আকবর তাঁর জীবনের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়িত করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

এ তো গেল তাঁর জীবনের একদিক। তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও এসেছিল চরম ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের গ্লানি। আকবর ভারতের তদানীন্তন পাঠানশক্তি তথা দুর্ধর্ষ মুসলিম সামরিক শক্তি ধ্বংস করেছিলেন। এ বিধ্বস্ত সামরিক শক্তির বিকল্প কোনো মুসলিম শক্তি গড়ে তোলা তো দূরের কথা, যা অবশিষ্ট ছিল তাও দুর্বল ও নিঃশেষ করে ফেলেন। বাইরাম খান, আহসান খান, মুয়াজ্জাম খান প্রমুখের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আকবরের এ ধ্বংসাত্মক নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি

বহিরাগত বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের বিরুদ্ধেও তিনি দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

এভাবে তিনি শত্রুর ইঙ্গিতে আপন গৃহ নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করেন। মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে এরূপ সকল শক্তি ও প্রতিভা ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে তিনি ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান জাতিগুলো দ্রুত তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করে চলেছে এবং তাদের অশুভ তৎপরতার ঢেউ মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসে আঘাত করছে। ফলে তিনি খ্রিষ্টানদের রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে অসম্মানজনক সন্ধি করেন এবং তাদের ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেও মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঠেকাতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

বিদেশি বিধর্মী শক্তির ন্যায় দেশের অভ্যন্তরেও যে হিন্দুশক্তি দ্রুত মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, তাও আকবরের দৃষ্টির অগোচরে ছিল না। কিন্তু ততদিনে রাজনৈতিকভাবে তিনি হিন্দুশক্তির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তিনি তাদের তুষ্ট করার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। হিন্দু নারীদের স্ত্রীরূপে শাহিমহলে স্থান দিয়ে সেখানে মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজার নিয়মিত অনুষ্ঠান করেও মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হলেন। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে মাটির গড়া মূর্তির আশ্রয় নিয়ে তিনি কী অর্জন করেছিলেন!

ইসলামধর্মকে পুরাপুরি পৌত্তলিকতার ছাঁচে ঢেলে এবং হিন্দুধর্ম অক্ষত রেখে 'দ্বীনে এলাহি' নামে নতুন এক ধর্মের ছায়াতলে ভারতের হিন্দু-মুসলিমকে একজাতিতে রূপান্তরিত করার হাস্যকর পরিকল্পনায় তিনি অসফল হয়েছিলেন। কিন্তু এসব করে তিনি যে মনমানসিকতার সৃষ্টি করে অশুভ উত্তরাধিকার রেখে গেলেন তা শুধু তার সুযোগ্য পুত্র জাহাঙ্গিরই চর্চা করেননি বরং একুশ শতকেও এক শ্রেণির মুসলিম সেই আত্মঘাতী উত্তরাধিকারের চিন্তা লালনপালন করছেন!

মুসলিমদের ধর্ম, জাতীয়তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ যে এক চরম বেদনাদায়ক স্মৃতি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জাহাঙ্গির মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস ত্বরান্বিত করেন। ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় আগমন করলে তাকে রাজকীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গির তাকে ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে গ্রহণ করে খেতাব ও বৃত্তিদান করেন। তিনি বিবাহ করে ভারতে বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করলে শাহি মহলের একজন শ্বেতাঙ্গী তরুণীর সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর থেকে শাহি মহলে খ্রিষ্টধর্মের এত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, কয়েকজন শাহজাদা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তারা হকিন্সের নেতৃত্বে অন্যান্য

খ্রিষ্টান প্রবাসীর সাথে ৫০ জন অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত মিছিল সহকারে গির্জায় গমন করতেন। জাহাঙ্গির তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুবান্ধবসহ সারা রাত শাহি মহলে মদ্যপানে বিভোর থাকতেন। মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবর নিজেই করেছিলেন, তা আগেই বলা হয়েছে। এরপর তাঁর আদর্শহীন মদ্যপায়ী পুত্র জাহাঙ্গির, স্যার টমাস রো ও তাঁর উপদেষ্টা ও গুরু সুচতুর কূটনীতিবিদ রেভারেন্ড ই. ফেবি মিলে এ সমাধি রচনার কাজ ত্বরান্বিত করেন। টমাস রো তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া মঞ্জুর করে নিতে জাহাঙ্গিরকে সম্মত করেন।

সুরাটে প্রতিষ্ঠিত কারখানাটির দ্বারা ইংরেজরা শুধু বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের সুযোগ পায়নি; বরং এ কারখানাটি তাদের একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। শাহি সনদের শর্ত অনুযায়ী শুধু সুরাটে নয়, মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও—আগ্রা, আহমদাবাদ ও ব্রুচে ইংরেজদের কারখানা ও সামরিক ঘাঁটি গড়ে ওঠে। এভাবে আকবর ও জাহাঙ্গির মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে খাল খনন করে দূরদেশ থেকে সর্বগ্রাসী কুমির আমদানি করেন।

একদিকে বিদেশি শক্তি ইংরেজ ভারতে উড়ে এসে জুড়ে বসল, অপরদিকে ভারতের হিন্দুশক্তিও প্রবল হয়ে উঠল। রাজপুত ও মারাঠারা মোগল সাম্রাজ্যের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াল। আকবর যে মুসলিম শক্তির ধ্বংস সাধন করেছিলেন, আওরঙ্গজেব সেই লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধারের আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। মারাঠা ও রাজপুত শক্তি দমনে তাকে দীর্ঘদিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তাঁর পর যদি তাঁর উত্তরাধিকারীরা শক্তিশালী ও বিচক্ষণ হতেন, তাহলে হয়তো পতনোন্মুখ সাম্রাজ্য রক্ষা করা যেত। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আরম্ভ করে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত যে-ই দিল্লির সিংহাসন অলংকৃত করেছেন, তিনিই অযোগ্য, বিলাসী ও অদূরদর্শী প্রমাণিত হয়েছেন।

এ কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অমুসলিম ঐতিহাসিকরা মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের জন্য আওরঙ্গজেবকে দায়ী করেন। বাংলার হোসেন শাহ ও সম্রাট আকবরের উচ্চ প্রশংসায় যতটা তারা পঞ্চমুখ, ততটা আওরঙ্গজেবের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনে তারা সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন। তাকে চরম হিন্দুবিদ্বেষী বলে চিত্রিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তাঁর অনুসৃত হিন্দু স্বার্থের পরিপন্থি শাসননীতি এবং বিশেষ করে জিজিয়া প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ভারতের হিন্দুজাতিকে মোগলদের শত্রুতে পরিণত করেছিল। কিন্তু এ অভিযোগগুলো নিছক কল্পনাপ্রসূত ও দুরভিসন্ধিমূলক। ইতিহাস থেকে এর কোনো প্রমাণ পেশ করা যাবে না। সত্য কথা বলতে গেলে, রাজপুত ও মারাঠারা ভারতের মুসলিম শাসনকে কোনোভাবে সহ্য করত না। তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও শত্রুতার মনোভাব লক্ষ করে আকবর তাদের তুষ্ট করার জন্য অতি উদারনীতি অবলম্বন করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। শিবাজির নেতৃত্বে

মারাঠারা আওরঙ্গজেবের চরম বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি জিজিয়া কর প্রবর্তন করার এক বৎসর পূর্বে, ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজি মৃত্যুবরণ করেন। অতএব জিজিয়া করই হিন্দুজাতির বিরোধিতার কারণ ছিল, এ কথা মোটেই ন্যায়সংগত নয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, তৎকালীন ভারতের ইতিহাস যারা লিখেছিলেন তারা সকলে বলতে গেলে ছিলেন মুসলিম। তাই সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে বাদাউনি, আকবরনামা, কাফিখান, তারিখে ফেরেশতা, মায়াসিরে আলমগিরি প্রভৃতি। কিন্তু ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের বহুকিছু বিকৃত করে পেশ করেছে। পরবর্তীকালে অর্ধপৃথিবীজুড়ে তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। তাদের সাম্রাজ্যজুড়ে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত ছিল। এ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় মুসলিমদের ইতিহাসের এক বিকৃত ও কল্পিত রূপ তারা তুলে ধরেছেন ইংরেজি ভাষার ইতিহাসের ছাত্রদের সামনে। ভারতে ইংরেজদের ২০০ বছরের শাসনকালে এ বিকৃত ও ভ্রান্ত ইতিহাস ছাত্রদের মনমস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছিল।

এ বিকৃতকরণের কারণও ছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কথাই ধরা যাক। বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গির কর্তৃক ইংরেজদের অন্যায়ভাবে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দানের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা শক্তি-বলয় গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলার মির জুমলা ও নবাব শায়েস্তা খান বারবার ইংরেজদের ঔদ্ধত্য দমিত ও প্রশমিত করেছেন। ব্যবসায় দুর্নীতি, চোরাচালান, শাসন-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতির কারণে তাদের বারবার শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল, তাদের কুঠি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একপর্যায়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব ইউরোপীয়দের সাথে তাদের সমস্ত ব্যবসা নিষিদ্ধ করে এক ফরমান জারি করেন। আকবর যে মুসলিম সামরিক শক্তি ধ্বংস করে মোগল সাম্রাজ্যকে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, বাদশাহ আওরঙ্গজেব সেই মুসলিম সামরিক শক্তি পুনর্গঠনে আজীবন চেষ্টা করেছিলেন। খ্রিষ্টান ও হিন্দুজাতির কাছে উপর্যুক্ত কারণে আওরঙ্গজেব ছিলেন চক্ষুশূল। তাই তাঁর শাসনকালকে কলঙ্কিতরূপে চিত্রিত করতে এবং তাঁর নানাবিধ কুৎসা রটাতে তারা তৎপর হয়ে ওঠেন। অমুসলিম ঐতিহাসিকরা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে আলমগির আওরঙ্গজেবের চরিত্রে যেসব কলঙ্ক আরোপ করেছেন, ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির দ্বারা তার সবটাই খণ্ডন করেছেন মাওলানা শিবলি নোমানি তাঁর 'আওরঙ্গজেব আলমগির পর এক নজর' গ্রন্থে। এ সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল গ্রন্থে তিনি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর সমুচিত জবাব দিয়েছেন।

অতএব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যেতে পারে, আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের মধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তাকে কণামাত্র দায়ী করা যায় না। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আকবর কর্তৃক দুর্ধর্ষ মুসলিম সেনাবাহিনীর বিলোপ সাধনের পর ভারতের হিন্দু মারাঠা রাজপুতদের ওপর তাঁর নির্ভরশীলতা, তার পক্ষ থেকে বৈদেশিক ও বিধর্মী ইংরেজদের ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়ার সুবাদে তাদের রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়, মুসলিম শাসন উৎখাতের জন্য হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে অশুভ আঁতাত এবং তার সাথে মুসলিমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পতন ইত্যাদি বাংলা তথা ভারত থেকে মুসলিম শাসন বিলোপের মৌল কারণ বলা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখব, কীভাবে পলাশির আম্র বাগানে বাংলা-বিহারের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন হয়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলার পেছনে তাদের বিরাট রাজনৈতিক অভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল। ব্যবসাবাণিজ্য করতে এসে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক-মোখতার হয়ে পড়া কোনো আকস্মিক বা অলৌকিক ঘটনার ফল নয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসার পথ উন্মুক্ত হয় এবং ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ফলে আমেরিকায় স্প্যানিশ সাম্রাজ্য, মশলার দ্বীপে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফরাসি সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে অগ্রগতির নীতি (Forward Policy) অবলম্বন করে এবং যেসব বাণিজ্যিক এলাকায় তাদের প্রতিনিধিরা বাস করত তারা একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হোক এ ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য।

১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা ওলন্দাজদের নিকট ইন্দোনেশিয়ায় মার খেয়ে সেখান থেকে পাততাড়ি গুটায়। পর বৎসর (১৬৮৩ খ্রি.) ইংল্যান্ডের রাজদরবার থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যে সনদ দান করা হয়, তার বলে তারা ভারতের যেকোনো শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সন্ধি করতে অথবা যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার পায়। দ্বিতীয় জেমস কর্তৃক প্রদত্ত সনদে তাদের অধিকতর ক্ষমতা দান করা হয়। এর ফলে তারা ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পরাজিত হয়। ক্যাপ্টেন হিথের নেতৃত্বে 'ডিফেন্স' নামক রণতরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ভারতে পাঠানো হয়। হিথ সুতানটি থেকে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়ে ব্যর্থতার মুখোমুখি হন। এর ফলে কোম্পানির ডিরেকটররা কিছুটা দমে গেলেও ভারতে অবস্থানকারী প্রতিনিধিরা নতুন উদ্যমে

কাজ করে যায়। তাদের দৃষ্টি এবার ফরাসি বণিকদের ওপর নিবদ্ধ হয়। ফরাসিদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছিল পণ্ডিচেরি এবং তার অধীনে মুসলিপট্টম, কারিকল, মাহে, সুরাট প্রভৃতি স্থানে তাদের কারখানা ছিল। পক্ষান্তরে ইংরেজদের বাণিজ্যিক হেড কোয়ার্টার ছিল মাদ্রাজে এবং তার অধীনে বোম্বাই ও কলকাতায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ কারখানা পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে শুরু হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শেষ পর্যন্ত তা যুদ্ধের দিকে গড়ায়। ফরাসিরা তাদের মনোনীত ব্যক্তি মুজাফফর জং ও চান্দা সাহেবকে যথাক্রমে হায়দারাবাদ ও কর্ণাটকের সিংহাসন লাভে সাহায্য করে। ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট দখল করে। এভাবে ইংরেজ ক্রমান্বয়ে দুর্দম হয়ে ওঠে।

সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

পলাশি ও বখসারের যুদ্ধের পর বাংলার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির নামমাত্র মোগল-সম্রাট দ্বিতীয় আলমগির শাহ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি মঞ্জুর করার পর এ অঞ্চলের ওপরে তাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে অর্থনৈতিক বিচারে বাংলার যে চিত্র পাওয়া যায় তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যজনক। পলাশি যুদ্ধের পর মির জাফর প্রমুখ নামমাত্র নবাব থাকলেও সামরিক শক্তির নিয়ন্তা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৬৫ সালের পর দেশের অর্থব্যবস্থাও তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সিরাজুদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য উমিচাঁদ-মির জাফরের সাথে কোম্পানির যে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়, সে চুক্তির দাবি পূরণ করতেই বাংলার কোষাগার শূন্য হয়ে যায়। চুক্তির শর্তমতে কোম্পানিকে ভুয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ ১ কোটি টাকা দিতে হয়। ইউরোপীয়দের ৫০ লক্ষ, হিন্দু নেতাদের ২০ লক্ষ এবং আরমেনীয়দের ৭ লক্ষ। বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই ক্লাইভকে দিতে হয় ৫২ লক্ষ টাকা।[৪৭]

মির জাফর ভুয়া নবাব হিসাবে বাংলার মসনদে আরোহণ করার পর কোম্পানির দাবি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। মির জাফর তাদের যেকোনো উপায়ে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। উপরন্তু রাজস্ব বিভাগ কোম্পানির অধীনে যাওয়ার পর তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হিন্দু ও কোম্পানির তহসিলদারেরা কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখতে শোষণ-নিপীড়নের মাধ্যমে হলেও রাজস্ব আয় বাড়ানোর চেষ্টায় থাকে। যাতে কোম্পানির অর্থভান্ডার ফুলে-ফেঁপে ওঠে।

এর আগে নবাবি আমলে প্রজাদের নিকট থেকে আদায়কৃত সকল রাজস্ব ও অর্থ দেশের জনগণের কল্যাণে ব্যয়িত হতো। কোম্পানি আমল থেকে এই অর্থ ইংল্যান্ডের ব্যাংকে ও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ব্যবসায় লগ্নি হতে থাকে।

১৭৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করে। জনগণের এই ক্রান্তিকালেও তারা রাজস্ব আদায়ে কোনোপ্রকার অনুকম্পা প্রদর্শন করেনি। দুর্ভিক্ষ যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন আগের বছরের তুলনায় ৬ লক্ষ টাকা অধিক রাজস্ব আদায় করা হয়। বাংলা ও বিহার থেকে পরের বছর

---

৪৭. Fall of Sirajuddowla, Dr. Mohar Ali.

অতিরিক্ত ১৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। মানুষ যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল, তখন জনগণের রক্ত শোষণ করে পৈশাচিক উল্লাসে নৃত্য করছিল ইংরেজ ও তাদের রাজস্ব আদায়কারীরা। তখন রাজস্ব আদায় করত কলকাতার হিন্দু বেনিয়া, সুদি মহাজন ও ব্যবসায়ীরা। মানবতার প্রতি এর চেয়ে নির্মমতা ও পৈশাচিকতা আর কী হতে পারে?[৪৮]

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত মাত্র আট-নয় বছরে কোম্পানি ও তার দেশি-বিদেশি সেবায়েতরা কমপক্ষে ৬২,৬১,১৬৫ পাউন্ড হাতিয়ে নেয়। তখন পুতুল নবাবরা কোম্পানিকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা তো দিতই, এ ছাড়াও তাদের সন্তুষ্ট রাখতে বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিত।

আবদুল মওদুদ লেখেন :

পলাশি যুদ্ধের প্রাক্কালে ষড়যন্ত্রকারীরা কী মহামূল্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজদণ্ড এ দেশবাসীর জন্য ক্রয় করেছিল, তার সঠিক খতিয়ান আজও নির্ণীত হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়। কেবল লিখিত বিবরণ থেকে তার কিছুটা পরিমাণ অনুমান করা যায় মাত্র। হিসাবের বাইরে যে বিপুল অর্থ সাগরপথে চালান হতো, তার হিসেব কোথায়?

ব্রিটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতি মানেই পরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী আখ্যান। ঐতিহাসিকরা মোটামুটি হিসাব করে দেখেছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র ২৩ বছরে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চালান হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড। ১৯০০ সালের মূল্যমানের ৩০০ কোটি টাকা।[৪৯]

মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চিখানা থেকে বহুমূল্য মণিমাণিক্যসহ পায় ১৫ লক্ষ পাউন্ড। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রিটিশ স্থলসেনা ও নৌসেনারা পান ৪ লক্ষ পাউন্ড; সিলেক্ট কমিটির ছয়জন পান ৯ লক্ষ পাউন্ড; কাউন্সিল মেম্বররা পান প্রত্যেকে ৫০ থেকে ৮০ হাজার পাউন্ড; খোদ ক্লাইভ পান ২ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউন্ড। তা ছাড়া ৩০ হাজার পাউন্ড বার্ষিক আয়ের জমিদারিসহ পান বাহশাহ প্রদত্ত উপাধি 'সাবাত জং'। তখন বাদশাহ সম্বন্ধে পলাশি বিজয়ী ক্লাইভ বলেন : 'তিনি এত সংযম দেখিয়েছেন যে তাতে তিনি নিজেই অবাক হয়েছেন।' কাউন্সিলের সাহায্যের জন্য মির কাসিম দিয়েছেন নগদ ২ লক্ষ পাউন্ড। মির জাফর নন্দন নাজমুদ্দৌলা দিয়েছেন ১ লক্ষ ৩৯ হাজার পাউন্ড। এ ছাড়া সাধারণ সৈনিক ও কুঠিয়াল ইংরেজরা কত লক্ষ মুদ্রা আত্মসাৎ করেছে তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

বিখ্যাত জরিপবিদ জেমস রেনেল ১৭৬৪ সালে ২২ বছর বয়সে বার্ষিক হাজার পাউন্ডে এখানে নিযুক্ত হন এবং ১৭৭৭ সালে বিলেত ফিরে যান ৩০

---

৪৮. Baden Power-Land system etc., British Policy & the Muslim in Bengal, A. R. Mallick.

৪৯. I. O Miller, quoted by Misra, p. 15.

থেকে ৪০ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করে। এ থেকেই অনুমেয়, কোম্পানির কর্মচারীরা কী পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করতেন। তারা এ দেশে কোম্পানি রাজ্যের প্রতিভূ হিসেবে এবং চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর দেশে প্রত্যাগত হয়ে এরূপ রাজসিক হালে বসবাস করতেন যে, তারা 'ইন্ডিয়ান নেবাবস'-রূপে আখ্যায়িত হতেন।

ক্লাইভ নিজে স্বীকার করেছেন : 'আমি কেবল স্বীকার করি, এমন অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, উৎকোচ, দুর্নীতি ও বলপূর্বক ধনাপহরণের পাশব চিত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়নি।' অথচ নির্লজ্জ ক্লাইভই এমন শোষণযজ্ঞের শিখণ্ডী ছিলেন।[৫০]

[৫০]. মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ৬০-৬২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পলাশির পর ইংরেজ ও হিন্দুদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূচনা

বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের দুটি বৃহৎ জাতি হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির ধারকবাহক—এ দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দুটি স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাসী একই দেশে মিলেমিশে, শান্তিতে ও নির্বিবাদে বসবাস করতে পারল না কেন। পৃথক ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সদ্ভাব, সৌহার্দ ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি কেন? এর জন্য দায়ী কে? তারা কি উভয়ে না কোনো একটি দল? এর সঠিক জবাব ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না নিশ্চয়।

হিন্দু-মুসলিমের বিরোধ ও সংঘর্ষের মূল কারণ যে প্রধানত রাজনৈতিক তাতে সন্দেহ নেই। এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মের নামে স্বজাতিকে ডাক দেওয়া হয়েছে, প্রতিপক্ষকে ধর্ম বিনষ্টকারী, পরস্বার্থ অপহরণকারী, হানাদার, হন্তারক ও ধর্ষক আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রতিপক্ষকে প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংসকারী চিত্রিত করে স্বজাতির মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ উপমহাদেশে হিন্দুশাসনের পরিবর্তে যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হিন্দুজাতি মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। অষ্টম শতকের পর থেকে পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত মুসলিম সামরিক শক্তি, বলতে গেলে যৌবন-জোয়ার জলতরঙ্গ দেশদেশান্তরব্যাপী প্লাবন সৃষ্টি করেছিল। এ অপ্রতিহত শক্তির মুখে স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তিসমূহ টিকে থাকতে পারেনি বলে মুসলিম শাসন প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। এ দেশের বিজিত হিন্দুরা হৃত রাজ্যের জন্য দুঃখে-অপমানে-লজ্জায় মুসলিম শাসন অন্তর দিয়ে মেনেও নিতে পারেনি। তাদের অন্তরাত্মা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। বহু শতকের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও প্রতিহিংসার বহ্নি-বিস্ফোরণ ঘটেছিল মধ্যভারতে—রাজপুত, মারাঠা ও শিখদের বিদ্রোহের কারণে এবং তা সফল হয়েছিল ১৭৫৭ সালে সিরাজুদ্দৌলার পতন ঘটানোর মধ্য দিয়ে। তারপর থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ সময় পর্যন্ত দেড় শতাব্দী মুসলিমরা চরম দুর্দিনে নিপতিত ছিল। হিন্দু ও ইংরেজরা সর্বশক্তি ব্যয়ে মুসলিমদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার লক্ষ্যে বহু চেষ্টা করেছিল এবং

বহু অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। এ সময়কালে হিন্দুরা ইংরেজদের ভূয়সীপ্রশংসা ও বিগত মুসলিম শাসন ও শাসকদের বিরুদ্ধে অকথ্য কুৎসা রটনার চেষ্টা করেছে। বাংলা সাহিত্য ও কবিতা ইসলাম ও মুসলিমদের কাল্পনিক কুৎসায় মসিলিপ্ত হয়ে আছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র এবং সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ছোট-বড় সকল হিন্দু কবি-সাহিত্যিক ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন ইসলাম ও মুসলিমদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করাকে। অনেকের ধারণা, মুসলিমদের চরিত্র বিকৃতকরণের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকলের পেছনে, কিন্তু তাঁর কলমও কম বিষোদ্‌গার বর্ষণ করেনি।

ভারত উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিমের মিলনের জন্য কম চেষ্টা-সাধনা হয়নি। এ ধরনের মিলনের প্রচেষ্টা যখন চলছিল, সে সময়ে শরৎবাবুর লেখা মুসলিমদের খোঁচা দিতে ভুল করেনি; তিনি তাঁর 'দিন কয়েকের কাহিনি' শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছিলেন :

'শুনিতে পাইলাম হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি একদিন জাতীয় সহাসভার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সবাই বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, যাক বাঁচা গেল, চিন্তা আর নাই। নেতারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন, এবার শুধু কাজ, শুধু দেশোদ্ধার। প্রতিনিধিরা ছুটি পাইয়া দলে দলে টাঙ্গা, এক্কা এবং মোটর ভাড়া করিয়া প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ সকল দেখিতে ছুটিলেন। সে ত আর এক আধটা নয়, অনেক। সঙ্গে গাইড, হাতে কাগজ-পেন্সিল- কোন কোন মসজিদ কয়টা হিন্দু-মন্দির ভাঙ্গিয়া তৈয়ার হইয়াছে, কোন ভগ্নস্তূপের কতখানি হিন্দু ও কতখানি মোসলেম, কোন বিগ্রহের কে কবে নাক এবং কান কাটিয়াছে ইত্যাদির বহু তথ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রান্ত দেহে দিনের শেষে গাছতলায় বসিয়া পড়িয়া অনেকেরই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল- *উঃ হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি*।'[৫১]

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলেন :

'ইংরেজদের আর যাহাই দোষ থাক, যে মন্দিরের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই তাহারও চূড়া ভাঙে না, যে বিগ্রহের সে পূজা করে না, তাহারও নাক কান কাটিয়া দেয় না। অতএব যেকোনো দেবায়তনের মাথার দিকে চাহিলেই বোঝা যায় ইহার বয়স কত। স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন-'ওটি অমুক জিউর মন্দির-সম্রাট আওরাংজেব ধ্বংস করিয়াছেন, ওটি অমুক জিউর মন্দির অমুক বাদশাহ ভূমিসাৎ করিয়াছেন, ওটি অমুক দেবায়তন ভাঙিয়া মসজিদ তৈয়ার হইয়াছে

[৫১]. বিজলী, ২৫ আশ্বিন ১৩৩০ সাল।

(ইংরেজ কর্তৃক), ইত্যাদির পুণ্যময় কাহিনিতে চিত্ত একবারে মধুময় করিয়া আমরা অনেক রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।'[৫২]

একই কলমের দ্বারা ইংরেজদের প্রশংসাসহ পুষ্পবর্ষণ করা হচ্ছে এবং অতীতের মুসলিম শাসকদের মুণ্ডপাত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হিন্দুমন্দিরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষিপ্ত করে তোলা হচ্ছে। তাহলে বলতে হবে, হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা প্রহসনমাত্র, তার মধ্যে ঐকান্তিকতার লেশমাত্র নেই।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজ প্রভুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় গেয়ে উঠলেন,

'না থাকিলে এ ইংরাজ
ভাত অরণ্য আজ—কে শেখাতো, কে দেখাতো
কে বা পথে লয়ে যেতো
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জন।'[৫৩]

ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে হিন্দু জমিদার ও কোম্পানি শাসকদের দ্বারা বাংলার মুসলিমরা নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত হচ্ছিল এবং তার প্রতিবাদে বাংলায় হাজি মাওলানা শরিয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন ও সাইয়েদ হাফেজ মাওলানা তিতুমিরের প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। পরবর্তীকালে সাইয়েদ আহমদ শহিদের জিহাদি আন্দোলন সারা ভারতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। এরপর ভারতের প্রথম আজাদি আন্দোলন শুরু হয় ১৮৫৭ সালে। এ সমস্ত আন্দোলন সফল না হওয়ায় ভারতীয় মুসলিমরা ইংরেজদের কোপানলে পড়ে কী অসহনীয় জীবনযাপন করছিল, তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং ইংরেজ কর্তৃক অন্যান্য নানাবিধ অমানুষিক-পৈশাচিক অত্যাচারে মুসলিম সমাজদেহ যখন জর্জরিত, সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখনীর নির্মম আঘাত শুরু করেন মুসলিমদের কষ্টজর্জর দেহের ওপর। তিনি তাঁর *আনন্দমঠ*, *রাজসিংহ*, *দুর্গেশনন্দিনী*, *দেবী চৌধুরানী* প্রভৃতি উপন্যাসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্‌গার করেছেন তা পড়লে বিবেকবান সুস্থ মানুষ অস্থির হয়ে পড়বেন। তিনি তাঁর সাহিত্যে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছেন এবং মুসলিম কর্তৃক 'হিন্দু মন্দির ধ্বংস', 'হিন্দু নারী ধর্ষণ' প্রভৃতি উক্তির দ্বারা হিন্দুদের মনে তিনি প্রতিহিংসার বহ্নি প্রজ্বলিত করার জঘন্য চেষ্টা করেছেন। এর প্রতিবাদে ১৮৯৮ সালে মুসলিম এডুকেশান সোসাইটির

---

৫২. বিজলী, ২৩ কার্তিক ১৩৩০ সাল।

৫৩. শতাব্দী পরিক্রমা, ড. হাসান জামান সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২৮৪।

অধিবেশনে নবাব নওয়াব আলি চৌধুরীর উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করার তীব্র প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবটি প্রকাশের জন্য তখনকার ইংরেজি পত্রিকায়ও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোনো পত্রিকা সেটি ছাপায়নি। উপরন্তু 'ভারতী' পত্রিকায় বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করা হয়েছিল।[৫৪]

সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিমবিদ্বেষ প্রচারণার উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো :

'রাজপুত্রী বলিলেন, আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের লাথি মার। কার লাথিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।'[৫৫]

'ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী—জাহানারা ও রওশনারা। জাহানারা শাহজাহাঁর বাদশাহীর প্রধান সহায়। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিনী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয় পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগতির পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্যটকেরা এমন এক ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না!'[৫৬]

'ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ জেব-উন্নিসা বিবাহ করিলেন না। পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মতো পুষ্পে মধু পান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।'[৫৭]

সতীসাধ্বী মুসলিম রমণীদের চরিত্রে কীভাবে কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে তা ইতিহাসের ছাত্রমাত্র স্বীকার করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'লেখনী কলুষিত করিতে পারিলেন না' বলে খেদ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একজন লোকের নিছক মুসলিম বিদ্বেষের কারণে, বিবেক ও রুচি কতখানি বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত হলে কোনো অন্তঃপুরবাসিনী পর্দানশিন সতীসাধ্বী দ্বীনদার খোদাভীরু মুসলিম রমণীর চরিত্র তিনি এমনভাবে কলঙ্কিত করতে পারেন, তা পাঠকের বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়।

পুণ্যবতী জেবুন্নিসার চরিত্র অধিকতর জঘন্যভাবে চিত্রিত করতে বঙ্কিম বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। না করারই কথা। মুসলিমের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষে আগাগোড়া বাদশাহ আওরঙ্গজেব-আলমগির ও তাঁর বিদূষী কন্যা জেবুন্নিসার চরিত্র জঘন্যরূপে বিকৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনের সাধ মিটিয়েছেন।

---

৫৪. Bengali Muslim Public Opinion as reflected in the Bengal Press-1901-30, Mustafa Nural Islam, PP. 141-42.

৫৫. রাজসিংহ, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্রদলনা।

৫৬. রাজসিংহ, ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জেব-উন্নিসা।

৫৭. রাজসিংহ, ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জেব-উন্নিসা।

'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থে জগৎসিংহের সাথে আয়েশা নাম্নী এক কল্পিতা মুসলিম মহিলার অবৈধ প্রণয়কাহিনি অঙ্কিত হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকার 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্পর্কে বলেন : 'বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সত্য ইতিহাস কতটুকু আছে? মানসিংহ, জগৎসিংহ, কুতলু খাঁ, খাজা ঈসা, ওসমান—ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ। ইহা ভিন্ন 'দুর্গেশনন্দিনী'র আর সব কথা কাল্পনিক।

আয়েশা, তিলোত্তমা, বিমলা সকলে কাল্পনিক। এগুলি আসিয়াছে ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক হাসেবের লেখা হইতে, তিনি কাপ্তান আলেকজান্ডার ডাও (Alexnder Dow)। এই সাহেবটি ফিরিশতা রচিত হিন্দুস্তানের ইতিহাস ইংরাজিতে প্রায়শ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্রে ফিরিশতার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন, যাহা ফিরিশতা তো লেখেন না-ই, এমনটি, কোনও পারসি লেখকের পক্ষে সেরূপ সম্ভব ছিল না।'[৫৮]

এ কথা সত্য, মুসলিমদের ইতিহাস ও চরিত্র বিকৃতকরণে ইংরেজ ও হিন্দু উভয়ে পটুতা প্রদর্শন করেছেন। এই কাজে উভয়ে একে অপরকে ছাড়িয়ে—সমানে সমান।

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে বলছেন : 'দেখ যত দেশ আছে মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন দেশের এমন দুর্দশা, কোন দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন দেশে মানুষ শিয়াল-কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউদের পেটে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকে?'[৫৯]

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যগণ তাদের সাহিত্যে, কবিতায়, প্রবন্ধে মুসলিমদের নামের পূর্বে 'নেড়ে', 'পাতি নেড়ে', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার না করে লেখনী ধারণ করা পাপ মনে করতেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহ ও কল্পিত আয়েশাকে পরস্পর প্রণয়াবদ্ধরূপে দেখানো হয়েছে। তবুও আয়েশাকে যবনী বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা হয়েছে। দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে বলা

---

৫৮. বঙ্কিম রচনাবলি, ষষ্ঠ প্রকাশ-১৩৮২ (উপন্যাস প্রসঙ্গ) পৃষ্ঠা ২৯-৩০।

৫৯. আনন্দমঠ, প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

হয়েছে, 'আয়েশা যবনী হইয়াও তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের অধিক স্নেহাবশত সহচরীবর্গের সহিত দুর্গান্তঃপুরবাসিনী হইলেন।'

আল্লাহ, পবিত্র কুরআন ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্বন্ধে উপহাস করে 'আনন্দমঠের' চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে :

'মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, আল্লা-আকবর! এতনা রোজের পর কোরআন শরীফ বেবাক কি ঝুটা হলো? মোরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করি, তা এই তেলককাটা হিঁদুর দল ফতে করতে নারলাম?'

বিপিন চন্দ্র পাল 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

'আনন্দমঠে তিনি দেশমাতৃকাকে মহাবিষ্ণুর বা নারায়ণের অংশে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্বমানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। মহাবিষ্ণুকে বা নারায়ণকে বা বিশ্বমানবকে ছাড়িয়া দেশমাতৃকার পূজা হয় না। এ কথাটা আনন্দমঠের একটা অতি প্রধান কথা।'[৬০]

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেখেন :

"আনন্দমঠের' সারকথা হলো ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করে উৎপীড়নমূলক মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানো। শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, ভারতে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আদর্শে 'আনন্দমঠ' উদ্দীপ্ত।'[৬১]

মোটকথা, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লিখে একদিকে মুসলিমজাতির বিরুদ্ধে তাঁর স্বজাতিকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন এবং 'বন্দেমাতরম' সংগীতের মাধ্যমে ধর্মের নামে—দেবী দেশমাতৃকার নামে হিন্দুজাতির মধ্যে পুনর্জাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। এ পুনর্জাগরণ সম্ভব মুসলিম দলনে এবং ব্রিটিশ শাসনকে এ দেশে স্বাগত জানিয়ে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করে—এ ভাবধারা আনন্দমঠের ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত। 'আনন্দমঠের' বন্দেমাতরম মন্ত্রের সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে।

এ প্রসঙ্গে আবদুল মওদুদ বলেন :

'সন্ত্রাসবাদ বাংলার মাটিতে আসন খুঁজে পায়নি উনিশ শতকে এবং ভদ্রলোকদের সহানুভূতিও লাভ করেনি। ১৯০৩ সালের পূর্বে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লন্ডন থেকে কলকাতায় প্রত্যাগমন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন সহানুভূতি পাননি।

---

৬০. নবযুগের বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১০৯।

৬১. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা, ১১শ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০।

বিফল হয়ে তিনি বরোদায় বড়দাদা অববিন্দ ঘোষের নিকট গমন করেন। অরবিন্দ ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষিত। তিনি তখন গায়কোয়াড় কলেজের ভাইসপ্রেসিডেন্ট ছিলেন। বারীন্দ্র বরোদায় বসে অনুধাবন করেন, রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত না করলে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজ হবে না। এজন্য তিনি গীতাপাঠের সঙ্গে রাজনীতির পাঠ দেবার উদ্দেশ্যে 'অনুশীলন সমিতি'র পরিকল্পনা করেন ও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

সুযোগ মিলল ১৯০৪ সালে, অরবিন্দ এসে যোগ দিলেন ১৯০৫ সালে। বাংলা বিভাগ কার্যকর হলো, বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। 'বঙ্গমাতার' অঙ্গচ্ছেদ বলে বিভাগটার ধর্মীয় রূপ দেওয়া হলো এবং সমগ্র হিন্দু বাংলা আন্দোলনে মেতে উঠল।'[৬২]

'আনন্দমঠের' বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করার ফলে বাংলার মাটিতে সন্ত্রাসবাদ জন্মলাভ করে। অরবিন্দ ঘোষের স্বীকৃতিই তার প্রমাণ। ১৯০৭ সালের ১৬ এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হলো :

> 'The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a saint and a nation-builder.'

অর্থাৎ, 'প্রথম দিককার বঙ্কিম একজন কবি ও শিল্পী—শেষ দিককার বঙ্কিম ঋষি ও জাতি গঠনকারী।' তিনি আরও বলেন :

> 'It was thirty two years ago that Banking wrote his great song The Maitra had been given and in a Single Day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The mother had revealed herself A great nation which has had that vision can never again be placed under the foot of the conqueror.'

অর্থাৎ 'বত্রিশ বছর বয়সে বঙ্কিম তাঁর বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সংগীত রচনা করেছিলেন। মন্ত্র ফুঁকে দেওয়া হলো, আর একদিনেই গোটা জাতি দেশমাতৃকার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। দেশমাতা আত্মপ্রকাশ করলেন সেই স্বপ্নসাধ পূরণ করতে যে সে এক বিরাট জাতি, সে আর বিজেতার পদতলে দলিত হবে না।'[৬৩]

বঙ্কিম সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের প্রতি বিষোদ্‌গারের বিরুদ্ধে বিংশতি শতকের প্রথম পাদে মুসলিম পত্রপত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। মানে তিনি তার ভুলগুলো

---

৬২. আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতি রূপান্তর, পৃষ্ঠা ২০২।

৬৩. শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগাল [বঙ্কিম রচনাবলি গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিম পরিচিতি লেখক], পৃষ্ঠা ২৫-২৬।

সংশোধন করেননি। যে কারণে হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও হিংস্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'ইসলাম প্রচারক'-এ একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল :

'ইংরেজ এবং মুসলমানদের উৎখাত করার সংকল্প নিয়ে সর্বশ্রেণির হিন্দুদেরকে—উচ্চশিক্ষিত থেকে স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত—লাঠিখেলা ও কুস্তি শিক্ষার জন্য দলে দলে ভর্তি করা হচ্ছে। তাদের ভয়াবহ গতিবিধি সারা বাংলার বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে। এসব ঠগেরা কুমিল্লায় একজন মুসলমানকে হত্যা করেছে, জামালপুরে দুজনকে জবাই করেছে এবং হিন্দু ও মুসলমান ফকির সন্ন্যাসীদের ছদ্মবেশে সারা বাংলায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। মৌলভীর ছদ্মবেশে তারা হিন্দুদের লুণ্ঠন করার, হিন্দু বিধবাদের বিবাহ করার এবং হিন্দু নারী ধর্ষণের জন্য মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করছে এই বলে যে, এ ব্যাপারে সরকার এবং ঢাকার নবাবের কাছ থেকে নিশ্চিত সাহায্য পাওয়া যাবে।'[৬৪]

'ইসলাম প্রচারকের' এই সংখ্যায় আরও সংবাদ পরিবেশিত হয় যে, পাঞ্জাবে হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা এবং বিশেষ করে আর্যসমাজী কংগ্রেসী টাউটদের তৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলিম সমিতিগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন, এসব হিন্দু সন্ত্রাসবাদ ও অরাজকতার সাথে মুসলিমদের কোনো সংযোগ নেই।

আমাদের আলোচ্য বিষয় 'সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ'। এ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূল উৎস কঙ্কিম সাহিত্য। বঙ্কিম সাহিত্যে মুসলিমদের 'যবন', 'ম্লেচ্ছ', 'নেড়ে', 'পাতি নেড়ে' প্রভৃতি ইতররূপে আখ্যায়িত করে এ যবন ও ম্লেচ্ছ নিধনকে হিন্দুজাতির ব্রত ও পুণ্যকর্ম হিসাবে দেখানো হয়েছে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র এ যবন নিধনে তাদের প্রেরণা জোগায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একদিকে যখন হিন্দু-মুসলিম মিলনের গান উচ্চারিত হচ্ছিল সারা দেশে, তখন হিন্দু-মুসলিমের যুক্ত বৈঠক ও সভাসমিতিতে অনিবার্যরূপে গাওয়া হতো 'বন্দেমাতরম' সংগীত। মুসলিমদের বহু আপত্তি ও প্রতিবাদসত্ত্বেও তারা এ থেকে নিবৃত্ত হননি।

মাসিক পত্রিকা 'শরিয়তে ইসলাম' বাংলা ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৯২৮ খ্রি.) হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সভায় 'বন্দেমাতরম' সংগীত বন্ধ করার দাবি জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখে। *The Mussalman*-এর সম্পাদক মৌলবি মজিবর রহমান কংগ্রেসের জাতীয় কমিটির নিকটে সভাসমিতিতে 'বন্দেমাতরম' নিষিদ্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু এতেও কোনো ফল হয়নি।

---

৬৪. মাসিক ইসলাম প্রচারক, সংখ্যা : জৈষ্ঠ্য, সাল ১৩১৪ (১৯০৭ খ্রি.)।

হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের আরেকটি কারণ ছিল মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার এবং হিন্দু জমিদারির অধীনে ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলিমদের গো-কুরবানিতে বাধা দান। এ নিয়ে বহু বাদ-প্রতিবাদে কোনো লাভ হয়নি।

মুসলিম ভারতের ওপরে চরম আঘাত হানে আর্যসমাজীদের 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলন। এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা লালা হরদয়াল কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয়, যা ১৯২৫ সালের ২৫ জুলাই *Times of India*-এ প্রকাশিত হয় :

'হয় মুসলিমদের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা জীবন ও মানসম্মানসহ ভারত পরিত্যাগ করতে হবে।' আর্য সমাজের স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রধান শিষ্য সত্যদেব একই সময়ে ঘোষণা করেন :

'আমরা শক্তি অর্জন করার পর মুসলিমদের নিকটে এ শর্তগুলি পেশ করব, কুরআনকে আর ঐশী গ্রন্থ বলা চলবে না, মুহাম্মদকে খোদার নবী বলে স্বীকার করা যাবে না, মুসলমানি অনুষ্ঠান পর্বাদি পরিত্যাগ করে হিন্দু পর্ব পালন করতে হবে। মুসলমানি নাম পরিত্যাগ করে রামদ্বীন, কৃষ্ণখান ইত্যাদি নাম রাখতে হবে। আরবি ভাষায় উপাসনার পরিবর্তে হিন্দি ভাষায় উপাসনা করতে হবে।'[৬৫]

রাজনৈতিক হাঙ্গামার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল বোম্বাইয়ে যখন হিন্দুনেতা বালগঙ্গাধর তিলক দুটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসবকে প্রাধান্য দিয়ে হিন্দু জনমতকে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করতে থাকেন। এ দুটি উৎসবের একটি হলো 'গণেশের' পূজা আর দ্বিতীয়টি 'শিবাজি' উৎসব। স্কুলকলেজের যুবকদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে, এ দুটি উৎসবকে কেন্দ্র করে হিন্দু ক্ষাত্রশক্তিকে জাগ্রত করা হয়। তিলক শিবাজি উৎসবে পৌরহিত্যকালে ভগবদ্‌গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করেন যে, আত্মকারণে না হলে জাতি বা দেশমাতার কারণে গুরু ও আত্মীয় হত্যায় কোনো পাপ হয় না। তাঁর শিক্ষায় স্কুলকলেজের ছাত্র-শিক্ষক উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করতে থাকে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য।

বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৬ সালে এ আন্দোলন হঠাৎ জোরদার হয়ে ওঠে এবং ভারতব্যাপী 'শিবাজি উৎসব' পালন করে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা জারি করে। এই উৎসবে সকল প্রখ্যাত হিন্দু সমাজনেতা, রাজনীতিবিদ, কবি-সাহিত্যিক সানন্দে যোগদান করেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজি উৎসব' লিখে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগদান করেন। তিনি 'শুভশঙ্খনাদে জয়তু শিবাজি' উচ্চারণ করে এ 'ধ্যানমন্ত্রে' দীক্ষা গ্রহণ করেন :

---

৬৫. আ হিস্ট্রি অব দা ফ্রিডম মুভমেন্ট, পৃষ্ঠা ২৬২ থেকে সংগৃহীত।
সূত্র : Mustafa Nurul Islam, Bengali Muslim public opinion as reflected in the Bengal press 1901-1930, p. 125.

'ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল।
এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন
করিল সম্বল।'[৬৬]

বাংলা তথা সারা ভারতে রাজনীতি ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন একাকার হয়ে গেল। ধর্মীয় উন্মত্ততা রাজনীতির আবহাওয়াকে বিষাক্ত ও কলুষিত করল। ফলে চারদিকে শুরু হলো হিন্দু-মুসলিম সংঘাত ও সংঘর্ষ। একে অপরের রক্তে হাত রঞ্জিত করতে লাগল।

খেলাফত আন্দোলন চলাকালে সাময়িকভাবে হলেও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এ সময়ে হিন্দুরা একরকম বলতে গেলে 'মুসলিম আতঙ্কের' ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। এ ব্যাধি ছড়াচ্ছিলেন প্রধানত বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপৎ রায় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এই চার ব্যক্তি ছিলেন, 'শুদ্ধি সংগঠন' আন্দোলনের উদ্যোক্তা। কংগ্রেসের জাতীয় রাজনীতিতে হিন্দুত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান ছিল সর্বাধিক। উপরন্তু তারা সারা ভারতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দিভাষা প্রবর্তনেরও জোরদার ওকালতি করেছিলেন।

রিয়াজুদ্দীন আহমদ ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোলতান'-এ ১৯২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'রবীবাবুর আতঙ্ক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে আক্ষেপ করে বলা হয়েছিল :

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এ ব্যাধিতে আক্রান্ত বলে আমরা দুঃখিত। তাকে এরূপ বলতে শুনা গেছে, 'ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম শাসন কায়েম হবে। সেজন্য হিন্দুদের মারাত্মক ভুল হবে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেওয়া। মহাত্মা গান্ধিকে মুসলিমরা পুতুলে পরিণত করেছে। তুরস্ক ও খেলাফতের সাথে হিন্দুস্বার্থের কোনোই সংশ্রব নেই।'

...অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে আমরা একজন খ্যাতনামা কবি, বিশ্ববিখ্যাত কবি হিসাবে মানি, কিন্তু তিনি রাজনীতিক নন, ভারতে মুসলিম শাসনের কল্পিত আতঙ্কে তিনি আতঙ্কিত।'[৬৭]

---

৬৬. আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ।
সূত্র : Indian Sedition Committee Report, 1918, p. 2; B. B. Misra, The Indian Middle class : Their growth.

৬৭. Mustafa Nurul Islam, Bengali Muslim public opinion as reflected in the Bengal press, 1901-1930, pp. 147-48.

বলতে গেলে, খেলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদানে আন্তরিকতা ছিল না মোটেই, মুসলিমরা মনে করেছিল, এবার হয়তো হিন্দু-মুসলিমের বিরোধের অবসান ঘটবে। কিন্তু তা হয়নি।

এস. কে. মজুমদার তাঁর 'জিন্নাহ ও গান্ধি' গ্রন্থে লিখেছেন :

'খেলাফত আন্দোলনকালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কোনো জোরদার বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুসলমানদের কাছে এটা ছিল একটা ধর্মীয় আন্দোলন, ভারত স্বাধীন করার কোনো চিন্তা এতে ছিল না। পক্ষান্তরে গান্ধি এটাকে গ্রহণ করেছিলেন নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে। গান্ধিজি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি খেলাফত আমাদের দুইজনের নিকটে কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল—মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নিকট এটা তাঁর ধর্ম। আর আমার নিকট হচ্ছে, খেলাফতের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে গো-নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নির্ভয় করছি। অর্থাৎ আমার ধর্মকে মুসলমানের ছুরিকা থেকে রক্ষা করছি।'

'ধর্ম' বলতে এখানে গান্ধিজি যে 'গোধর্মই' বুঝিয়েছেন, তা না বললেও চলে। মুসলমানের ছুরিকা থেকে 'গোধর্ম' বা গোজাতিকে রক্ষা করার অর্থ হলো ভারতভূমিতে মুসলমানের গো-কুরবানি চিরতরে বন্ধ করা।

১৮৭০ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিমে যত দাঙ্গা হয়েছে তার খতিয়ান বিবেচনা করলে জানা যাবে যে এসবের প্রত্যক্ষ কারণ (Immediate cause) হচ্ছে, প্রথম চার বছর হিন্দুদের দুর্গাপূজা আর মুসলমানের কুরবানি একই সময়ে, বলতে গেলে, একই দিনে হয়েছে। কথা যদি এই হতো যে, ঠিক আছে, উভয়ে উভয়ের উৎসব পালন করুক—হিন্দুরা দুর্গাপূজা করুক, মুসলিমরা কুরবানি করুক। কিন্তু তা নয়। মুসলিমরা গো-কুরবানি করতে পারবে না। আর হিন্দু দুর্গাপূজা তো করবেই। বরং বিসর্জনের দিনে মসজিদের সামনে দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে যাবে। ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা তো অনিবার্য। গায়ে পড়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে মুসলমানকে খুনি আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রায় দেওয়া হবে—'বাবা, এখন জানমাল ও মানসম্মান নিয়ে যে দেশ থেকে এসেছিলে, সেখানে চলে যাও।' এসব পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী করা হচ্ছিল, এমন ভাবার সংগত কারণও আছে। পরবর্তীকালে আর্যসমাজীরা এবং হিন্দু মহাসভার নেতারা এ কথাই বারবার বলেছেন। বঙ্কিম 'আনন্দমঠে' বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন 'যবন-ম্লেচ্ছ' নিধনযজ্ঞের। আর এদের কথা হচ্ছে, 'হত্যাযজ্ঞের পরে যারা তোমরা বেঁচে আছ, এবার ভারত ত্যাগ করো।'

পরিকল্পিত দাঙ্গাহাঙ্গামায় হিন্দুপক্ষ সমর্থনের বড় সাধ ইংরেজদেরও ছিল। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা ছিল তাদের চোখের বালি। ১৮৮৩ সালে জন ব্রাইট লন্ডনে ইন্ডিয়ান কমিটি নামে একটি সমিতি গঠন

করেন এবং ৫০ জন ইংরেজ এমপিকে এর সভ্য করেন। ১৮৮৫ সালে অ্যালেন হিউম ভারতীয় কংগ্রেস গঠন করেন। হিউম বাংলার প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। তিনজন ইংরেজ এই কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং তারাই ইংল্যান্ডে কংগ্রেসের প্রচারকার্য চালিয়ে কংগ্রেসকে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইংল্যান্ডবাসীর কাছে পরিচিত করেন। ১৮৮৮ সালে চার্লস ব্রাডল কংগ্রেসের সার্বক্ষণিক বেতনভুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত হন। লন্ডনে কংগ্রেসের প্রচারকার্যে নিয়োজিত হন উইলিয়াম ডিগবি। কংগ্রেসের প্রচারকার্যে ১৮৮৯ সালে ব্যয়িত হয় ২৫০০ পাউন্ড। ডিগবি প্রচার করতেন, কংগ্রেস ভারতের সব জাতি, সম্প্রদায় ও শ্রেণির একমাত্র মুখপাত্র। এমনকি মুসলিমদেরও।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ভারতভূমি যখন রক্তরঞ্জিত হচ্ছিল, সে সময়ে মুসলিমদের পক্ষে কথা বলার না কোনো ব্যক্তি, না কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল। ব্রিটেনের ইন্ডিয়া কমিটি কংগ্রেসকে সমর্থন করে বলত, 'ভারতে সাম্প্রদায়িক প্রীতি অক্ষুণ্ন আছে।'

ব্রিটেনের ১৯০৫ সালের নির্বাচনে ভারতফেরত বেশ কিছুসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত আইসিএস অফিসার হাউস অব কমন্সের সদস্য হন। তারা ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করেন। স্যার হেনরি কটন ছিলেন তার একজন সদস্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার দায়িত্ব পালনে গৌরব বোধ করতেন। তিনি প্রচার করতেন, 'জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতীয় এক জাতীয়তায় গৌরব বোধ করে।' লাহোর, কার্নাল প্রভৃতি স্থানে যখন প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা লুটতরাজ দ্বারা বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল, তখন হেনরি কটন বলেছিলেন, 'মুসলিমদের স্বার্থ 'হিন্দু' সংবাদপত্র ছাড়া অন্য কোথাও সমর্থিত হয় না।'

তবে খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম মিলনের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর বাংলা তথা সারা ভারতে হিন্দুদের মানসিকতা যেভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারপর খেলাফত আন্দোলনে তার ওপরে যে একটা কৃত্রিম প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এ সময়ের সবচেয়ে মর্মন্তুদ ও লোমহর্ষক ঘটনা হলো মুসলিম মোপলা সম্প্রদায়ের ওপর অমানুষিক ও পৈশাচিক নির্যাতন ও নিষ্পেষণ।

এ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী সংবাদ ভারতের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দুদের পত্রপত্রিকা ও নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে হিন্দু মহাসভা ও আর্য সমাজের নেতারা প্রকৃত ঘটনা অতিমাত্রায় রঞ্জিত করে ভারতে দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত করে। ১৯২২ সালে অমৃতসর থেকে 'দাস্তানে জুলম' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সাহারানপুর থেকে 'মালাবার কি খুনি দাস্তান' নামে

আরেকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকা দুইটির অধিকাংশ সংবাদ অতিরঞ্জিত, কল্পিত ও অনির্ভরযোগ্য সূত্রে গৃহীত ছিল।

প্রথম পুস্তিকায় যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় তার সারাংশ হচ্ছে :

মালাবারের সশস্ত্র মোপলা সম্প্রদায় হত্যা-লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, বলপূর্বক হিন্দুদের ইসলামধর্মে দীক্ষা দান প্রভৃতি কাজে লিপ্ত রয়েছে। বলা হয়েছে, একজন পুরুষ হিন্দুকে প্রথমত তারা গোসল করায়। এরপর মুসলমানি কায়দায় তার চুল কাটানো হয়, তারপর মুসলমানি কালেমা পড়তে বাধ্য করা হয়। মেয়েদের মোপলাদের পোশাক পরিয়ে দেওয়ার পর কান ছিদ্র করে রিং পরিয়ে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পুস্তিকায় বলা হয়, মালাবারের মুসলিমরা হিন্দুদের খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করতে এবং মুসলিম হতে বাধ্য করছে। সম্মত না হলে তাকে ঘরে আবদ্ধ করে তার মুখে গরুর গোশত গুঁজে দেওয়া হয়। তার আপনজন ও আত্মীয়স্বজনকে তার চোখের সামনে মারধর করা হয়। এরপরও মুসলিম হতে রাজি না হলে, তাকে হত্যা করে খণ্ডবিখণ্ড করে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছে, প্রতিমা চূর্ণবিচূর্ণ করা হচ্ছে। হিন্দু সন্ন্যাসীদের গরুর কাঁচা চামড়া পরিধান করতে বাধ্য করা হচ্ছে।[৬৮]

এই ধরনের আজগুবি সব খবর!

হিন্দুজাতির কাছে এই বলে উদাত্ত আহ্বান জানানো হতো :

'হিন্দুজাতি জাগ্রত হও। তোমাদের নিদ্রা তোমাদের মৃত্যু ডেকে আনবে। আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হও। তোমাদের দুর্বলতা তোমাদের ধ্বংস করবে। লাঞ্ছিত জীবনযাপন অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। তোমাদের ভাইয়ের দুঃখ-দুর্দশা তোমাদের নিজেদেরই।'[৬৯]

প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য কেন্দ্রীয় খেলাফতের পক্ষ থেকে গঠিত একটি কমিটির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে যে রিপোর্ট পেশ করে তার সারাংশ ছিল :

সরকারি ঘোষণায় যে মালাবারের ঘটনাবলিকে 'সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করা হয়, তা সঠিক নয়। অবস্থা স্বাভাবিক এবং বিদ্রোহের চিহ্নমাত্র নেই। ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলিমের ন্যায় মোপলারাও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেছে। কিন্তু স্থানীয় খেলাফত কমিটির সেক্রেটারিকে

---

৬৮. A. Hamid, Muslim Scparalismin India, p. 158-159। দাস্তানে জুলম, সেক্রেটারি, মালাবার হিন্দু সহায়ক সভা, অমৃতশহর, ১৯২২।

৬৯. A. Hamid, Muslim Separation in India, p. 159। দাস্তানে জুলম, মালাবার হিন্দু সহায়ক সভা, অমৃতশহর, ১৯২২।

ধরে এনে একটি গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। তার স্ত্রীকে সেখানে এনে তার চোখের সামনে তার চামড়া খুলে ফেলা হয়েছিল। তারপর ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করার তুচ্ছ অপরাধে মোপলাদের জনৈক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে একজন পুলিশ কনস্টেবল মুখে থাপ্পড় দিয়েছিল। অন্য একজন খেলাফতকর্মীকে অন্যায়ভাবে অস্ত্র বানানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অবশেষে পুলিশ মোপলাদের গৃহে বলপূর্বক প্রবেশ করে তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং গৃহের মালিকদের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার করে। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে পুলিশ তাদের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। মোপলা সম্প্রদায় অসীম সাহসী ও যোদ্ধা ছিল। ফলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে তারা জয়ী হয়েছিল। ক্ষিপ্ত মোপলারা অতঃপর টেলিগ্রাফ তার ও রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ পর্যন্ত হিন্দুদের সাথে তাদের পূর্ণ সদ্ভাব বজায় ছিল। কারণ খেলাফতকর্মী হলেও তারা ছিল কংগ্রেসি। তারা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচার করে বেড়াত এবং হিন্দু মহল্লা ও তাদের ধনসম্পদ পাহারা দিত।[৭০]

দুই সপ্তাহ পর বহুসংখ্যক পুলিশ ও সৈন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। 'বিদ্রোহী' মোপলাদের সংবাদ সরবরাহ করার জন্য অধিকাংশ হিন্দু গুপ্তচর কাজ শুরু করে। এর ফলে মোপলারা হিন্দুদের প্রতি রুষ্ট হয়। পুলিশ হিন্দুদেরকে মোপলাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। আর্যসমাজী কর্মীরাও তাদের সাহায্য করে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী মিলিতভাবে মোপলাদের ওপর চড়াও হয়। সামরিক শাসনের অধীনে অমানুষিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাদের কাটাতে হয়। শত শত মোপলা বাস্তুহারা ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শত শত লোক কারাবরণ করে এবং ২০০ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৭১]

Indian Annual Register-এ বর্ণিত হয়েছে যে, পুলিশ ও সরকারি প্রশাসন বিভাগকে পরাজিত করে মোপলারা খেলাফত কায়েম করে এবং শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে। হিন্দুদের পাইকারিভাবে ধর্মান্তরকরণের সংবাদ ভিত্তিহীন। মোপলারা বনেজঙ্গলে আত্মগোপন করে গেরিলা তৎপরতা চালাচ্ছে।

উক্ত রেজিস্টারে একটি তুলনাহীন বর্বরতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, একশ মোপলা বন্দিকে একটি রেলের মালগাড়িতে ঠেসে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে অন্যত্র পাঠানো হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর দরজা খোলা হলে দেখা যায় ৬৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে এবং অবশিষ্টরা মুমূর্ষু। উক্ত রেজিস্টারে

---

৭০. A. Hamid, Muslim Separation in India, p. 159-160। কাশফে হাকিকতে মালাবার, বাদাউন, ১৯২৩।

৭১. A. Hamid, Muslim Scparalism in India, p. 160। কাশফে হাকিকতে মালাবার।

আরও বলা হয়েছে, এ সময়ের মালাবারে কত নির্মম ঘটনা যে ঘটেছে তা আগামীর ইতিহাস রচয়িতারা আবিষ্কার করবে।[৭২]

এ ঘটনাগুলো সারা ভারতের হিন্দু-মুসলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুসলিম ভারতে মর্মাহত হয়ে পড়ে এবং মোপলাদের সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। চতুর্দিক থেকে অপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হিন্দু সংবাদপত্র ও নেতৃবৃন্দ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হিন্দুদের উত্তেজিত করতে থাকে।

সারা দেশে নতুন করে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথম মুহাররম উৎসবকে কেন্দ্র করে। ১৯২৩ সালে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে সাহারানপুরে। সেখানে নিহতের সংখ্যা তিনশর অধিক বলা হয়েছে। পরবর্তী বছর আঠারোটি দাঙ্গাহাঙ্গামায় ৮৬ জন নিহত এবং ৭৭৬ জন আহত হয়। চরম সংঘর্ষ ঘটে কোহাটে। জনৈক হিন্দু কর্তৃক ইসলামবিরোধী কবিতা প্রকাশ করা এর মূল কারণ। দুইদিন ধরে যে দাঙ্গা চলে তাতে ৩৬ জন নিহত এবং ১৪৫ জন আহত হয়, দোকানপাট লুণ্ঠিত হয়, এবং প্রায় ৭০ হাজার টাকার ধনসম্পদ বিনষ্ট করা হয়। পরের বৎসর ১৯২৫ সালে অবস্থা কিছুটা শান্ত থাকলেও ১৯২৬ সালে আবার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। এ বছর সারা দেশে মোট ৩৬টি দাঙ্গা ঘটে। যার ফলে ২ হাজার লোক মারা যায়। এ বছর দাঙ্গার সূত্রপাত হয় কলকাতা শহর থেকে মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যবাজনাকে কেন্দ্র করে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আসার পূর্বে ২০০ দোকান লুণ্ঠিত হয়, বারোটি পবিত্র গৃহ ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১৫০টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে চৌদ্দশ।

১৯২৭ সালে সারা দেশে ৩১টি দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এবার হতাহতের সংখ্যা ১ হাজার ৬০০। নিহতের সংখ্যা ১৪০।

১৯২৮ সালে অবস্থা কিছুটা প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে বোম্বাই শহরে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। যার ফলে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় এগারোশ। বিগত কলকাতা দাঙ্গার ন্যায় এখানেও দোকানপাট লুণ্ঠিত হয়।

১৯৩১ সালে কানপুরে প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ চলে। জনৈক হিন্দু হত্যাকারীর সম্মানে বলপূর্বক দোকানপাট বন্ধ করতে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হয়। বহুসংখ্যক মসজিদ-মন্দির ধ্বংস হয় এবং বহু ঘরবাড়ি অগ্নিদগ্ধ হয়।[৭৩]

---

৭২. A. Hamid, Muslim Senaratism in India, p. 160, Indian Annual Register 1922, p. 266.

৭৩. A. Hamid, Muslim Separation in India, P. 162; Cumming Political India, p. 114-17.

হিন্দু ও মুসলিমের পক্ষ থেকে এসব সংঘর্ষের কথা গান্ধিজিকে বলা হলে তিনি মুসলিমদের ঘাড়েই দোষ চাপান। গান্ধিজি বলেন : 'আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে অধিকাংশ কলহে হিন্দুদের স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। আমার এ মন্তব্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে মুসলিমরা স্বভাবত ষণ্ডা প্রকৃতির এবং হিন্দুরা স্বভাবত ভীরু। আর, যেখানেই ভীরু লোক বিরাজ করে সেখানে ষণ্ডাদল থাকবে।'[৭৪]

মি. গান্ধি হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য ও কলহ দমনে সহায়ক হলেন না। বরঞ্চ তাঁর উপর্যুক্ত মন্তব্য মুসলিমদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং তা হিন্দু দাঙ্গাকারীদের শক্তি জোগায় এবং তাদের পক্ষে বৈধতার সনদ দান করে।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য অথবা তাদের কলহ-কোন্দল যে একটি অন্তরায় এ কথা বুঝতে পেরে মি. গান্ধি যে বিব্রত হননি, তা নয়। তবে হিন্দু-মুসলিম মিলনের সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানে তাঁর কোনো চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়নি।

তিনি একবার বলেন, একমাত্র চুক্তি বা প্যাক্টের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিমের স্থায়ী মীমাংসা হতে পারে। কিন্তু পরে আরও বলেন : প্যাক্টের দ্বারা ঐক্য হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা এক হওয়া যায় না। প্যাক্ট যদি এক হওয়ার ভিত্তি হয়, তাহলে তা হবে একেবারে অর্থহীন; বরং তার চেয়েও খারাপ। প্যাক্টের স্বভাবই হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ। প্যাক্ট একে অপরকে নিকটে টানার বাসনা জাগ্রত করে না, এর দ্বারা ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হয় না, আর তা দলগুলোকে মূল লক্ষ্য অর্জনে একত্রে বাঁধতেও পারে না। একে অপরকে নিকটে টানার পরিবর্তে চুক্তির অধীন দলগুলো একে অপরের কাছ থেকে যথাসম্ভব দাবি আদায় করার চেষ্টা করে। সকলের অভিন্ন স্বার্থোদ্ধারের জন্য ত্যাগস্বীকারের পরিবর্তে চুক্তির অধীন দলগুলো সর্বদা লক্ষ করে, একদলের ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা অন্য দলের মঙ্গল সাধিত যেন না হয়। হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে অন্তরের মিল ব্যতীত 'স্বরাজ' স্বপ্নই থেকে যাবে।

কিন্তু পরক্ষণেই বলেন 'স্বরাজ' সমস্যা অপেক্ষা গো-সমস্যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা গোরক্ষা করতে সক্ষম হব ততক্ষণে আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারব না।'

গান্ধির এসব উক্তি এ কথাই প্রমাণ করে, ভারতীয় স্বাধীনতা হিন্দুদের স্বার্থ হাসিলেরই অপর নাম। লাহোরে একটি ঐক্যসম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি পাঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়ে আতঙ্ক প্রকাশ করেছিলেন। অদূর

৭৪. The Indian Quarterly Register, p. 647; A. Hamid, Separation in India, p. 105.

ভবিষ্যতে পাঞ্জাব একটি রণদক্ষ জাতির আবাসভূমি হয়ে পড়লে উপমহাদেশের শান্তি বিনষ্ট হবে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।[৭৫]

দাঙ্গাহাঙ্গামায় হিন্দু ও মুসলিম সমাজদেহ যখন রক্তাক্ত তখন তিনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব উভয় জাতির কল্যাণস্বার্থে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে আহমদাবাদের নিকটবর্তী সবরমতী আশ্রমে নির্জনবাস শুরু করলেন এবং ভারতীয় রাজনীতির নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে দিন কাটাতে থাকলেন। তবে একেবারে চুপচাপ বসে না থেকে খাদি ও স্বহস্তে নির্মিত বস্ত্রের মহত্ত্ব, ছাগ-দুগ্ধের উপকারিতা, টিকা-ইনজেকশনের অপকারিতা, সোয়াবিনের খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লিখছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন।[৭৬]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতীয় হিন্দুদের মুখোশ উন্মোচিত হলো ১৯৩৭ সালের পর, যখন ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়া অ্যাক্টের অধীন ভারতের প্রদেশগুলোতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হলো; মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হলো, মুসলিম অধ্যুষিত চারটি প্রদেশে এবং হিন্দু অধ্যুষিত সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের দায়িত্ব লাভ করল, তখন বলা হলো, ভারতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ভারতের হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসের দায়িত্বে অর্পণ করতে হবে। তখন ভারতীয় মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান মুসলিম লিগ এ আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছে যে, কংগ্রেসের অধিকারে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে ভারতীয় মুসলিমদের সমস্ত স্বার্থ দলিত-মথিত হবে এবং মুসলিম জাতিকে তাদের ধর্ম, ঐতিহ্য ও তাহজিব-তামাদ্দুন বিসর্জন দিয়ে হিন্দুর গোলামে পরিণত হতে হবে।

১৯৩৭ সালের পর কংগ্রেসের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং মুসলিমদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়। কংগ্রেস মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রিসভা গঠন করে।

নির্বাচনের পূর্বে এরূপ আশা করা গিয়েছিল যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে, বিশেষ করে ইউপি এবং বোম্বাইয়ে মুসলিম লিগ সদস্যদের নিয়ে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করবে। গভর্নরদের এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইউপিতে মুসলিমরা মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ। সেখানে মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুদের প্রভাব বেশি এবং তাদের ঐক্যও দৃঢ়। এ

---

৭৫. মুহাম্মদ আমিন জুবায়রি, সিয়াসতে মিল্লিয়া, পৃষ্ঠা ১৭৫-৮৪।

৭৬. মুহাম্মদ আমিন জুবায়রি, সিয়াসতে মিল্লিয়া, পৃষ্ঠা ১৭০।

কারণে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে এরূপ একটি অলিখিত বোঝাপড়া হয়েছিল, অন্তত দুইজন মন্ত্রী মুসলিম লিগ থেকে নেওয়া হবে। কিন্তু ইউপি ও বোম্বাইয়ে মুসলিম লিগের কোনো সদস্যকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়েছিল না। কংগ্রেস এখানেই মারাত্মক ভুল করল। তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হলো, একমাত্র কংগ্রেস সারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে। যার দ্বারা বিভাজনের পক্ষে কংগ্রেসের অভিমত স্পষ্ট ফুটে উঠল। মুসলিমদের নিকট এটা ছিল হিন্দু শাসনের কাছে নতিস্বীকার করার নামান্তর। ফলে 'ইসলাম বিপন্ন' ধ্বনি উত্থিত হলো এবং আড়াই বছরের 'কংগ্রেসরাজ' ব্রিটিশরাজ থেকে অনেক মন্দ প্রমাণিত হলো।

মি. জওহরলাল নেহরু ও মি. জিন্নাহর মধ্যে ১৯৩৮ সালের প্রথমদিকে যে পত্রবিনিময় হয়েছিল তাতে নেহরুর দাবি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ যুক্ত ভারতের পক্ষে এবং জিন্নাহর দাবি ছিল লিগকে কংগ্রেসের সমমর্যাদাশীল বলে মেনে নেওয়ার। কোনো ফরমুলা বা সমঝোতার ভিত্তিতে এর মীমাংসা সম্ভব হলো না।[৭৭]

ভারতে কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার করা হবে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে ইত্যাদি ধরনের কংগ্রেসের বড় বড় বুলি ১৯৩৭ সালের পর মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের আড়াই বৎসরের শাসন 'হিন্দু রামরাজ' বলে কুখ্যাতি লাভ করে এবং মুসলিমদের প্রতি অন্যায়, অবিচার, তাদের ধর্ম-তাহজিব-তামাদ্দুন বিলুপ্তির প্রচেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা কংগ্রেস সারা ভারতের মুসলিমদের আস্থা হারিয়ে ফেলে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে পাটনায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগ অধিবেশনে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঘোষণা করেন, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতির সব আশা-ভরসা 'কংগ্রেস ফ্যাসিবাদীর' দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ভারতের সর্বত্র মুসলিমদের পক্ষ থেকে অত্যাচারী কংগ্রেস শাসনের অবসান দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকল।

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলিমদের প্রতি কৃত অন্যায়-অবিচারের তদন্তের জন্য মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে তা 'পিরপুর রিপোর্ট' নামে খ্যাত। 'বিহারের মুসলিমদের অভাব-অভিযোগ' শীর্ষক একটি রিপোর্ট পেশ করেন বিহার প্রাদেশিক মুসলিম লিগ কর্তৃক গঠিত কমিটি। একে 'শরিফ রিপোর্ট' বলে অভিহিত করা হয়। 'পিরপুর রিপোর্টের' পর ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে 'শরিফ রিপোর্ট' পেশ করা হয়। এরপর ডিসেম্বর মাসে বাংলার প্রধানমন্ত্রী মি. এ কে ফজলুল হক 'কংগ্রেসের শাসনে মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশা' নামে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

---

৭৭. H. V. Hodson, The Great Divide, p. 63, pp. 66-67.

হিন্দু পত্রপত্রিকা রিপোর্টগুলোতে বর্ণিত অভিযোগগুলো অস্বীকার করে এবং বিহার সরকার 'পিরপুর রিপোর্ট' প্রত্যাখ্যান করেন।

এইচ ভি হডসন তার *The Great Divide* গ্রন্থে বলেন :

'ভারতের ইতিহাসের এ এক সুবিদিত ঘটনা যে, যখন থেকে এ দেশে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বাস করা শুরু করেছে, তখন থেকেই কিছুটা ধর্মীয় উত্তেজনা বিরাজ করে আসছে। যেমন ধরুন গো-পূজা, নামাজের আজানে বাধা দেওয়া, মসজিদ অপবিত্র করা, নারী ধর্ষণ, নারী হরণ প্রভৃতি আক্রমণ। অপরদিকে, রাজনৈতিক ও শাসনসংক্রান্ত নতুন নতুন অভিযোগ উঠছে, বিশেষ করে যা উঠে এসেছে 'পিরপুর রিপোর্টে'। হিন্দির পক্ষে উর্দুকে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে; পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট পক্ষপাতিত্ব করছে; সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে—কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা থেকে তারা কোনোপ্রকার ন্যায়পরায়ণতা আশা করে না; কংগ্রেস কমিটির ব্যাপারে বলা হচ্ছে, কংগ্রেস শাসন মানে হিন্দু শাসন; যেমন সর্বত্র কংগ্রেস পতাকা ওড়ানো হচ্ছে, ইসলামবিরোধী 'বন্দেমাতরম' গীত হচ্ছে এবং 'ওয়ার্ধা স্কিম' অনুযায়ী গ্রাম্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা হচ্ছে। এ হচ্ছে মি. গান্ধির কল্পনাপ্রসূত আদর্শ যার ভিত্তি হচ্ছে অহিংসা, সুতা প্রস্তুতকরণ ও বয়ন এবং ধর্ম থেকে নিবৃত্তি। এর বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিদ্রোহ করতে হয়। কারণ ঐতিহাসিকভাবে তারা প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করে কুরআনভিত্তিক।'[৭৮]

মি. হডসন আরও বলেন :

'কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোর ব্রিটিশ গভর্নররা সাধারণত এমন মত পোষণ করতেন যে, তাদের মন্ত্রীরা যদিও-বা অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়ে দল নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন, কিন্তু জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসিদের ক্ষমতার প্রবণতা তাদের ঔদ্ধত্য ও উত্তেজনাকর আচরণে লিপ্ত করে। মোটকথা, ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্র দ্বারা তা পরিচালিত হবে। আর এর পশ্চাতে এমন একটি সংগঠন থাকবে যে কখনো বিরোধিতা বরদাশত করবে না এবং কাউকে তাদের ক্ষমতার অংশীদার করতেও স্বীকৃত হবে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আড়াই বছরের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনই দ্বিজাতিত্ব-মতবাদ প্রচার ও পাকিস্তান দাবির কারণ বলতে হবে।'[৭৯]

---

৭৮. H. V. Hodson, The Great Divide, pp. 73-74.

৭৯. H. V. Hodson, The Great Divide, pp. 74.

ভারতের হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ ও বিরোধ সমাধানকল্পে কবি ইকবাল ১৯৩৭ সালের ২১ জুন আঙিনা ভাগ করার পরামর্শ দেন। ৭ জুলাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিম-ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ করে পালটা বক্তব্যে বলেন :

'ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামি
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন শয়তানে?'

তারপর ১০ বছর গিয়েছে অধিকতর বিরোধ ও সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে। আড়াই বছরের কুখ্যাত কংগ্রেস শাসনের ইঙ্গিত ওপরে করা হয়েছে। ১৯৩৯ সালের ১৭ অক্টোবর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের প্রতিযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য-সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এক বিবৃতি প্রদান করেন। মুসলিমদের বিক্ষোভের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে নয়, বড়লাটের বিবৃতির সাথে একমত হতে না পেরে কংগ্রেস হাই কমান্ড মন্ত্রিসভাগুলোকে ইস্তফাদানের নির্দেশ দেয়। তারা নীরবে এ নির্দেশ পালন করেন এবং সাতটি প্রদেশ থেকে কংগ্রেসের কুশাসনের অবসান ঘটে। এর জন্য মুসলিম লিগের নেতৃত্বে মুসলিমরা সারা দেশে 'নাজাত দিবস' পালন করে।

মুসলিম লিগের উদ্যোগে সারা দেশে 'নাজাত দিবস' পালন ন্যায়সংগত হোক বা না হোক, কিন্তু একটি বিষয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয় যে, এ দেশে শাসনক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও মিলন আর সম্ভব নয়। অতএব আল্লামা ইকবালের পরামর্শ অনুযায়ী আঙিনা ভাগ করা ব্যতীত স্থায়ী সমাধানের আর কোনো পথ অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু আঙিনা ভাগ করতে সবাই তো রাজি নয়। তাই এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে অধিকতর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে ১০টি রক্তাক্ত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আঙিনা ভাগ হলো। অর্থাৎ ভারতের আঙিনা ভাগ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো। কিন্তু ভারতের আঙিনায় যেসব মুসলিম রয়ে গেল, আঙিনা ভাগ করতে চাওয়ার অপরাধে তাদের চড়া মাশুল দিতে হচ্ছে সেই দিন থেকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পলাশির যুদ্ধ ও সম্পদ পাচার

নবাব সিরাজুদ্দৌলা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। প্রশ্ন হচ্ছে, ইংরেজরা কি নবাবের প্রাসাদষড়যন্ত্রকারীদের আমন্ত্রণে এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, নাকি তারাই মূল ভূমিকা পালন করেছিল, যদি তা-ই হয়, তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল?

প্রথম থেকেই তরুণ নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানির প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এর সর্বজনবিদিত তিনটি কারণ ছিল—অতিরিক্ত দুর্গ নির্মাণ প্রশ্ন, ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ সিয়ারের দেওয়া দস্তকের অপব্যবহার এবং ৫৩ লাখ রুপির তহবিল আত্মসাৎ করে কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া কৃষ্ণদাসকে ফেরত দিতে অস্বীকৃতি। এ সমস্যাগুলো তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের আগে থেকেই ছিল। তরুণ নবাব কোম্পানিকে অতিরিক্ত দুর্গ নির্মাণ বন্ধ, দস্তকের অপব্যবহারের অবসান এবং কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোম্পানি নবাবের কোনো কথায় কর্ণপাত করেনি। অন্যদিকে কোম্পানির কলকাতার কর্তাব্যক্তিরা এমন আচরণ করেন, যা প্রমাণ করে, নবাবের প্রতি তারা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা পোষণ করেন না। অপরদিকে তারা সিরাজুদ্দৌলার খালা ঘসেটি বেগমের পছন্দের সিংহাসনের অপর দাবিদার শওকত জংকে সমর্থন করেন।

এভাবে নবাব ও কোম্পানির মধ্যে আরেক বিবাদের সূত্রপাত হয়। যা-ই হোক, প্রথমদিকে নবাব ত্বরিতগতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রমাণ দেন। তিনি তাঁর খালাকে গৃহবন্দি করেন ও কলকাতা দখল করেন এবং তাঁর খালাতো ভাই শওকত জংকে পরাজিত করেন। নবাবের স্বল্পকালীন শাসনকালের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে ভালো সময়, কিন্তু এখানেই তাঁর পতনের সূত্রপাত হয়। পতনের সূচনা ঘটে মাদ্রাজ কাউন্সিল থেকে প্রেরিত কর্নেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের দ্বারা কলকাতা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে। নবাব কলকাতা পুনরুদ্ধারের এক সাহসী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন এবং আলিনগরের অবমাননাকর চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির আওতায় কোম্পানি সব বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ফিরে পায়, আর্থিক ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি লাভ করে, কলকাতাকে সুরক্ষিত করা এবং মুদ্রা তৈরি করার অধিকার লাভ করে। অতঃপর ইংরেজ কোম্পানি ফরাসিদের অধীনে থাকা চন্দননগর দখল করে।

তখন থেকে নবাবের গুরুত্বপূর্ণ সভাসদ (মির জাফর, ইয়ার লতিফ খান, খাজা ওয়াজিদ) এবং প্রদেশের বড় শেঠরা (জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদ) সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ দ্বারা তাড়িত ছিল। যেমন মির জাফর প্রদেশের নবাব হওয়ার উদ্দেশ্যে, জগৎ শেঠ নতুন নবাবকে ঋণ দিতে অস্বীকার করায় তাকে যে অপমান করা হয় তার প্রতিশোধ নিতে, উমিচাঁদ তার ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধার জন্য এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এ ষড়যন্ত্রকারীদের পেছনে ছিল বেশ কিছু প্রভাবশালী জমিদার।

প্রদেশে এ ধরনের ষড়যন্ত্র কোনো নতুন বিষয় ছিল না, এ সময়ে নতুনত্ব ছিল ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজ কোম্পানিকে তাদের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিদেশিদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে, যে ক্ষমতা তারা নিজেরা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল। বিদেশিদের সাহায্য না পেলেও অভ্যন্তরীণ শত্রুরা ক্ষমতা দখলের জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। চন্দননগর দখল করার পর ক্লাইভ ও ওয়াটসন মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। কেন ক্লাইভ ও ওয়াটসন তাদের মত পরিবর্তন করেছিল এবং পলাশির ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল? রজত রায়ের মতে, সিরাজুদ্দৌলা আলিনগর চুক্তির ও চন্দননগর হারানোর পরও ফরাসিদের তার দরবারে আশ্রয় দিয়েছিল এবং ফরাসি জেনারেল বুশির কাছে সামরিক সহায়তা চেয়েছিল, যা ইংরেজদের আতঙ্কের কারণ ছিল। এ পরিস্থিতিতে তারা উপলব্ধি করে যে ক্ষমতাসীন নবাবকে আর বিশ্বাস করা যায় না, সুতরাং তার স্থানে এমন কাউকে বসাতে হবে, যাকে তারা বিশ্বাস করতে পারে। এভাবে রজত রায়ের মতে, পলাশি ষড়যন্ত্রের পেছনে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তি জোরালো ভূমিকা পালন করেছিল।[৮০]

সুশীল চৌধুরী এর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইংরেজ কর্মকর্তারাই এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তার মতে, যদিও মুর্শিদাবাদের কিছু সভাসদ সিরাজুদ্দৌলার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাবলি পরীক্ষা করলে ক্লাইভ ও ওয়াটসন যখন মাদ্রাজ থেকে বাংলায় পৌঁছান তখন এখানে ষড়যন্ত্রের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু একসময় তারা মুর্শিদাবাদের বিদ্যমান পরিস্থিতির সুযোগে ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাজ কাউন্সিল যে নির্দেশ দিয়ে ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে বাংলায় পাঠায় তার মধ্যেই এ ষড়যন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল। কাউন্সিলের পক্ষ

৮০. রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, (কলকাতা, ১৯৯৪), অধ্যায় ৪।

থেকে বলা হয়েছিল, 'শুধু কলকাতা পুনরুদ্ধার নয়', 'প্রচুর ক্ষতিপূরণ' আদায় ও চন্দননগর দখল করতে হবে এবং একইসঙ্গে এমন কাউকে ক্ষমতায় বসাতে হবে যিনি ফরাসিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন না। সুশীল চৌধুরী এরপর বলেন, ষড়যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হলো ক্ষমতাসীন নবাবের বিপক্ষে অসন্তোষ তৈরি করা। অতএব এ কথা পরিষ্কার যে মাদ্রাজ কাউন্সিল কেবল আগের সব সুযোগ-সুবিধাসহ কলকাতাই ফেরত চায়নি, একইসঙ্গে তারা ফরাসিদের বিতাড়ন ও বাংলায় 'ক্ষমতার পরিবর্তন' চেয়েছিল। এভাবে দেখা যায় যে যখন রজত রায় অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর অধিক জোর দিয়েছেন তখন সুশীল চৌধুরী মনে করেন, ইংরেজ কোম্পানিই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।[৮১]

ইংরেজ কোম্পানি কেন কলকাতা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল, এর সুযোগ-সুবিধাগুলো ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কেন কোম্পানি একটি ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করেছিল সিরাজুদ্দৌলার পরিবর্তে মির জাফরের মতো একজনকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের সামনে সমকালীন পর্যবেক্ষক এবং পরবর্তী ভাষ্যকারদের অনেক মত রয়েছে :

ক. সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা নবাবের স্বৈরশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল।

খ. হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণির স্বার্থ জড়িত ছিল ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে।

গ. বাংলার অভ্যন্তরীণ সংকট।

ঘ. সম্ভ্রান্ত শ্রেণির সঙ্গে নবাবের সম্পর্কচ্ছেদ।

সুশীল চৌধুরী এসব মতামত প্রত্যাখ্যান করার পেছনে অনেক তথ্যপ্রমাণ দিয়েছেন। নিজের বক্তব্যের পক্ষে তিনি বলেন, ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ করতেই হতো, কেননা কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

তত্ত্বগতভাবে বলতে গেলে কোম্পানির কর্মচারীদের মূল দায়িত্ব ছিল কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করা, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসাই ছিল তাদের মূল উদ্‌বেগ। কিন্তু আরমেনীয় বণিকদের সহায়তায় পরিচালিত ফরাসিদের ব্যক্তিগত ব্যবসার ফলে ১৭৩০ সালের দিকে ইংরেজদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য কমে আসে এবং ১৭৪০ সালের দিকে সংকট আরও ঘনীভূত হয়। ১৭৫০ সালের দিকে ব্রিটিশদের বিপক্ষে ফরাসি-বাংলা জোট গঠনের সম্ভাবনা ইংরেজ কোম্পানির জন্য এক সংকটপূর্ণ

---

৮১. সুশীল চৌধুরী, দ্য প্রিলিউড টু এম্পায়ার, পলাশি রেভ্যুলেশন, ১৭৫৭ (নিউ দিল্লি, ২০০০), বিশেষভাবে পঞ্চম অধ্যায়।

পরিস্থিতি তৈরি করে। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ফিরে পেতে হলে ফরাসিদের বিতাড়িত করতে হতো এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হতো, যা শুধু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের স্বার্থই সংরক্ষণ করত না, সরবরাহের উৎস, বাজারসমূহ, বণিক ও তাঁতশিল্পের ওপরও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের এ ধরনের আচরণ এবং তাদের ব্যবসা বাড়ানোর কার্যাবলি এবং যদি সম্ভব হয় এ প্রক্রিয়ায় ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করাকে (যা ছিল তাদের কাছে গৌণ) উপসাম্রাজ্যবাদ হিসেবে বর্ণনা করা যায়।

এ পর্যায়ে বলতে হয় যে কোম্পানি মাদ্রাজ কাউন্সিলের নির্দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল। ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে বলা হয়েছিল, ক্ষমতায় একরকম পরিবর্তন আনার জন্য (অর্থাৎ ক্ষমতাসীন নবাবের পরিবর্তে অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসানো), বাংলা জয় করার জন্য নয়। ইংরেজ ও ফরাসি কর্মকর্তারা মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা বলতেন। দ্বিতীয়ত বলা যায় কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা, যা কোম্পানির পলাশি ষড়যন্ত্রে জড়ানোর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ফরাসিদের উঠতি বাণিজ্যের বিপরীতে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার শঙ্কা।

কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে তিনি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমস্যার (যেমন ব্যক্তিগত বাণিজ্য) ওপর অধিক জোর দিচ্ছেন এবং ফরাসি-বাংলা জোট গঠনের মতো বড় বিষয়কে খাটো করে দেখছেন। এ হুমকিকে মাদ্রাজ কাউন্সিল গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল, কেননা :

ক. দাক্ষিণাত্যে অ্যাংলো-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিজ্ঞতা

খ. সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রভাব

গ. ক্ষমতাসীন নবাবের ফরাসিপ্রীতি ও ইংরেজবিদ্বেষ।

কলকাতা পুনরুদ্ধার, আলিনগর চুক্তির অবসান এবং চন্দননগর দখলের পরও সিরাজুদ্দৌলা যখন ফরাসি কর্মকর্তাকে তার দরবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং বুশির সঙ্গে সামরিক সহায়তার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন।

এসব অবশ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য সিরাজুদ্দৌলাকে অপসারণ করে অধিক বিশ্বাসযোগ্য কাউকে ক্ষমতায় বসানো বিষয়ে নতুন আবশ্যকতা যোগ করেছিল। এটা ছিল সেই পর্যায় যখন ইংরেজ কর্মকর্তারা উমিচাঁদের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ দরবারের ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে সমঝোতা শুরু করেছিল। পলাশিপূর্ব মির জাফরের সঙ্গে বোঝাপড়া এমন কিছু প্রমাণ করে না যে ইংরেজ কোম্পানির কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল। কোম্পানি ফরাসি হুমকিতে অধিক উদ্‌বিগ্ন

ছিল, সুতরাং তারা মির জাফরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে কোম্পানির শত্রুকে (ফ্রান্স) তার নিজের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করবে।

এরপর দেখা যায়, সিরাজুদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন নবাবকে ক্ষমতায় বসানোর স্বার্থে মুর্শিদাবাদের সভাসদ ও ইংরেজ কোম্পানি একত্র হয়। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, কে প্রথম কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল! যতটুকু জানা যায়, কেবল কোম্পানি ষড়যন্ত্র গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, কোম্পানি এর চূড়ান্ত রূপ দান করেছিল এবং তা বাস্তবায়ন হয়েছিল।

আরেক মতে, ষড়যন্ত্র গঠনে প্রথম পদক্ষেপ অভ্যন্তরীণভাবেই নেওয়া হয়েছিল। সমস্যার প্রকৃতি থেকে এটা প্রকৃতপক্ষে নির্ণয় করা কঠিন যে কোন পক্ষ প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ক্লাইভের ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার কার্যবিবরণী থেকে মনে হয় নবাবের দরবারের অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরাই ক্ষমতা দখলের জন্য অধিক আগ্রহী ছিল। উদ্ধৃতিটি এরূপ : 'নবাব সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষদের নিকট ঘৃণিত; কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহার তার প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্যও কমিয়ে দিয়েছিল এবং একটি বিপ্লব ছিল সর্বসাধারণের দাবি, এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল যে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে (এবং সফলভাবেই) আমরা সহায়তা করি আর না করি।'[৮২]

ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে মির জাফর ও ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে ক্লাইভের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশিতে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ইংরেজদের দলে ছিল গোলন্দাজ পদাতিকসহ ৯০০ গোরা, ১০০ দেশি তোপচি এবং ২১০০ তেলেঙ্গা। অনেকের মতে, নবাবের পক্ষে সেনা ছিল ৫০ হাজার। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মির জাফরের অধীন সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ হাজার, যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি, আর যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের সংখ্যা ৭-৮ হাজার। কিন্তু প্রকৃত বিচারে পলাশির যুদ্ধ কোনো বড় যুদ্ধ ছিল না। সেটি ছিল Skirmish, অর্থাৎ সংঘাত। প্রথমদিকে যুদ্ধে নবাবের সৈন্যবাহিনী সাফল্য অর্জন করেছিল, যদিও মির জাফর এতে অংশ নেয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মির জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের বাহিনী পরাজিত হয়। পাটনায় পালিয়ে যাওয়ার পথে সিরাজুদ্দৌলা ধৃত হন এবং পরে মুর্শিদাবাদে ঘাতকের হাতে নিহত হন। সন্ধির শর্ত মোতাবেক মির জাফর বাংলার মসনদে উপবিষ্ট হন।

সুশীল চৌধুরী বলেছেন : '১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়ের মাধ্যমে যে 'বিপ্লব' ঘটেছিল, তা কেবল ভারতের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের

---

৮২. রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, অধ্যায় ৪, পৃষ্ঠা ২২৩।

ইতিহাসেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত পলাশিই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে।'[৮৩] এর ফলে বলা যায় :

প্রথমত, 'ব্রিটিশদের বাংলা বিজয়ে' পলাশিই একমাত্র ভূমিকা পালন করেনি। এটা সত্য যে ইংরেজ কোম্পানি, বিশেষ করে ক্লাইভ খুব ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এটা একদিনে হয়নি। কয়েকটি পরিস্থিতি ক্লাইভের উত্থানে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেহেতু মির জাফর ক্লাইভকে ৩০ মিলিয়ন রুপি দিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল, সে তার সৈন্যদের বেতনাদি পরিশোধ করতে না পারায় তার সৈন্যরা বিদ্রোহ করল।

নবাবের আমন্ত্রণে ক্লাইভ এই বিদ্রোহ মোকাবিলা করে, কিন্তু এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছিল। এভাবে পরিস্থিতি যতই তার আয়ত্তের বাইরে যাচ্ছিল, মির জাফর ততই ক্লাইভের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল।

দ্বিতীয়ত, কোম্পানি বাংলায় যে ক্ষমতা অধিকার করেছে তার আনুষ্ঠানিক কোনো ভিত্তি ছিল না।

তৃতীয়ত, ইংরেজ কোম্পানি পলাশিতে বিজয়ী হয়েছে নবাবের সেনাপতির (মির জাফরের) বিশ্বাসঘাতকতায়। কিন্তু মির জাফরের বিরুদ্ধে 'মহা বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগ আনা যায় না। কারণ সে যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করেছিল, এজন্যও নয় যে সে চেয়েছিল ইংরেজরা জয়ী হোক, সে নিজে নবাব হতে চেয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বখসারের যুদ্ধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এ সময়ে ইংরেজরা কেবল মির কাসিমের (তৎকালীন বাংলার নবাব) সৈন্যবাহিনীকেই নয়, মোগল সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাবকেও পরাজিত করে। অধিকন্তু এ যুদ্ধের ফলাফল ষড়যন্ত্র দ্বারা নয় বরং ইংরেজদের উন্নত যুদ্ধক্ষমতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। আবার বখসারের যুদ্ধ জয়ের ফলেই ইংরেজ কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করেছিল, যা তাদের কর্তৃত্বকে একটি আনুষ্ঠানিক ভিত্তি দান করে। এভাবে বিবেচনা করলে বক্সার জয়ই ইংরেজদের প্রকৃত ক্ষমতার উৎস।

সম্পদ পাচারের সূত্রপাত

উনিশ শতকের সপ্তম দশকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল ভারত থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদের পাচারের প্রসঙ্গ। দাদাভাই নওরৌজি থেকে শুরু করে প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী লেখক এ বিষয় নিয়ে বারবার কথা বলেছেন এবং সম্পদ পাচার প্রশ্নটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে। এভাবে যে বির্তকের সূত্রপাত হয়েছিল তা অদ্যাবধি চলছে। যা-ই হোক, যদিও সম্পদের

৮৩. সুশীল চৌধুরী, দ্য প্রিলিউড টু এম্পায়ার, পলাশি রেভ্যুলেশন-১৭৫৭, পৃষ্ঠা ১।

পাচার বিষয়টি নিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছিল, কিন্তু সম্পদের পাচার শুরু হয়েছিল বহু আগেই, বস্তুত পলাশির পরাজয়ের ঠিক পরেই। ঔপনিবেশিক কালের আগে বাংলা থেকে কোম্পানির রপ্তানির (বিশেষ করে সুতিবস্ত্র) প্রায় ৭০ ভাগ মূল্য পরিশোধ করা হতো ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা সোনা-রুপা দ্বারা[৮৪], কারণ আনীত পণ্যের বাজার এখানে খুব সীমিত ছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা থেকে কোম্পানির রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু আগের মতোই আমদানি ছিল রপ্তানির চেয়ে অনেক কম। এ অবস্থায় সোনা-রুপার বাংলামুখী প্রবাহ বিদ্যমান থাকার কথা ছিল। কিন্তু তা ঘটেনি। অন্যদিকে পলাশির পরপরই সোনা-রুপার প্রবাহ কেবল বন্ধই হয়নি; বরং এ সময় তার উলটো স্রোত বইতে শুরু করে। এভাবে রপ্তানির উদ্বৃত্ত কোনো বিনিময় ছাড়াই ইংল্যান্ডে নিষ্ক্রমণ হতে থাকে। সম্পদ নিষ্ক্রমণ হতে থাকে দুইভাবে :

ক. কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে; ও

খ. ১৭৫৭-৬৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসায়িক ক্ষমতাবলে এবং ১৭৬৬ সাল-পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন শাসক হিসেবে।

কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সম্পদের উৎস কী ছিল এবং কীভাবে এ সম্পদ ইংল্যান্ডে স্থানান্তর হতো?

ব্যক্তিগত সম্পদ কয়েকটি পন্থায় অর্জিত হতো। প্রথমত, কোম্পানির বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরিচালক ও গভর্নর জেনারেলসহ সবাই পলাশিপূর্ব বংশানুক্রমিক নবাবদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে উপহার-উপঢৌকন পেত। বস্তুত, প্রত্যেক নতুন নবাবের ক্ষমতায় বসানোর অনুষ্ঠানটি ছিল কোম্পানির জন্য কিংবদন্তির সেই প্যাগোডা-ট্রি ঝাঁকি দেওয়ার মতোই একটি উপযুক্ত সুযোগ। পলাশি পরবর্তীকালে যখন মির জাফর নবাব হলেন তখন ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং সৈন্যরা ১২ লাখ পাউন্ড মূল্যের দ্রব্যাদি উপঢৌকন পেয়েছিল[৮৫] যা থেকে ক্লাইভ নিজে পেয়েছিল ৩১,৫০০ পাউন্ড। যখন নাজিমুদ্দৌলা ১৭৬৫ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করলেন তখন উপহার ২৩০ হাজার পাউন্ড বাড়ল।[৮৬] ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় নবাব পরিবর্তনের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আনুমানিক ২.২ মিলিয়ন অঙ্কের অর্থ লাভ করে। এ সময়ে ১০.৭ মিলিয়ন থেকে ৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড নগদ এবং ৭.০ মিলিয়ন ভূমিরাজস্ব ছাড়াই কোম্পানি বাড়তি আয় করেছিল।[৮৭] ব্যক্তিগত পর্যায়ে

৮৪. সুশীল চৌধুরী, দ্য প্রিলিউড টু এম্পায়ার, পলাশি রেভ্যুলেশন-১৭৫৭, পৃষ্ঠা ৮০।
৮৫. আর. সি. দত্ত, দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ২২।
৮৬. আর. সি. দত্ত, দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ২২।
৮৭. সুশীল চৌধুরী, দ্য প্রিলিউড টু এম্পায়ার, পলাশি রেভ্যুলেশন-১৭৫৭, পৃষ্ঠা ২২।

ক্লাইভ ছিল সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী এবং পলাশির ঠিক পরেই তিনি তার বাবাকে জানান যে মির জাফর তাকে ৩ মিলিয়ন পাউন্ডের মতো অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং 'তার দানশীলতা আমাকে আমার নিজ দেশ ত্যাগে সামর্থ্য জুগিয়েছিল, যা ছিল আমার আশাতীত।'[৮৮] ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত উপহার পাওয়ার এ রীতি প্রচলিত ছিল, কেননা গভর্নর হেস্টিংস এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপহার হিসেবে ৬.৩ মিলিয়ন রুপি মূল্যের মুক্তা ও রত্ন গ্রহণ করেছিলেন।

কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ছিল তাদের অর্থ উপার্জনের আরেকটি উৎস। কোম্পানি বাংলা থেকে যেসব পণ্য রপ্তানি করত তা বিনা শুল্কে দেশের ভেতর দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া ছিল। পলাশির জয় কোম্পানিকে এক কর্তৃত্ববাদী অবস্থান দিয়েছিল এবং এর যেসব কর্মচারী দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, তারাও তখন সেই সুবিধা দাবি করল। অধিকন্তু তারা শিগ্‌গির লবণ, তামাক ও সুপারির ব্যবসা শুরু করে, যা আগে ইউরোপীয়দের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কোম্পানির কর্মচারী এবং গোমস্তারা বিনা শুল্কে পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করত, যেখানে অন্য সব ব্যবসায়ীর জন্য চড়া শুল্ক নির্ধারিত ছিল। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় বাণিজ্য ধ্বংস করা হয় এবং ভারতের অন্য অংশ থেকে আসা ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য প্রতিরোধ করা হয়েছিল এবং স্থলবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অনেক প্রমাণ অনেক ইংরেজ লেখক তাদের লেখায় রেখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ঐতিহাসিক জেমস মিল দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, কোম্পানির কর্মচারীদের আচরণ 'ক্ষমতা ও স্বার্থের সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যা ন্যায়বিচার এমনকি লজ্জার সকল বোধকে নিঃশেষ করে দেয়।'[৮৯] এ ধরনের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ১৭৬৫ সালের দিকে বন্ধ হয়।

যা-ই হোক, খুব শিগ্‌গির কোম্পানির কর্মচারীরা একটি নতুন উপায় তৈরি করতে চেষ্টা শুরু করে, যেহেতু ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ প্রদেশে আঘাত হানে। ইংরেজদের গোমস্তারা চাল ব্যবসায়ীদের বাধ্য করে সবচেয়ে কম দামে চাল বিক্রি করতে এবং তারপর তারা তা সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে। অধিকন্তু গোমস্তাদের সাহায্যে তারা তাঁতিদের অর্ধেক মূল্যে ভাগ বসায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে লাভজনক গোপন চুক্তি কোম্পানির কর্মচারীদের অন্য একটি লাভজনক আয়ের উৎস ছিল। উদাহরণস্বরূপ স্টিফেন সালিভান নামের এক ইংরেজ এক সিলিংও বিনিয়োগ না করে পাওয়া একটি আফিম কন্ট্রাক্ট অন্য একজন ইংরেজের কাছে ৪০ হাজার পাউন্ডে বিক্রি করে, পরে সে আবার একই কন্ট্রাক্ট আরেকজনের কাছে ৬০ হাজার পাউন্ডে বিক্রি করে এবং চূড়ান্ত

৮৮. সুশীল চৌধুরী, দ্য প্রিলিউড টু এম্পায়ার, পলাশি রেভ্যুলেশন-১৭৫৭, পৃষ্ঠা ১৬৩।

৮৯. আর. সি. দত্ত, দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ২০।

ক্রয়কারী প্রচুর লাভ করে। ব্রিটেনের কেউ কেউ কোর্ট অব ডিরেকটর থেকে 'ভারতের একজন বণিকের মতোই এখানে ব্যবসাবাণিজ্য করার' অনুমোদন পেয়েছিল। স্বাধীন বণিক হিসেবে পরিচিত এরাও বাংলায় প্রচুর ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য গড়ে তুলেছিল।[৯০]

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভ করার মাধ্যমে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসা শুরু হয় এবং ১৭৬৫ সাল থেকে ইংরেজ শাসকেরা ক্ষমতাবলে বাংলা থেকে অর্থ পাচারের অন্য উপায় খুঁজে পায়। এ পাচারের তিনটি অংশ ছিল—

ক. কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিময় ছাড়া ইংল্যান্ডে বিনিয়োগ এবং পণ্য রপ্তানি।

খ. চীনা বাণিজ্যে অর্থায়ন।

গ. বোম্বে ও মাদ্রাজের প্রশাসনিক ব্যয় এবং তাদের রপ্তানিব্যয় মেটানো।

প্রথম আট-নয় বছর কোম্পানির এ ধরনের নিষ্ক্রান্ত অর্থের উৎস ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক সেবা দেওয়ার বিনিময়ে ভারতীয় শাসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিরাট অঙ্কের অর্থ এবং ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ কর্তৃক কোম্পানির জন্য জমিদারি অধিকারপ্রাপ্ত চব্বিশ পরগনা ও ১৭৬০ সালে প্রাপ্ত বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর থেকে। এ ধরনের আয়ের উদ্বৃত্ত প্রকৃত ব্যয়ের পর তার রপ্তানি পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হতো। এ উদ্বৃত্তের আনুমানিক হিসাব প্রায় ৩ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৭৫৭-৬৬ সময়কালে কোম্পানির আমদানি বাণিজ্য ছিল ১ মিলিয়ন পাউন্ডেরও কিছু বেশি। এভাবে কোম্পানি যদি ১৭৫৭-১৭৯৭ সাল পর্যন্ত আর সোনা-রুপার বার আমদানি না করে, তাহলে পলাশি-পরবর্তী প্রথম নয় বছরে কোম্পানির সরাসরি সম্পদ পাচারের পরিমাণ হবে প্রায় দুই মিলিয়ন পাউন্ড।[৯১]

কোম্পানিকে মূলত যে সম্পদ পাচারের জন্য বেশি দোষী সাব্যস্ত করা হয় তা হলো বাংলার ভূমিরাজস্বের উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ। ১৭৬৬ সাল থেকে এ ধরনের বিনিয়োগ নিয়মিত শুরু হয়। দেওয়ানি লাভের পর বাংলার 'অবিশ্বাস্য' সম্পদের ব্যাপারে ইংল্যান্ডে কতগুলো ধারণা তৈরি হয়। কোম্পানির কর্মকর্তাদের সীমাহীন সম্পদলিপ্সা এবং ইংল্যান্ডে এর প্রভাব ('নবাবদের' বিলাসবহুল জীবনযাপন) এ ধারণাগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী ছিল। এ সময় কোম্পানির মালিক ও ব্রিটিশ সরকার বাংলার ভূমিরাজস্ব দাবি করতে শুরু করে। ১৭৬৬ থেকে ১৭৮০ সালে অর্থ পাচার বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কোম্পানির সব চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য এর পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ মিলিয়ন পাউন্ড।[৯২] একপর্যায়ে অ্যাডাম স্মিথ মত প্রকাশ করেন, 'এটা প্রতীয়মান হয় যে বণিকদের একটি কোম্পানি সার্বভৌম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সার্বভৌম ভাবতে অক্ষম...।

---

৯০. এন. কে. সিনহা, ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ২২৫।

৯১. জে. সি. সিনহা, ইকনমিক এনালস অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা ৪৮।

৯২. জে. সি. সিনহা, ইকনমিক এনালস অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা ৫১।

এক অদ্ভুত যুক্তিতে তারা সার্বভৌমত্বের ধারণাকে বণিকদের স্বার্থের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে।' এ উক্তি বস্তুত সঠিক প্রতীয়মান হবে যদি বাংলার শাসক হিসেবে কোম্পানির আচরণের দিকে লক্ষ করি। যা-ই হোক, সমস্যা হলো ব্রিটিশ সরকারও বণিকদের লালসায় প্রভাবিত হয়েছিল। তবে কোম্পানি সরকার দ্বারা সম্পদ পাচারের আলোচনা এগিয়ে নিতে আমাদের এ বিতর্কের মুখোমুখি হতে হবে যে ১৭৮৩-৯৩-এর দশকে ইউরোপের জন্য রপ্তানিপণ্য কখনোই ব্যয়ের উদ্বৃত্ত রাজস্ব দ্বারা ক্রয় করা হয়নি। কিন্তু কোম্পানির একটি বার্ষিক রাজস্ব প্রতিবেদনে দেখায়, এ বছরগুলোতে উদ্বৃত্ত ছিল এবং নিষ্ক্রমণ সত্যিকার অর্থে চলমান ছিল। এটা সত্য যে যদি মাদ্রাজ, বোম্বে, ফোর্ট মার্লবোরো এবং সেন্ট হেলেনার ঘাটতি বিবেচনা করি তবে উদ্বৃত্ত পাব না। কিন্তু আমরা এ ধরনের একটি হিসাব গ্রহণ করে বাংলার সম্পদ নিষ্ক্রমণের বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।[৯৩]

১৭৫৭ সালে আরেক ধরনের নিষ্ক্রমণ শুরু হয় যখন চীনে কোম্পানির বিনিয়োগের তহবিল সরবরাহের জন্য বাংলা থেকে রুপা রপ্তানি শুরু করে। যেহেতু এর বিনিময়ে বাংলায় কোনো পণ্য আমদানি করা হয়নি, সুতরাং এটিও ছিল বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে একপ্রকার পাচার। যদিও এভাবে সম্পদ পাচারের কোনো সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, কিন্তু সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের মতানুসারে ১৭৬৬ সালে এ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৩ লাখ পাউন্ড। ১৭৮২-৮৩ সালের সিলেক্ট কমিটি প্রতি বছর এর আনুমানিক গড় হিসাব দেখায় ১ লাখ পাউন্ড। আবার শুরুর দিকে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও সম্পদ পাচার হয়েছিল। একটা আনুমানিক হিসাব করা হয়েছিল যে দেওয়ানি লাভের পর বার্ষিক আড়াই থেকে ৩ মিলিয়ন রুপি এ দুটি প্রেসিডেন্সিতে পাঠানো হতো। এর একটি অংশ প্রশাসনিক ব্যয় মেটানোর জন্য এবং আরেকটি অংশ রপ্তানিপণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হতো। অন্যদিকে গোপন কমিটির (১৭৭৩) মতে, ১৭৬১-৬২ থেকে ১৭৭০-৭১ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মোট পাচারের পরিমাণ ছিল ২.৩ মিলিয়ন পাউন্ড।

জেমস গ্রান্ট ইংল্যান্ডে পাচারকে বৈধতা দিয়ে বলেন যে মোগল সরকারও বাংলা থেকে ১০ মিলিয়ন রুপি আদায় করত। থিওডোর মরিসন মনে করেন, রপ্তানি উদ্বৃত্ত হলেই তাকে পাচার বলা যায় না। এ ছাড়া তিনি এ বিষয়ের ওপরও জোর দেন যে কেউ যখন সম্পদ পাচারের কথা বলেন; তখন তাদের এ বিষয়ও মনে রাখা প্রয়োজন যে এ সময়ে ভারতে আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন, বেসামরিক এবং বিচারসংক্রান্ত প্রশাসন গঠন, একটি আইনি অবকাঠামো গঠন,

৯৩. এন. কে. সিনহা, ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ২৩১।

ব্যাংকিং, সেচব্যবস্থা ও রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল।[৯৪] পি জি মার্শালও একই বিষয়ে জোর দেন।

এডমন্ড বার্ক জেমস গ্রান্টের যুক্তির প্রত্যুত্তরে বলেন যে, মোগলরা সম্পদের ভান্ডার গড়ে তুললেও তারা ছিল দেশীয় মজুতদার... অনেক বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষমতার ওপর স্বল্প রাজনৈতিক প্রহরা, প্রকৃতিও ছিল তখন মুক্ত, সম্পদ অর্জনের উৎসগুলোও সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছিল না এবং দেশের বাণিজ্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল।[৯৫]

এ কথার পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন যে নিশ্চিতভাবে ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার হতো এবং মোগল-সম্রাটরা বাংলা থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ আদায় করত বলে অজুহাত তুলে এ সত্য আড়াল করা যাবে না। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসন এ সম্পদ দিয়ে ভারতের উন্নয়নের চেয়ে ইংল্যান্ডের সুবিধায় বেশি ব্যবহার করেছে। আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো প্রদেশের জিডিপির কোন অংশটি ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল?

আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৭৫৭-৮০ সময়কালে বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ পাচার হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলাকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিসর্জন দিতে হয়েছে, যা এ দেশের সরকার বা জনগণ কোনো উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারত। রপ্তানি উদ্বৃত্ত বিভিন্ন সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের ব্যর্থতার কারণে এ সম্পদ দীর্ঘকাল অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছিল।

এ প্রক্রিয়ায় দুটি শ্রেণি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কৃষক ও তাঁতি। কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ তারা বর্ধিত হারে ভূমিরাজস্ব দিতে বাধ্য ছিল এবং এভাবে উদ্বৃত্ত তৈরিতে অবদান রাখত, এ উদ্বৃত্তের দ্বারাই প্রদেশ থেকে রপ্তানি পণ্য (বিশেষত সুতিবস্ত্র) সংগ্রহ করা হতো। প্রসঙ্গক্রমে, দেওয়ানি লাভের তিন বছরের মধ্যে কোম্পানি ভূমিরাজস্ব প্রায় ৭০ শতাংশ বর্ধিত করে এবং ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়েও কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি, যা জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের প্রাণ কেড়ে নেয়। তাঁতিদের সম্বন্ধে বলতে গেলে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য কোম্পানির প্রতিনিধিদের (গোমস্তা-দালাল) কাছে বাজারমূল্যের কমে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। প্রায়ই তারা গোমস্তাদের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতো। এভাবে কৃষকেরা উচ্চ ভূমিরাজস্ব দিতে এবং তাঁতিরা নিম্নমূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হতো।[৯৬]

---

৯৪. টি. মরিসন, ইকনমিক ট্রানজিশন ইন ইন্ডিয়া; সুবোধ কে. মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ১৪২।

৯৫. আর. সি. দত্ত, দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ৩৩।

৯৬. এন. কে. সিনহা, ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভলিউম ১ ও ২।

ব্রিটিশ অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে অনেক ভাষ্যকার দৃঢ় অবস্থান নিয়ে বলেন যে, এ অর্থ পাচার শিল্পবিপ্লব সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এ মতের গুরুত্বপূর্ণ দুজন সমর্থক হলেন ব্রুকস এডামস ও ওয়ালটার কানিংহাম। তারা দুজনই বাংলার সম্পদের ব্যাপক পাচার এবং ইংল্যান্ডে যন্ত্র বা প্রযুক্তির উদ্ভাবনের খুব গভীর সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, যা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছিল।[৯৭] অনেক ভাষ্যকার, বিশেষভাবে মার্ক্সবাদীরা জোর দিয়েছেন ব্রিটিশ বাজারজাতকারীদের ভারতে বাজার দখল করা নিয়ে, যা শিল্পবিপ্লবে তাদের সফল করেছিল, কিন্তু ব্রুকস এডামস ও কানিংহাম জোর দেন বাংলা থেকে সম্পদ পাচারের ভূমিকার ওপর।

আসলে বিষয়টি অনেকাংশে সত্য।

৯৭. তারা চাঁদ, হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ৩৮৮-৮৯।

পলাশি থেকে ধানমণ্ডি

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মনযূর আহমাদ

চেতনা
প্রকাশন

৯১ | পলাশি থেকে ধানমণ্ডি

ব র্ণ না ধা রা...

🕮 ষষ্ঠ অধ্যায় : আজাদি আন্দোলনের সংগ্রামী সাধকগণ

▸ **প্রথম পরিচ্ছেদ : আজাদি আন্দোলনের সূচনাপুরুষ নবাব নুরুদ্দিন মুহাম্মদ বাকের জং** **১৩**

বাকের জং পরিশিষ্ট.....৩০

▸ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পির ও চাষি বলখি শাহ রহ.** **৭৭**

▸ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতিরোধসংগ্রামী আইনউদ্দিন সিকদার** **৭৯**

▸ **চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মঠবাড়িয়ায় গণবিদ্রোহ** **৮১**

▸ **পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ফরায়েজি আন্দোলন [১৮১৮-১৯৪৭]** **৮৫**

ঐতিহাসিক পটভূমি.....৮৬

আন্দোলন ৯৩

দুদু মিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ ৯৭

গিয়াসউদ্দিন হায়দার ১০২

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আরেক রাজ্য ১০২

ফরায়েজি মতবাদ.....১০৪

তওবা ১০৫

ফরায়েজ ১০৫

তাওহিদ ১০৬

জুমা ও ঈদের নামাজ ১০৬

প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা ১০৭

সমাজ সংগঠন.....১০৭

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব..... ১০৯

ফরায়েজি আন্দোলন : পরবর্তী অধ্যায় ১১২

🕮 সপ্তম অধ্যায় : ফতোয়ার সূত্রে বিপ্লবের বুনিয়াদ

▸ প্রথম পরিচ্ছেদ : তাহরিকে মুহাম্মাদি ও সাইয়েদ আহমদ শহিদ ১১৩

আন্দোলন ও তার দৃষ্টিভঙ্গি ১১৪
জন্ম ও বংশপরিচয় ১১৫
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ১১৫
তৎকালীন উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ১১৮
জীবনের মিশন ১২০
তরিকায়ে মুহাম্মাদি আন্দোলন ১২০
দ্বীনের দাওয়াত ও কর্মীসংগ্রহ অভিযান ১২২
হজের উদ্দেশ্য এবং সফরের সাংগঠনিক কাঠামো ১২৫
সংগঠনের মূলনীতি ১২৬
সংগঠন ও প্রশিক্ষণ ১২৭
জিহাদের প্রস্তুতি ১২৯
মুজাহিদ বাহিনী ১২৯
অর্থসংগ্রহ পদ্ধতি ১৩০
আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ১৩০
মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদির সাথে সামঞ্জস্য ১৩১
শরিয়তুল্লাহ ও তিতুমিরের আন্দোলন ১৩২
সীমান্তে জিহাদের কেন্দ্র স্থাপনের কারণ ১৩৩
জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত ১৩৪
শিখ নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১৩৪
সীমান্তে মুজাহিদ প্রেরণের ব্যবস্থা ১৩৫
খেলাফতরাষ্ট্রের পত্তন ১৩৬
আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ১৩৯
দ্বিতীয় হিজরত ১৪১
বালাকোট যুদ্ধ ও ইমামের শাহাদাত ১৪২
আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ১৪৪
তরিকায়ে মুহাম্মাদি আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা ১৪৬

▸ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শহিদ সাইয়েদ আহমদ বেরেলবির খলিফা ১৫৫

বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক স্থপতি কারামত আলি জৌনপুরি ১৫৫
তাঁর সময়ে বাংলার সমাজচিত্র ১৫৬
মুর্শিদের সান্নিধ্যে ১৫৭
শিক্ষা বিস্তারে ১৫৭

জিহাদ ও বালাকোট ১৫৮
গ্রামবাংলার পথে পথে ১৫৮

📖 **অষ্টম অধ্যায় : সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে যে যুদ্ধের দাবানল**

▶ **প্রথম পরিচ্ছেদ : ১৮৫৭ ১৬১**
ঐতিহাসিক প্রতিশোধের অস্ত্র গড়ে দেয় পীড়িত নয় পীড়ক স্বয়ং.....১৬১

▶ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও সিপাহি যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ১৬৮**
অর্থনৈতিক দৃশ্যপট : পলাশির লুটতরাজ.....১৭৮
কৃষকদের দুঃখ ১৭৯
নয়া সামাজিক শ্রেণি ১৮০
ভূমিমালিকানার নতুন ধারণা.....১৮১
নীলকুঠিয়ালদের দৌরাত্ম ১৮৪
বুনিয়াদি ভূস্বামী শ্রেণির বিলুপ্তি ১৮৫
রায়তওয়ারি ও মহালওয়ারি ব্যবস্থা ১৮৭
সক্ষম গ্রাম-বসতির বিলুপ্তি.....১৯০
দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি ১৯১
লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ১৯৩
মুসলিম রাজন্য ও অভিজাতশ্রেণি উৎখাত ১৯৫
সাবেকি সেনাবাহিনীর বিলুপ্তি.....১৯৬

▶ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ১৯৯**
ভারতীয়দের অসভ্য বর্বর জ্ঞান ১৯৯
সেনাবাহিনীর একমাত্রিক গড়ন এবং সৈনিকদের অসন্তোষ ২০০
খ্রিষ্টান মিশনারির বেপরোয়া তৎপরতা ২০২
হিন্দু-সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ.....২০৪
ধর্ম ও সংস্কৃতি দলন ২০৬
ফারসির বদলে ইংরেজির প্রচলন ২১১
কট্টর ভেদনীতি.....২১৭
আলেমদের কোণঠাসা করার চেষ্টা.....২২১
শিখদের মুসলিম পীড়ন ২২২
নারীর অমর্যাদা ২২২
সৈনিকদের ধর্মনাশের আশঙ্কা.....২২৪
চাপাতি বিতরণ.....২২৬
মোটকথা ২২৮
১৩ হাজার আলেমের ফাঁসি.....২৩৬

▸ **চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উলামায়ে কেরামের ভূমিকা** **২৩৭**
শাহ ওয়ালিউল্লাহ থেকে শাহ ইসমাইল ২৩৭
তালিম ও তরবিয়তি কেন্দ্র ২৪০
তালিম ও তরবিয়তি কেন্দ্রগুলোর পাঠক্রম ২৪০
সাইয়েদ আহমদকে নেতৃত্ব প্রদান.....২৪২
ভারতের থানাভবনে আলেমদের মোর্চা ২৪৩

📖 **নবম অধ্যায় :**

▸ **প্রথম পরিচ্ছেদ : দারুল উলুম দেওবন্দ (১৮৬৬)** **২৪৯**
দেওবন্দ কী !.....২৪৯
দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট.....২৫৩
দারুল উলুম দেওবন্দের আট মূলনীতি ২৫৫
দেওবন্দ বা কওমি শিক্ষাধারার বিস্তৃতি ২৫৭

▸ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ ভারতে মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং আলিয়া মাদরাসার সূচনা** **১৫৮**
আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার একশ বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা..... ২৬০
আলিয়া মাদরাসার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক মোল্লা মাজদুদ্দিন ২৬২
আলিয়া মাদরাসার পত্তন ২৬৫
মাদরাসার ব্যয়নির্বাহ ২৬৬
মাদরাসার সংস্কার এবং দরসে নিজামিয়ার ইতিবৃত্ত ২৬৬
এরপর ষড়যন্ত্র শুরু হয় ২৬৭
ইংরেজ সেক্রেটারি নিয়োগের জল্পনা-কল্পনা ২৬৭
মাদরাসার প্রথম সেক্রেটারি.....২৬৮
পরীক্ষার প্রবর্তন ও তার বিরোধিতা ২৬৮
সেকালের পরীক্ষানীতি ২৬৯
মাদরাসার প্রথম পাশ্চাত্য ধারার পরীক্ষা.....২৬৯
১৮১৩ সালের শিক্ষানীতি.....২৭০
মুসলিমদের শিক্ষার ব্যাপারে উপেক্ষা ২৭০
আলিয়া মাদরাসা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খরচের ব্যবধান.... ২৭১
মাদরাসার দ্বিতীয় ভবন..... ২৭১
মাদরাসার শিলালিপি.....২৭২
লাইব্রেরির পত্তন..... ২৭৩
সংস্কৃত কলেজ ২৭৩

আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা ২৭৩
মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ..... ২৭৪
ইংরেজদের শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য..... ২৭৫
শিক্ষানীতি সমর্থিত..... ২৭৭
অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলেজের গোড়াপত্তন ২৭৮
মি. গ্রান্টের স্বপ্ন সফল ২৭৮
মাদরাসা সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য ২৮২
ইংরেজি শিক্ষা এবং আলেমদের বিরোধিতা..... ২৮৩
হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাগত জানায় ২৮৪
ইংরেজি শিক্ষার আরও সম্প্রসারণ ২৮৪
পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে মতবিরোধ..... ২৮৫
লর্ড ম্যাকালের সিদ্ধান্ত..... ২৮৬
লর্ড ম্যাকালের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মেজর বাসু..... ২৮৭
১৮৩৭ সালের শিক্ষা অ্যাক্ট ও ফারসির চির বিদায়..... ২৮৯
ফারসি ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে কতিপয় ব্যাখ্যা ২৯১
লর্ড অকল্যান্ডের ঘোষণা ২৯১
মাদরাসার প্রিন্সিপাল নিয়োগ..... ২৯২
প্রিন্সিপালের সংস্কারপ্রয়াস ও মাদরাসায় গোলযোগ ২৯৩
গোলযোগের কারণ..... ২৯৩
আলিয়া মাদরাসার দুটি বিভাগ..... ২৯৪
মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ..... ২৯৪
অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগের প্রস্তাব ২৯৫
মেট্রোপলিটন কলেজের ইতিবৃত্ত ২৯৫
ব্রাঞ্চ স্কুল ২৯৬
আরবি বিভাগের সংস্কার..... ২৯৬
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন ২৯৬
মাদরাসার প্রতি লে. গভর্নরের কোপদৃষ্টি..... ২৯৭
মাদরাসা বন্ধ করার প্রস্তাব ২৯৯
গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান..... ২৯৯
মি. লিজের দ্বিতীয় রিপোর্ট..... ৩০০
প্রিন্সিপালের আরও একটি প্রস্তাব ৩০০
১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ও আলিয়া মাদরাসা..... ৩০১
প্রিন্সিপাল ও লে. গভর্নরের টাগ অব ওয়ার ৩০২
মুসলিম কাজি নিয়োগব্যবস্থা বাতিল ৩০২

মাদরাসায় কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ৩০৩
পুনরায় মাদরাসা তদন্ত কমিটি গঠিত ৩০৩
কমিটির রিপোর্ট ৩০৪
হুগলি মাদরাসা ৩০৫

📖 **দশম অধ্যায় :**

▶ **প্রথম পরিচ্ছেদ : ঢাকা-মুর্শিদাবাদ-কলকাতা; আলো-আঁধারে পথচলা ৩০৬**
শত বছরের মোগল রাজধানী : ঢাকা ৩০৬
ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ ৩১১
ইউরোপীয় বণিকদের প্রভাব বিস্তার ও তাদের ক্রুসেডীয় মনস্তত্ত্ব ৩১২
ঢাকা-মুর্শিদাবাদ-কলকাতা : আবর্তিত ভাগ্যের তিন নগরী ৩১৩
জোব চার্নকের কলকাতা এবং নিরাপদ আশ্রয় ও ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি ৩১৫
রাজধানী গেল মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় ৩১৮
ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে আঁধার যুগ ৩২১
নবাবি ঢাকার শেষ দৃশ্য ৩২৪
আবদুল হাকিম থেকে নাজিমউদ্দিন ৩২৪
কলকাতা : সৌখিন বিদেশি মুকুল থেকে ফুল ৩২৫
কংকাল থেকে কলকাতা ৩৩০
কলকাতার উত্থান এবং 'এক-পুরুষের বড়লোক' ৩৩১
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কলকাতার নব্য জমিদার শ্রেণি ৩৩৪
সমবেত ভূস্বামী শ্রেণি ও তাদের মোহাচ্ছন্ন চৈতন্য ৩৩৫
'ক্যালকাটা বাবু' আর 'ব্ল্যাক জেমিনদার'দের কলকাতা ৩৩৬
আঙুল ফুলে কলাগাছ ৩৩৭
কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু রেনেসাঁ : 'ভগবানের দান' বনাম 'বিরাট ট্রাজেডি' ... ৩৩৮
মুসলিম ও অবর্ণ হিন্দু-সমাজে এ রেনেসাঁসের ছোঁয়া লাগল না কেন? ... ৩৪০
কোম্পানির তাঁবেদাররূপে 'নবজাগ্রত' বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ৩৪১
এরই নাম কি রেনেসাঁ? ৩৪২

▶ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীনতার পথে যাত্রা (১৯০৫-১৯৭১) ৩৪৫**
ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ এবং মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ৩৪৫
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি ৩৪৫
ঢাকায় রাজধানী ও 'ভাগ্যোদয়ের প্রথম প্রভাত' ৩৪৬
কলকাতা-চক্র এবং কায়েমি স্বার্থের 'বন্দে মাতরম' ৩৪৬
স্বদেশবাদের নামে সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ৩৪৭
বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ও দেবী দুর্গা প্রসঙ্গ ৩৪৮

বাংলা ভাগের বিরোধিতায় ভারত ভাগের বীজ..... ৩৫০
▸ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পশ্চিমবঙ্গ কি বঙ্গ! ৩৫১
রাঢ় কবে বঙ্গ ছিল এবং বঙ্গ কী করে বঙ্গমাতা হলো? ৩৫১
মুসলিম শাসনামলের প্রশাসনিক সংস্কার ৩৫৫
ইংরেজ আমলে 'বাঙ্গালাহ' হলো 'বেঙ্গল' ও বঙ্গ কখনো ভাঙেনি ৩৫৬
কলকাতা যখন পাল্কির পিছে গ্রামবাংলা তখন যুদ্ধ-সাজে
মির কাসিম ও টিপু সুলতানের পথ বেয়ে ৩৫৮
মুসলিম মানেই যখন 'রানির বিদ্রোহী প্রজা' ৩৫৮
ফকির ও কৃষক বিদ্রোহ ৩৬০
মহীশূরের পতন ও কলকাতায় কর্নওয়ালিসের সংবর্ধনা ৩৬১
▸ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : একটি ফতোয়া এবং ফরায়েজি ও জিহাদ আন্দোলন ৩৬২
জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা..... ৩৬৪
তিতুমিরের লড়াই ৩৬৫
জিহাদ আন্দোলনের প্রেরণা থেকে সিপাহি বিপ্লব..... ৩৬৭
সিপাহি বিপ্লবে পূর্ব বাংলা ও হাবিলদার রজব আলির আত্মদান..... ৩৬৯
সিপাহি বিপ্লবে ঢাকা ও লালবাগ ও আন্টাঘর ময়দানের কথা..... ৩৭০
▸ পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উনিশ শতকের এশিয়াটিক সোসাইটি ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ ৩৭২
মন্বন্তরের অপকীর্তি ঢাকতে মুসলিমবিরোধী প্রচার-যুদ্ধ ৩৭২
এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইউরোপীয় ভারতবিদ্যা বিশারদ..... ৩৭২
'আফিমখোরদের গালগল্প' যখন টড-এর রাজস্থান..... ৩৭৩
চিরকাল 'হয় যেন ব্রিটিশের জয়' ৩৭৪
ইশ্বর গুপ্ত থেকে ডি এল রায় ও সাহিত্যে মুসলিম-বৈরী ধারা..... ৩৭৪
রাজপুত বীরের গৌরব চর্চায় রঙ্গলাল..... ৩৭৬
'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' ও 'হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠা ৩৭৯
'হিন্দু মেলা'র আদর্শ ও ভারত শুধুই 'হিন্দুর দেশ'..... ৩৮০
গো-হত্যা নিবারণী সভা ৩৮১
নব্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদ : শিবাজি যেখানে জাতীয় বীর..... ৩৮১
নবীন সেন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র : 'যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'..... ৩৮২
পতাকা যখন রবি ঠাকুরের হাতে ৩৮৩
উনিশ শতকের সংবাদপত্র ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ৩৮৫
হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তার শাখা-প্রশাখা..... ৩৮৬
'বেঙ্গল ল্যান্ড লর্ডস অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ৩৮৭

▸ **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কংগ্রেসের জন্মকথা** **৩৮৯**
'ভারত সভা' থেকে 'জাতীয় কংগ্রেস' ৩৮৯
হিন্দু ভারতের 'নতুন আত্মা' ৩৮৯
নব-হিন্দুবাদ ও বিবেকানন্দ ৩৯০
ঢাকায় বিবেকানন্দ ও 'প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে' ৩৯১
কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু ও মারাঠা-ব্রাহ্মণ স্বার্থের মিতালি ৩৯১
বাংলায় 'শতাব্দীকালের বিষবৃক্ষ' ৩৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ ভারতে মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং আলিয়া মাদরাসার সূচনা

[১৭৮০-১৯০৮]

আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস কোনো একটি প্রতিষ্ঠানবিশেষের ইতিহাস নয়, এটি মূলত সেকালের সুবা বাংলার আরবি শিক্ষা তথা ভারতীয় মুসলিমদের শিক্ষা, মর্যাদা ও আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষার সংগ্রাম বিধৃত এক করুণ আলেখ্য।

এ প্রসঙ্গে জনাব আবদুস সাত্তার প্রণীত ও মোস্তফা হারুন অনূদিত 'আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকায় ঢাকা আলিয়ার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব শরিফ সাহেব যে আবেগঘন অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন তা থেকে একটুখানি তুলে ধরা হলো :

'আজ বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে স্বভাবতই মন কতগুলো বিশেষ কারণে আবেগাপ্লুত হয়ে উঠছে। মন ভারাক্রান্ত হচ্ছে বাংলার অতীত মুসলিমদের অনৈক্যের কথা ভেবে। ভাবতে অবাক লাগে, ইংরেজ শাসিত দেশে মুসলিমরা আলিয়া মাদরাসাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল আজও তা কেন ফলবতী হতে পারেনি, আজ নতুন করে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

... বাহ্যত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা হয়েছিল আলাদা জাতি হিসেবে মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে, যাতে মুসলিমদের ধর্ম, কৃষ্টি ও আদর্শ রক্ষা পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত পাঠ করলে স্বভাবতই মনে হবে, আলিয়া মাদরাসা পত্তন করে ইংরেজরা কোনোদিনই এই প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়নি। বরং কৌশলে এই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে এবং ইংরেজি ভাষা ও কৃষ্টি চাপিয়ে দেওয়ার জোর চেষ্টা চালায়। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যিকারভাবে ইংরেজদের আশা যেমন পূরণ হয়নি, তেমনই পুরোপুরি মুসলিমদের আশা-আকাঙ্ক্ষারও পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। সেই একইরকম দ্বন্দ্ব এবং মিশ্র প্রয়াস নিয়ে এই আলিয়া মাদরাসা (এবং অসংখ্য অনুসৃত মাদরাসা) আজও দাঁড়িয়ে আছে।

দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আলিয়া মাদরাসার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে হলে পুরোনো দিনগুলোর দিকে দৃক্‌পাত করতে হয়। মনে পড়ে ১৭৭৫

খ্রিষ্টাব্দের ১২ আগস্ট সুবায়ে বাংলার (বাংলা, বিহার এবং ওড়িশা) দিওয়ানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট হস্তান্তরিত হয়। ক্রমে অন্যান্য অঞ্চলের শাসনও হস্তচ্যুত হতে শুরু হয়। চারদিকে ব্যাপক অরাজকতা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক গোলাম কাদির খান রোহিলা কর্তৃক দিল্লির 'কসরে মুআল্লায়' প্রবেশ করে মোগলসম্রাট শাহ আলমের চক্ষু উৎপাটনের ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়, তখন দিল্লির সম্রাট ও শাসকরা কত অসহায় ও অনুপযুক্ত ছিল।

সে সময় মুসলিমদের একতা ছিল না, অন্তত যারা দেশ শাসন করত তাদের মধ্যে। তাদের সামরিক শক্তি, অর্থ, সাহস, বল সবই ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা পুরো মাত্রায় ছিল। যার ফলে তাদের সব শক্তি জাতির বিপক্ষে ব্যয়িত হয়েছিল।

সম্রাট শাহজাহানের সময়ে অবাধ বাণিজ্যের সনদ লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তখন কি কেউ চিন্তা করতে পেরেছিল, এই বণিকরা একদিন রাজদণ্ড দখল করবে? তখন থেকে এরা এখানকার মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হতে থাকে এবং নেকড়ের মতো ওত পেতে আক্রমণ ও দেশ দখলের সুযোগ খুঁজতে থাকে। বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করার পর থেকে এরা আরও সুযোগ পেয়ে যায়। এবং এই সুযোগকে কূটনৈতিকভাবে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হয়।

মুসলিম জাতির হাত থেকে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাতে চলে যাবে, তা মির জাফররাও কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু তারা এই কথা যখন বুঝেছিল তখন সব হারিয়ে ফেলেছিল। তার পক্ষে নবাবির চেয়ে মুসলিম শাসনের অবসান কামনা করা কি সম্ভবপর ছিল?

কবি আকবর ইলাহাবাদি গাদ্দারির উল্লেখ করে বলেছেন :

'জাফর আজ বাঙ্গালা, সাদেক আজ দক্ন
তঙ্গে কওম, তঙ্গে দ্বীন, তঙ্গে ওয়াতন।'

ইংরেজদেরকে ভারতের দুই অঞ্চলে দুই লোক সাহায্য করেছিলেন। একজন হায়দারাবাদের মির সাদিক, দ্বিতীয়জন মির জাফর। যার ফলে ধীরে ধীরে এই জাতির শাসন ও স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটে।

সুবা বাংলার শাসনক্ষমতা ইংরেজদের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয় মুসলিমদের তাহজিব-তামাদ্দুন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর বহুমুখী আক্রমণ।

দেওয়ানি বিভাগে স্বয়ং ইংরেজরা এবং তাদের পদলেহী হিন্দুরা নিয়োজিত ছিল। এদিকে মুসলিমদের পদে পদে বঞ্চিত করা ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ফলে মুসলিম জাতি ধীরে ধীরে চরম দারিদ্র্যের শিকার হতে থাকে।

দেওয়ানি ছাড়া প্রশাসন বিভাগে তখনও মুসলিমদের দখল ছিল। এরপর থেকে মুসলিমদের কীভাবে উৎখাত করা যায় প্রশাসন বিভাগে সেই ষড়যন্ত্র চলল। কারণ তখনও রাষ্ট্রভাষা ফারসি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রভাষা ফারসিকে পরিবর্তন করে সে স্থলে ইংরেজি প্রতিষ্ঠা করাও সহজসাধ্য ছিল না। এবং সেকালে মুসলিমদের তুলনায় ফারসি জানা হিন্দুর সংখ্যাও কম ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে ১৭৮০ সালে কলকাতায় এই মাদরাসার বুনিয়াদ রাখা হয়। নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে অবশেষে ওয়েলেসলি স্কোয়ারে মাদরাসার ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখানকার আলেমরা ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বলে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং ছাত্ররাও ওইভাবে গড়ে উঠতে থাকে।

অতঃপর মুসলিম জাতির দখল থেকে প্রশাসন বিভাগ কেড়ে নেওয়ার সময় হয়। এর আগে মাদরাসা শিক্ষিতরাই কাজি, অ্যাসেসর ও জজ ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হতো। পরে তাও না হওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হলো।

বাহ্যত মাদরাসা সংস্কারের নামে নানা কমিটি ও সুপারিশ গৃহীত হতে থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলিমদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল করার ব্যাপারে সকল প্রচেষ্টা চালানো হয়।

জীবিকার ক্ষেত্রে মাদরাসার ছাত্ররা যাতে একটা পথ খুঁজে পেতে পারে এজন্য আলিয়া মাদরাসাতে 'ইলমে তিব' সিলেবাসভুক্ত করারও প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষাবধি শুধু ধর্ম শিক্ষার জন্যই এই মাদরাসা কোনোরকমে টিকে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তখন আলিয়া মাদরাসাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল মুসলিমদের একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু কালক্রমে ইংরেজরা এর পাশাপাশি তার বিকল্প শিক্ষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলে।'

আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার একশ বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার একশ বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সামগ্রিকভাবে ইংরেজি এই দেশের রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হয়। এভাবে মুসলিমরা ধীরে ধীরে রাজ্যহারা, মান-সম্মানহারা হয়ে এমন দরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়, যা কোনোদিন তারা কল্পনাও করেছিল না।

এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভাষা হিসেবে ফারসি, আরবি ইত্যাদি এবং এর শিক্ষাসূচিতে গুরুত্বের সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মূলত তা ছিল ধর্মভিত্তিক, এমনকি হিন্দুদের শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল ধর্মভিত্তিক। তাই বিদেশি ভাষার মাধ্যমে নৈতিকতা বর্জিত বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণে মুসলিমরা কিছুতেই রাজি হয়নি। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু মুসলিম ইংরেজি পড়তে বাধ্য হয়েছে এবং ইংরেজি শিখে তাদের গোলাম হয়েছে। এ ব্যাপারে আকবর ইলাহাবাদি বলেছেন :

'আহবাব কেয়া নুমায়া কর গ্যায়ে
বি এ কিয়া, নওকর হয়ে, পেনশন মিলি আওর মর গ্যায়ে।'
বন্ধুগণ কী কীর্তিই-না দেখালেন!
বি এ পাশ করার পর ইংরেজের চাকর হলেন,
চাকরি থেকে অবসরের পর পেনশন খেয়ে খেয়ে মরে গেলেন!'

অধ্যাত্ম ও নৈতিকতাবর্জিত শিক্ষার পরিণতি এ ছাড়া আর কী হতে পারে?

এ দেশে ইংরেজ সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালেও আকবর ইলাহাবাদি বলেছিলেন :

'বকুন তাজিন পায়ে খোদ ববুট ডাসেন অ পাতলুন
জে স্যার সৈয়দ খবরদার অ জেরাহ অ রসম মনজেলেহা।'

ডাসেন কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুত উচ্চ গোড়ালিযুক্ত বুট জুতা পরিধান করো, স্যুট-কোটে সুশোভিত হও এবং মস্তক-বাস ইত্যাদি সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদের পরামর্শ গ্রহণ করো।

এই ধর্মহীন, নৈতিকতাবর্জিত পাশ্চাত্য-ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বেপর্দা, চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলা এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এ সত্যের নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে এই শিক্ষার ফলে শিল্পকারখানা, চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে জনগণ যে সুযোগ পেয়েছে তা সত্য।

যে জাতি ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়, তাকে কে রক্ষা করতে পারে? একটা জাতির মধ্যে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ বিদ্যমান এবং রাষ্ট্রও এগুলো নিয়ে গঠিত। একটি জাতির উত্থান প্রকৃতপক্ষে তার ত্যাগ ও কুরবানির ভিত্তিতে সম্ভব হয়। লোভ-লালসা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ঈর্ষা-হিংসার ফলে জাতি পরাধীন ও দাসত্বে পদানত হয়।

তাই কবি বলেছেন :

'মুসলমান দর গোর, মুসলমানি দর কিতাব।'

মুসলিমরা এখন কবরে এবং মুসলমানি পাওয়া যাবে কেবল কিতাবে!

সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পরও এই দেশে শিক্ষাব্যবস্থা নৈতিকতাভিত্তিক সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত হতে পারেনি। এখন আর আমাদের ওপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শিক্ষাব্যবস্থা চাপানোর প্রশ্ন যেমন ওঠে না, তেমনই ধর্মশিক্ষা সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক করার জন্যও কোনো বিদেশি সাহায্যের আবশ্যক হয় না। এ ব্যাপারে আমরাই যথেষ্ট; তবে তা হচ্ছে না। তাই বলতে হয়—

আফসোস করার অবসর নেই,
আফসোস বোঝারও অনুভূতি নেই।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে জাতির নৈতিকতা শূন্যের স্তরে পৌঁছেছে। যা জাতির সম্মান, স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব হুমকির মুখে নিক্ষেপ করেছে।

আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস জাতির পতনের ইতিহাস। অনুভূতিহীন জাতির সম্মুখে এ আলোচনা কি ভালো বোধ হবে? তবে নিরাশ হওয়া চলবে না। মানুষ যেখানে পতিত হয় সেখান থেকে উত্থানের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। অনুভূতি জাগ্রত হলে উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত হয়।[৯৮]

আলিয়া মাদরাসার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক মোল্লা মাজদুদ্দিন

১৭৭৬ সালে মোল্লা মাজদুদ্দিন কলকাতায় বসবাস করতেন। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি ও দরসে নিজামিয়ার প্রবর্তক মোল্লা নিজামুদ্দিনের শিষ্য ছিলেন। জনসাধারণের নিকট তিনি মৌলবি মদন নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বহুমাত্রিক গুণপনা ও দক্ষতা ছিল সমাজে কিংবদন্তিতুল্য।

শাহ আবদুল আজিজ দেহলবির রচনাবলিতে যে মৌলবি মদনের উল্লেখ রয়েছে, সেই ব্যক্তি তিনিই। কলকাতা আগমনের পূর্বে তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে 'আজমুত তাফাসির'-এর লেখক মৌলবি রহিম বখ্‌শ লিখেছেন :

'একবার মৌলবি মদন বহস (বিতর্ক) করার জন্য শাজাহানপুর থেকে দিল্লি আসেন। তাঁর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। দিল্লিতে এসে তিনি শাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য মাদরাসায়ে রহিমিয়া আসেন। মাদরাসাচত্বর খুবই প্রশস্ত ও উন্মুক্ত ছিল। মাদরাসার চত্বরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ফরাশ বিছানো ছিল। ফরাশের একপ্রান্তে একটা পালং ছিল। শাহ সাহেব ক্লান্তি অনুভব করলে পালঙে সটান শুয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। মৌলবি মদনকে দেখে শাহ সাহেব তাকে নিচের ফরাশে বসার ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু মৌলবি মদন সেখানে বসতে অস্বীকৃতি জানালে শাহ সাহেব খাদেমদের আলাদা পালং পেতে ভালো বিছানা দিতে বললেন। এরপর মৌলবি মদন পালঙে বসে বললেন, আমি একটি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি—আমি আপনার সঙ্গে 'বহস' (ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কে তর্ক) করতে চাচ্ছি। আপনার শিক্ষাদীক্ষার বেশ জয়ডাক শুনেছি।

প্রস্তাব শুনে শাহ সাহেব প্রথমত অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু মৌলবি মদনের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে বহসে যুক্ত হন। উচ্চতর মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলবি মদনের বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল, শাহ সাহেব এই সম্পর্কে সমাধান হয় না এমন কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করলে মৌলবি মদন চোখের পলকে পালং থেকে নেমে নিচে গিয়ে বসলেন। বললেন, সাধারণের জুতা রাখার জায়গাতেও বসার যোগ্য আমি নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। এরপর শাহ সাহেব তাকে তুলে পালঙে বসান এবং ক্ষমা করে দেন।

---

৯৮. আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, আবদুস সাত্তার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা ১৪।

মৌলবি মদন আদর্শবাদী বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের গভীরতা ছিল অগাধ। দলে দলে শিক্ষার্থী তাঁর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতেন। এইভাবে চারদিকে যখন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল, তখন সেই ঘোর দুর্দিনে কলকাতার মুসলিমরা সিদ্ধান্ত নিলেন, এমন একজন জ্ঞানীগুণী লোককে যেভাবেই হোক কলকাতায় স্থায়ীভাবে রাখার বন্দোবস্ত করতে হবে। এই সময় তাকে কলকাতায় রাখা বড় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো, তখন কলকাতার মুসলিমদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করে তা চালিয়ে ও টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাদের ছিল না। শিক্ষকের পর্যাপ্ত বেতন, তার ওপর ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা কলকাতার মুসলিমদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এরপরও তারা পরিকল্পনা করল, বাংলার শাসনকর্তার (লর্ড হেস্টিংস) নিকট এই মর্মে আবেদন করবেন যে, তিনি যেন এমন একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির আজ্ঞা করেন যেখানে মুসলিমদের সন্তানরা নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারে এবং মোল্লা মাজদুদ্দিনের মতো প্রাজ্ঞ আলেম থেকে তারা উপকৃত হতে পারে।

তারপর কলকাতার বিশিষ্ট মুসলিমরা এই মর্মে একটি দরখাস্তসহ লর্ড হেস্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বয়ং লর্ড হেস্টিংসের জবানিতে শুনুন :

'১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিমদের একটি প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং আমাকে অনুরোধ করে, প্রেসিডেন্সিতে মোল্লা মাজদুদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তিকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে রাখার জন্য আমি যেন সচেষ্ট হই, যাতে এখানকার মুসলিম ছাত্ররা প্রচলিত ইসলামি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে। এই প্রতিনিধিদল আমাকে অবহিত করে যে, এই ব্যক্তি ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানে অগাধ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, এই ধরনের গুণী লোক সচরাচর পাওয়া যায় না।

বলাবাহুল্য, কলকাতা এখন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নগরপীঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্য থেকেও লোকজন এই শহরে এসে বসতি স্থাপন করছে। অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় রীতি অনুযায়ী ভারত এবং ইরানের জন্য এ খুব গৌরবের বিষয় যে, এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোকেরা মানবিক উন্নতির প্রয়াস পাচ্ছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর এখানকার শিক্ষাদীক্ষার অবনতি ঘটিয়েছে এবং এই লুপ্তপ্রায় শিক্ষাপদ্ধতি পুনরুজ্জীবিত রাখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সরকারেরও এমন অসংখ্য অফিসারের প্রয়োজন যাদের প্রচুর দক্ষতা ও যোগ্যতা আছে। কেননা অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ফৌজদারি আদালতে ও দেওয়ানি আদালতে জজের

আসনে খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য লোকের প্রয়োজন। এই গণ্যমান্য মুসলিম প্রতিনিধিরা মনে করেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি যথার্থ যোগ্য লোকদের মর্যাদা দিতে জানি। এইজন্য তারা এই আবেদন নিয়ে সরাসরি আমার কাছে এসেছেন। মোটামুটি তাদের দরখাস্তের বিষয় হচ্ছে এই। সকলে মিলে পেশকৃত এই দরখাস্তের মূল বক্তব্য উদ্ধার করতে আমাকে আমার স্মৃতিশক্তির ওপর জোর দিতে হয়েছে। কেননা, তাদের মূল দরখাস্তখানা হারিয়ে গিয়েছে।

আমি এই প্রতিনিধিদলকে এই আশ্বাস জানিয়ে বিদায় করেছি, যতটুকু সম্ভব আমি এই ব্যাপারে চেষ্টা করব। এরপর আমি উক্ত মোল্লা মাজদুদ্দিনকে ডেকে পাঠাই এবং জিজ্ঞাসা করি, মুসলিমদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না। তিনি আমার কথায় সম্মত হন এবং ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রস্তাবিত মাদরাসার জন্য কার্যক্রম শুরু করা হয়। এই ব্যক্তি সত্যি এই মাদরাসার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং তিনি তার সম্পর্কে মুসলিমদের উচ্চ ধারণা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

যেহেতু তিনি জানতেন, সীমাবদ্ধ ব্যয়-বরাদ্দের ভেতর দিয়ে মাদরাসার কার্যপরিচালনা করতে হবে, এইজন্য তার পক্ষে বেশি ছাত্রকে পড়ার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হতো না। এ ছাড়া ৪০ জন ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা-ব্যয়ের দায়িত্ব মাদরাসাকে বহন করতে হতো। এইসব ছাত্র মফস্বল থেকে অথবা অন্যান্য প্রদেশ থেকে এসেছে। বিগত বড়দিনের সময় আমি দেখে যারপরনাই খুশি হই যে, মাদরাসার কতক ছাত্র কাশ্মীর ও গুজরাটের মতো দূরাঞ্চল থেকে এখানে পড়ার জন্য এসেছে। মাদরাসায় কর্ণাটকেরও একজন ছাত্র দেখলাম। আমাকে এই ব্যাপারে অবহিত করা হয়, যেহেতু মাদরাসায় আবাসিক বন্দোবস্ত সীমিত এইজন্য বেশি ছাত্র ভর্তি করা সম্ভবপর নয়। মাদরাসার এই দৈন্য ঘুচানোর জন্য আমি বৈঠকখানায় (বৌদ্দপুকুর নামে পরিচিত) একখণ্ড জমি খরিদ করে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি দালান তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কলকাতার অন্যান্য স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী এই ভবনের নির্মাণকার্য অগ্রসর হতে থাকে।

এরপর আমি এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করি। অবশ্য এর খরচও তেমন বেশি ছিল না। কিন্তু আমি কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেকটরসের কাছে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে সুপারিশ করতে চাচ্ছি যাতে এই প্রতিষ্ঠানটির ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পায় এবং স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠানটি আবহমানকাল ধরে টিকে থাকে।

মাদরাসা ভূমির মূল্য ছিল ৬ হাজার ২৮০ টাকা দুই আনা ১১ পাই। এরপর মাদরাসা ভবন নির্মাণে জমির মূল্যসহ সর্বমোট ৫৭ হাজার ৭৪৫ টাকা দুই আনা ১১ পাই খরচ হয়। অবশ্য এই খাতে এর চেয়ে বেশি যেন খরচ না হয় আমি এই ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখছি।

এখন আমার অনুরোধ, এই খরচ অনুমোদন করে তা কোম্পানির হিসেবে শামিল করা হোক এবং আমাকে এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হোক। এ ছাড়া মাদরাসার ক্রমবর্ধমান খরচ নিবৃত্তি করার জন্য এক খণ্ড জমিও বিধিবদ্ধ করা হোক।

উল্লেখ্য, দিবাভাগে যারা পড়াশোনা করে তারা কোনো ফিস দেয় না। আগামী দিনে সর্বোচ্চ ১০০ ছাত্রের জন্য ১ হাজার টাকা মাসিক ভাতা বা বৃত্তি বরাদ্দ রাখতে চাই। এজন্য এ ব্যাপারে আমি সুপারিশ করছি, কলকাতার পার্শ্ববর্তী কোনো মৌজা বা গ্রাম মাদরাসার খরচের জন্য বরাদ্দ করা হোক এবং এই ব্যাপারে নিয়মিত কার্যনির্বাহের জন্য রেভিনিউ কমিটিকেও অবহিত করা হোক।

আদায়-উসুল ও জমা-খরচের জন্য নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে হবে, যাতে কোনোরকম হিসেবে গন্ডগোল বা আত্মসাৎমূলক সমস্যা দেখা না দিতে পারে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে।'

স্বাক্ষর

ওয়ারেন হেস্টিংস, ফোর্ট উইলিয়াম, ১৭ এপ্রিল ১৭৮১ খ্রি.

মঞ্জুর করলাম, নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, এই আনুমানিক খরচ পরামর্শের পর হিসেবে শামিল করে নিতে হবে। গভর্নরের এই মতামতে আমিও একমত। এই ব্যাপারে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা আমিও অনুমোদন করি। নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, এই বিবৃতি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের নকল মাদরাসা ভবনের নকশাসহ এই জাহাজেই অনারেবল কোর্ট অব ডিরেকটরসের সমীপে বিলাতে প্রেরণ করা হোক।

আলিয়া মাদরাসার পত্তন

এরপর মোল্লা মাজদুদ্দিনকে কলকাতায় স্থায়ী বসবাস করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তিনিও এতে সম্মত হন। মুসলিমদের ইচ্ছা ও আগ্রহমতে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে বৈঠকখানার (শিয়ালদা স্টেশন) একটি ভাড়া বাড়িতে প্রস্তাবিত মাদরাসা উদ্‌বোধন করা হয়। 'দরসে নিজামি'র পাঠ্যসূচি অনুযায়ী মাদরাসার শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করা হয়। কেননা, মোল্লা সাহেব নিজে 'দরসে নিজামি' পড়া আলেম ছিলেন। মাদরাসার ব্যয়নির্বাহের সব দায়িত্ব গভর্নর গ্রহণ করেছিলেন।

তখন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোম্পানিকে গভর্নর সুপারিশ করেছিলেন :

'আমি এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছি যেখানে মুসলিম ছাত্রদের আইন শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষা লাভের পর এরা সরকারের অধীনে জজ ও পরিসংখ্যানবিদের (অ্যাসেসর) পদ অলংকৃত করবেন। এতদিন আমি এই মাদরাসার যাবতীয় খরচ আমার বিশেষ তহবিল থেকে বহন করেছি। কিন্তু এখন

কোম্পানির এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় হয়েছে। মাদরাসার জন্য ইতিপূর্বে যে জমি নেওয়া হয়েছে কোম্পানি সেখানে উপযুক্ত মতো মাদরাসার ভবন নির্মাণের বন্দোবস্ত করবে। আমার হিসেবে আনুমানিক এতে ৫১ হাজার টাকা ব্যয় হতে পারে।'[৯৯]

যদিও কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেকটরস মাদরাসা সম্পর্কে গভর্নরের এই প্রস্তাব বিলাতের কোর্ট অব ডিরেকটরসের কাছে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু ১৭৮২ সাল নাগাদ মাদরাসা সম্পর্কে কোনো মঞ্জুরি পাওয়া যায়নি। পরে গভর্নর নিজে এই মাদরাসার খরচাদি নিজের তহবিল থেকে বহন করতে থাকেন। তিনি কোনোমতেই মাদরাসা বন্ধ হতে দিলেন না।

মাদরাসার ব্যয়নির্বাহ

মাদরাসার ব্যয়নির্বাহের জন্য স্থায়ী আমদানি হিসেবে বোর্ড চব্বিশ পরগনার কতিপয় মৌজা বিধিবদ্ধ করেন যার মাসিক আয় ছিল বারোশ টাকা। এ ব্যাপারে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেকটরসকে অবহিত করে যে বিবরণ পাঠানো হয় তা নিম্নরূপ :

'প্রাচ্য শিক্ষার সম্প্রসারণ বা উন্নতির জন্য আমার ১৮ এপ্রিলের (১৭৮১ খ্রি.) প্রস্তাব অনুযায়ী মাদরাসা বা কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং নিয়মিত তা চলছে। এই মাদরাসার জন্য একটি ভবনও নির্মাণ করা হয়েছে। বোর্ড এই মাদরাসার খরচ নির্বাহের জন্য শহরের কাছাকাছি কিছু জমি বরাদ্দ করেছে। এই জমির মাসিক আয় বারোশ টাকা। আমার বিশ্বাস, এই আমদানি মাদরাসার বর্তমান ব্যয়নির্বাহের যথার্থ পরিপূরক হবে।'[১০০]

মাদরাসার সংস্কার এবং দরসে নিজামিয়ার ইতিবৃত্ত

১৭৯০ সাল অবধি মাদরাসার শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষা-বিষয় দরসে নিজামির অনুরূপ ছিল। কেননা এই সিলেবাস অনুযায়ী পাক-ভারতের অন্যান্য মাদরাসায় শিক্ষাদান করা হতো। এই দরসে নিজামির প্রবর্তক ছিলেন লক্ষ্ণৌর সাহালু নিবাসী মোল্লা কুতুবুদ্দিনের পুত্র মোল্লা নিজামুদ্দিন সাহালুবি। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। দরসে নিজামির প্রবর্তক হিসেবে তাঁর নাম চিরকাল মুসলিম শিক্ষার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আজ পর্যন্ত পাক-ভারতের ঐতিহ্যিক মাদরাসাগুলো দরসে নিজামির রীতি অনুসরণে পরিচালিত হচ্ছে।

আলিয়া মাদরাসাতেও এই সিলেবাস অনুসরণ করা হতো। কিন্তু ১৭৯১ সালে সরকার এই পদ্ধতিকে আরও 'মজবুত' ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা

---

৯৯. Past and Present of Bengal, vol. vii, p. 99.

১০০. Consultation no 283 dt. 3rd June 1782-এর সূত্রে আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, আবদুস সাত্তার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা ৩৮।

করেন। কিন্তু মুসলিমরা তাতে বাধা দেন। বাধ্য হয়ে সরকার মাদরাসার তাবৎ বিষয়াদি সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং তথ্য উদ্ধারের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি মাদরাসার সকল অব্যবস্থা তদন্ত করে বোর্ডের নিকট পেশ করেন।

এরপর ষড়যন্ত্র শুরু হয়

১৭৯১ সালের ১৮ মার্চের রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায়, মি. জিপম্যান মাদরাসা তদন্ত করেন এবং মাদরাসার বিশেষ অবনতি ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন। এতে আরও খুঁজে পেল, মাদরাসার রেজিস্টারে বৃত্তিভোগী ছাত্রদের নাম ছিল, কিন্তু তারা মাদরাসায় কোনোমতে হাজিরা দিত, পড়াশোনা ও নিয়মতান্ত্রিক উপস্থিতি সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ছিল না। ছাত্রদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনও নাকি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মি. জিপম্যানের নেতৃত্বে এই রিপোর্ট বোর্ডের নিকট পেশ করা হলে মোল্লা মাজদুদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও পদচ্যুতির জন্য গভর্নর জেনারেলের কাছে সুপারিশ করা হয়। ফলে গভর্নর জেনারেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে মোল্লা মাজদুদ্দিনকে পদচ্যুত করেন এবং সে স্থলে মুহাম্মদ ইসরাইল সাহেবকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেন। এইসঙ্গে মাদরাসার ব্যবস্থাপনা কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

ইংরেজ সেক্রেটারি নিয়োগের জল্পনা-কল্পনা

১৭৯১ সালের সংস্কারপ্রচেষ্টার পর মাদরাসার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ছাত্রসংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পায়। এভাবে ১৮১১ সাল অবধি মাদরাসার কার্যক্রম স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে। তবে ১৮১১ সালের পর কমিটি মাদরাসার সার্বিক উন্নতি এবং দেখাশোনার জন্য একজন ইংরেজ অফিসার নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইতিপূর্বে এ উদ্দেশ্যে একজন আমিন নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু আমিনের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাপ্রাপ্তি অবশেষে মাদরাসার শৃঙ্খলা বিধানের পরিপন্থি প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং কমিটি মনে করে একজন ইংরেজ সেক্রেটারি সম্ভবত অনুরূপ কাজে বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করতে পারবে। ফলে এই মর্মে একজন ইংরেজ সেক্রেটারি নিয়োগের সুপারিশ করে কমিটি সরকারের কাছে একখানি দরখাস্ত পেশ করে। দরখাস্তে মাদরাসার যুগোপযোগী সংস্কার সাধনেরও জোর সুপারিশ করা হয়।

১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস পুনরায় ভারতের গভর্নর জেনারেল নিয়োজিত হন। কমিটির এই দরখাস্ত তাঁর নিকট পেশ করা হয়। তিনি কমিটির প্রস্তাব ন্যায়সংগত এবং যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কিন্তু একজন সেক্রেটারির ব্যয়ভার মাদরাসা বহন করতে পারবে কি না এই কথা চিন্তা করে তিনি গড়িমসি করতে থাকেন।

মাদরাসার প্রথম সেক্রেটারি

কমিটির অনেক লেখালেখি ও চেষ্টা-চরিত্রের পর গভর্নর জেনারেল ১৮১৯ সালে ক্যাপ্টেন অ্যারোনকে (AYRON; পূর্বে তিনি চতুর্থ ইনফেন্ট্রির কাপ্তান ছিলেন) আলিয়া মাদরাসার সেক্রেটারি পদে নিয়োজিত করেন। সামরিক বিভাগের এই ব্যক্তির নিয়োগ সম্পর্কে স্বয়ং গভর্নর মন্তব্য করেছিলেন :

'এই ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কার্যদক্ষতা এই পদের জন্য খুবই উপযুক্ত হয়েছে।' বিষয়টি হাস্যকর না!

পরীক্ষার প্রবর্তন ও তার বিরোধিতা

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রণীত ধারা অনুযায়ী মাদরাসায় নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষা প্রবর্তনের প্রশ্ন ওঠে। ছাত্র ও শিক্ষকরা এ ধরনের পরীক্ষার বিরোধিতা করেন। বিরোধিতার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন :

'যেহেতু ইতিপূর্বে মাদরাসার পরীক্ষা ঘরোয়াভাবে সম্পন্ন হতো। ছাত্রদের কৃতকার্য হওয়া বা অকৃতকার্য হওয়া সম্পূর্ণ হেড মাওলানার মর্জির ওপর নির্ভর করত, এইজন্য মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ সবসময় হেড মাওলানাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। কেননা ছাত্ররা ফেল করলে তাদের সারা বৎসরের অধ্যাপনা বিফলে যাবে। কোনো শিক্ষকের প্রতি যদি হেড মাওলানা অপ্রসন্ন থাকতেন, তার ক্লাসের ছাত্ররা নিশ্চিতভাবে ফেল করত। পক্ষান্তরে, ছাত্ররাও হেড মাওলানাকে তোষামোদ করত। ফলে ছাত্রদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা যাচাইয়ের এই কুক্ষিগত নীতির ফলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাদরাসার অন্যান্য শিক্ষকের পরিশ্রম এবং যোগ্যতা যেমন পরিমাপ করতে পারতেন না, তেমনই যথার্থ মেধাবী ছাত্রদের প্রতিভাও সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারত না। অতএব এই ধরনের সাধারণ পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে ছাত্ররা পরীক্ষার খাতায় যা লিখবে তা যাচাই এবং নম্বর প্রদান করার জন্য অন্য লোক নিয়োজিত হবেন। ফলে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের আসল পরিশ্রম তুলাদণ্ডে বিচার করা যাবে এবং তাদের আসল রূপ উন্মোচিত হবে। হেড মাওলানারও আর বাড়তি দাপট ও দায়িত্ব থাকবে না। অতএব উপর্যুক্ত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে হেড মাওলানার নেতৃত্বে সকল শিক্ষক এবং ছাত্র এই নতুন ধরনের পরীক্ষার ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন।

আসলে এই পরীক্ষানীতির বিরোধিতার কারণ ছিল অন্য। প্রকৃতপক্ষে মাদরাসার এই শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষারীতি শত শত বছর থেকে চলে আসছে। এখন এই নতুন পরীক্ষানীতি প্রবর্তন করা হলে শত শত বৎসরের আরবি শিক্ষার মূলনীতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। এ কথা চিন্তা করে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক এই নতুন ধরনের পরীক্ষার বিরোধিতা করেছিল।

সেকালের পরীক্ষানীতি

সেকালের পরীক্ষা গ্রহণের নিয়মকানুন ছিল ভিন্ন ধরনের। তখন বিদ্যার্জন এবং জ্ঞানানুশীলনই মুখ্য ছিল। একেবারে তুলাদণ্ডে ওজন করে পরীক্ষা গ্রহণ করার নিয়ম ছিল না। সেকালে পরীক্ষা পাশের জন্য না ছিল কোনো নির্দিষ্ট সময়, না ছিল ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক আর প্রশ্নপত্রের জটাজাল। সেকালে একবার এবং শেষবারের মতো একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো এবং তার প্রকৃতি অনেকটা এই ধরনের ছিল :

নির্দিষ্ট কিতাবাদি পড়া সম্পন্ন হলে শিক্ষক নিজে নিজস্ব কায়দায় পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। শিক্ষক যদি মনে করতেন, লেখাপড়ায় ছাত্রটির কোনো দৈন্য নেই, সে যথেষ্ট বিদ্যার্জন করেছে এবং অপরকেও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করেছে, তখনই পরীক্ষা পাসের সনদ প্রদান করা হতো। পক্ষান্তরে, যে ছাত্রকে পাশের অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করতেন তাকে কোনোমতে আর রেয়ায়েত করা হতো না এবং যে বিষয়ে তার দৈন্য রয়েছে সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করা হতো। সেকালে যোগ্যতা অর্জন ছাড়া কোনো ছাত্র অহেতুক পাশ করার ভাবাবেগ প্রকাশ করত না এবং যতদিন না শিক্ষক তার জ্ঞানার্জন সম্পর্কে আশ্বস্ত হতেন ততদিন অবিরাম পরিশ্রম করতে হতো।[১০১]

পরীক্ষার এই আদিনীতি আবহমানকাল ধরে চলে আসছে এবং ছাত্র-শিক্ষক উভয়ে এই রীতিতে অভ্যস্ত ছিল। স্বভাবত এই রীতিতে ছাত্ররা শিক্ষকের অনুগত থাকত এবং নিজেদের ভুল ও দোষত্রুটি শুধরে নেওয়ার জন্য শিক্ষকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হতো।

অতএব, এই প্রাচীন নিয়মের ওপর সরকার যখন পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

মাদরাসার প্রথম পাশ্চাত্য ধারার পরীক্ষা

সমস্ত বিরোধিতা উপেক্ষা করে সরকার কমিটির প্রস্তাবিত 'আধুনিক' পরীক্ষানীতি অনুমোদন করেন এবং কলকাতার টাউন হলে মাদরাসার প্রথম পরীক্ষার বন্দোবস্ত করেন। মাদরাসার প্রথম পরীক্ষা ১৮২১ সালের ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় পরীক্ষা ১৮২২ সালের ৬ জুন অনুষ্ঠিত হয়।

১৮২২ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পরীক্ষার সময় পদস্থ সরকারি অফিসার এবং গণ্যমান্য নাগরিকগণ পরীক্ষা পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে মি. টমসন, শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি ড. এইচ. এইচ. উইলসন এবং এইচ ডি প্রিন্সফের

[১০১]. ড. জিয়াউদ্দিন কৃত 'নেজামে ইমতেহান', মুসলিম ইউনিভার্সিটি জার্নাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৪।

নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সদর দেওয়ানির ল' অফিসারবৃন্দও এই ঐতিহাসিক পরীক্ষা দেখতে এসেছিলেন।

পরীক্ষা সমাপ্তির পর উভয় পরীক্ষার ফল গভর্নর জেনারেলের নিকট পেশ করা হয়। বলাবাহুল্য, পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়েছিল। ১৮২১ সাল থেকে আলিয়া মাদরাসায় এই পরীক্ষাব্যবস্থা চালু হয়।

১৮১৩ সালের শিক্ষানীতি

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে বহুদিন পূর্বে। কিন্তু কোম্পানি এ দেশের জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি আদৌ মনোযোগী ছিল না। এ দেশ শাসনের মূলে তাদের একটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল, যেভাবে হোক এই দেশের সম্পদে বিলাতকে সমৃদ্ধ করে তোলা। কিন্তু বিলাতের পার্লামেন্টে এমন কিছু লোক ছিল যারা এই দেশের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দের পক্ষে ছিল। যদিও তাদের এই আগ্রহের পেছনে অন্য কারণ ছিল।

১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যচুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং পুনরায় চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব বিলাতের পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। এইসাথে পার্লামেন্টে এই দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়। পার্লামেন্টের কতক মেম্বার ও কোম্পানির ডিরেকটররা এর বিপক্ষে মতামত প্রদান করে এবং ভারতীয় লোকদের শিক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় করাকে তারা সম্পূর্ণ অলাভজনক বলে অভিহিত করে। তা সত্ত্বেও পার্লামেন্ট ভারতের শিক্ষা প্রসঙ্গটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনাধীন রাখে এবং এ ব্যাপারে একটি শিক্ষাব্যবস্থা বা অ্যাক্ট প্রণয়ন করার প্রস্তাব করে। এই অ্যাক্ট অনুযায়ী কোম্পানিকে এই দেশের শিক্ষা খাতে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বলে। এরপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোম্পানির ডিরেকটররা ১৮১৪ সালের ৩ জুন গভর্নর জেনারেলকে উক্ত শিক্ষাখাতের ১ লক্ষ টাকা খরচ করার নির্দেশ প্রদান করে কিন্তু এই নির্দেশের পাশাপাশি এ কথাও বলা হয়, এই অর্থের আনুকূল্যে সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত এবং সংস্কৃত-মাধ্যম শিক্ষায়তনগুলোকে যেন বেশি সহায়তা করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় যেসব সাহিত্য বা গ্রন্থ আছে তা যেন ইংরেজিতে অনুবাদ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে অর্থের বড় একটি অংশ বেনারসের সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ও সম্প্রসারণে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়।[১০২]

মুসলিমদের শিক্ষার ব্যাপারে উপেক্ষা

এই আদেশে মুসলিমদের শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দের কোনো উল্লেখ ছিল না। মুসলিমদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের এই ঔদাসীন্য ছিল সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। এই

১০২. আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, আবদুস সাত্তার, পৃষ্ঠা ৫৩।

দেশের হিন্দুরা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে মুসলিমদের পরাভূত করবে এই ছিল কোম্পানি কর্তৃপক্ষের একান্ত ইচ্ছা।

আলিয়া মাদরাসা মুসলিমদের একমাত্র সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সরকার নিয়মিত এই প্রতিষ্ঠানের খরচ বহন করে এসেছিল, কিন্তু মুসলিমদের শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। আলিয়া মাদরাসার মতো বেনারসের সংস্কৃত কলেজেও তারা কিছু অর্থ ব্যয় করছিল। হিন্দু-মুসলিমদের এই দুটি প্রতিষ্ঠান চালু রাখার পেছনে তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি কাজের জন্য কিছু কর্মী তৈরি করা। এই প্রতিষ্ঠান দুটি না থাকলে সরকারের স্থানীয় বিচার বিভাগ ও অন্যান্য ধর্মীয় বিধানসংক্রান্ত কার্যক্রম ব্যর্থ হতো এবং এ দেশে তাদের শাসন অচল হয়ে পড়ত।[১০৩]

দ্বিতীয়ত, যোগ্য অফিসার সৃষ্টির জন্য তারা এই প্রতিষ্ঠান-দুটিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করত তার পরিমাণ ছিল খুব অল্প। তুলনামূলক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাংবাৎসরিক খরচের সাথে আলিয়া মাদরাসার খরচের তুলনা করলে এই সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

আলিয়া মাদরাসা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খরচের ব্যবধান

আলিয়া মাদরাসার জন্য ১৭৮১ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত ৪৩ বৎসরে সর্বমোট গড়ে প্রতি বছর ৩০ হাজার ৭৭২ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। যাতে প্রতি মাসের খরচ দাঁড়ায় ১ হাজার ৯ শত ৮১ টাকার মতো। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতি বৎসরের খরচ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকারও বেশি ছিল। এই কলেজে ইউরোপীয়দের দেশ শাসনের কৌশল শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে মাত্র ২০-২৫ জন ছাত্র পাশ করে বের হতো।

মাদরাসার দ্বিতীয় ভবন

১৭৮১ সালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস যেখানে মাদরাসা ভবন নির্মাণ করেছিলেন সেখানে স্কটল্যান্ডের মহিলা মিশনের একটি ভবন ও একটি গির্জা ছিল। তা ছাড়া বৌবাজার এলাকার পারিপার্শ্বিকতা আলিয়া মাদরাসার জন্য অনুকূল ছিল না। বিশেষ করে এই অঞ্চলে গোঁড়া হিন্দুরা বসবাস করত। হিন্দুপ্রধান এলাকায় মুসলিমদের একমাত্র মাদরাসা কোনোক্রমেই স্বকীয়তা রক্ষা করে টিকে থাকতে পারবে না, এজন্য মাদরাসা কমিটি মাদরাসা স্থানান্তরের ইচ্ছা করেন এবং এই মর্মে সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন, পারিপার্শ্বিকতার নিরিখে মাদরাসা ভবনের স্থানান্তর অবশ্য কর্তব্য। যত শীঘ্র সম্ভব মাদরাসা স্থানান্তর করা হোক। গভর্নর জেনারেল কমিটির এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং মুসলিম অধ্যুষিত 'কলঙ্গা' এলাকায় (বর্তমান ওয়েলেসলি স্ট্রিট) সম্পূর্ণ সুসজ্জিত

১০৩. আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, আবদুস সাত্তার, পৃষ্ঠা ৫৩।

ও সুরম্য ভবন নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৩৬ টাকা বরাদ্দ দেন। কমিটি অনতিবিলম্বে এজন্য এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং ১৮২৪ সালের ১৫ জুন অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে গভর্নর জেনারেল রাইট অনারেবল উইলিয়াম আমহার্স্ট অংশগ্রহণ করেন। তা ছাড়া রাজস্ব বোর্ডের সকল কর্মচারী ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। মাদরাসা কমিটির সদস্য চার্লস লুসিংটন তাঁর লিখিত ইতিহাসগ্রন্থে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন :

'আলিয়া মাদরাসার সেকালের ভবনটি সম্পূর্ণ পতিত পরিবেশের আবেষ্টনীতে ছিল। নৈতিকতার প্রশ্নে জায়গাটি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল (চারিদিকে বেশ্যালয় ছিল)। এইজন্য মাদরাসা স্থানান্তরের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। তাই সরকার একটি উপযুক্ত জায়গায় মাদরাসার জন্য সুরম্য ও প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ অনুমোদন করেন। এই ভবনটির নকশা হিন্দু কলেজের মতো বিরাটাকার এবং সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছিল। সরকার এই ভবন নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৩৬ টাকা মঞ্জুর করেন, এই টাকার একটা বিশেষ অংশ মাদরাসার পুরোনো বাড়ির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। এখন মাদরাসা নির্মাণের জন্য যে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে, সেখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা মুসলিম। এই ভবনটি নির্মাণের সময় এমনভাবে প্রশস্ত ও বিরাটাকারে তৈরি করা হয়েছে যাতে মাদরাসার ভেতরে একটি স্কুলও চলতে পারে। কারণ এই ধরনের একটি স্কুল পত্তনের প্রতি মুসলিমদের আগ্রহ ছিল।'[১০৪]

মাদরাসার শিলালিপি

মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তরে যে লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছে তা ইংরেজি, আরবি ও উর্দুতে ছিল। নিম্নে শুধু ইংরেজি শিলালিপি হুবহু প্রদত্ত হলো :

By the blessing of almighty God. In the reign of his most gracious Majeisty George the fourth under the auspices of The Right Honourable William Pitt Amherst. Governor General of the British Possession in India.

John Paesr Larkin Esqr, Provincial grand Master of Fraternity and free Masson in Bengal laid the foundation Stone of the idifice the Mohammadan College of Calcutta amidst the acclamation of a vast Concourse of native population of this city in the Presence of a numerous assembly of Fraternity and of the Presidents on the 15th day of July in the year of our Loard 1824 and of the era of

[১০৪]. চার্লস লুসিংটন কৃত 'স্থাপত্যের ইতিহাস' (১৮২৪ খ্রি.), পৃষ্ঠা ১৪০।

Masonary 5824. Planned and Constructed by William Burn and J. Mackintosh and William Kemp.

মাদরাসার এই সুরম্য নতুন ভবনের নির্মাণকার্য ১৮২৭ সালে সম্পন্ন হয়। ভবনের চারিদিকে প্রশস্ত রাজপথ ছিল। মাদরাসা ও রাজপথের মাঝখানে প্রায় ২০ হাতের ব্যবধান ছিল। চতুষ্কোণবিশিষ্ট এই ভবনের মাঝখানে বিরাট আঙিনা ও বিরাট থামের ওপর স্থাপিত বারান্দা ছিল। মাদরাসা ভবনের চার কোনায় চারটি সিঁড়ি ছিল। আঙিনার মাঝখানে কাঠের তৈরি একটি ছোট ও সুন্দর বিশ্রামাগার তৈরি করা হয়েছিল। এই বিশ্রামাগারে শিক্ষক ও মাদরাসার পদস্থ ব্যক্তি ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। মাদরাসা ভবনে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৬০টি কক্ষ ছিল। মাদরাসার কর্মচারীদের আবাসিক বন্দোবস্তও মাদরাসার আবেষ্টনীর ভেতরে করা হয়েছিল। সমগ্র এলাকার চারিদিকে মজবুত লৌহদণ্ড দ্বারা ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছিল। বাইরে সারি সারি গাছ লাগানো হয়েছিল। মোটকথা, স্থাপত্যের ইতিহাসে আলিয়া মাদরাসা একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮২৭ সালের আগস্টে এই নতুন ভবনে মাদরাসার ক্লাস চালু করা হয়েছিল।

লাইব্রেরির পত্তন

আলিয়া মাদরাসার সংশোধনী পরিকল্পনাধীনে ১৮২০ সালে এক লাইব্রেরির পত্তন হয়। ১৮১৯-২০ সালের সামগ্রিক খরচের টাকার উদ্বৃত্ত ৭ হাজার টাকার ওপর ভিত্তি করে লাইব্রেরির কাজ শুরু করা হয়। লাইব্রেরির জন্য বার্ষিক ৪৮০ টাকার পুস্তকাদি খরিদ করার জন্য সরকার মঞ্জুর করেন এবং তা ১৯০৪ সাল অবধি অব্যাহত ছিল। এরপর ১৯০৫ সাল থেকে এই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয় এবং পরে ১৯০৭ সালে এই টাকার পরিমাণ ১ হাজার টাকায় উন্নীত হয়।

সংস্কৃত কলেজ

আলিয়া মাদরাসার নতুন ভবন নির্মাণের অব্যবহিত পরই ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ পত্তনের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুরি প্রদান করে এবং আলিয়া মাদরাসার অনুরূপ এই কলেজের বার্ষিক খরচ নির্বাহের জন্য ৩০ হাজার টাকা অনুমোদন করে।

আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা

১৮২৬ সালে লর্ড উলিয়াম বেন্টিংকের নির্দেশে মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে আলিয়া মাদরাসায় একটি ইংরেজি ক্লাস চালু করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, আস্তে আস্তে ইংরেজিকে মাদরাসার শিক্ষা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা। কেননা, ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং এই ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশেষ সচেতন ছিল।

আলিয়া মাদরাসায় প্রবর্তিত এই ইংরেজি শিক্ষা ১৮৫১ সাল অবধি চালু ছিল। এই দীর্ঘ ৩৪ বছরে সর্বমোট ১৭৮৭ জন ছাত্র এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিল। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই খাতে বিশেষ অর্থ ব্যয় করার পর ও অনেক চেষ্টার পরও এর ফলাফল তেমন সন্তোষজনক ছিল না। মোটকথা, ইংরেজির প্রতি মুসলিমদের তেমন আগ্রহ ছিল না। এই সময় শুধু আবদুল লতিফ নামক একজন ছাত্র এখানে জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেছিল। পরে তিনি মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যিনি হলেন নবাব আবদুল লতিফ। যিনি সিআইএ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অনুরূপ হুগলি মোহসেনিয়া মাদরাসার ছাত্র আমির আলিও (সৈয়দ) এই বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ

আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ ছিল মূলত ইংরেজদের প্রতি মুসলিমদের ঘৃণা ও অনাস্থা। তারা সন্দেহ পোষণ করত, এই ইংরেজি শিক্ষার নামে পাছে আবার মুসলিমদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনষ্ট করে কি না। ইংরেজি শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা ইংরেজির প্রতি তেমন আসক্ত ছিল না, পরন্তু অনেকে ইংরেজি শিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করতেন।

দ্বিতীয়ত, মুসলিমরা সবসময় ইংরেজদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। কেননা, ছলেবলে-কৌশলে তারা মুসলিমদের রাজত্বের পতন ঘটিয়েছে এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। ইংরেজরা মুসলিমদের জায়গির কেড়ে নিয়েছিল এবং তাদের সবরকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছিল। তারা সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের নানাভাবে হয়রানি করত। এমতাবস্থায় ইংরেজি ভাষা শিখলে মুসলিমরা ইংরেজদের নিকট ছোট হয়ে যাবে, এই ছিল ধারণা।

ইংরেজদের প্রতি মুসলিমদের এই সন্দেহ ও মনোভাব মূলত সত্য ছিল। ইংরেজদের লিখিত ইতিহাসেই এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। পূর্বে যারা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন, আজও আমরা তাদের গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মন্তব্য করি এবং বলি, আমাদের পূর্বপুরুষ যদি তখন একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতেন তাহলে আজ আমাদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হতো না। আমরাও আজ তাহলে হিন্দুদের মতো শিক্ষায় অগ্রসর থাকতাম। কিন্তু যে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয়দের মানসিকতায় এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করা যার ফলে তারা নিজেদের সমস্ত ঐতিহ্য ও ইতিহাস মিথ্যা বলে মনে করবে, সে শিক্ষা মুসলিমরা কেমন করে গ্রহণ করতে পারত?

ইংরেজদের শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য

পাক-ভারতে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে প্রথমে মি. চার্লস গ্রান্টের লিখিত নিবন্ধ পাওয়া যায় মাত্র। ১৭৯২ হতে ১৭৯৭ পর্যন্ত সময়ে তিনি নিবন্ধটি রচনা করেছিলেন। তিনি এই রচনায় ভারতীয়দের সম্পর্কে মন্তব্য করে তাদের বর্বর, ডাকাত, চোর ইত্যাদি আখ্যায়িত করেছেন। এরপর তিনি এই দেশের 'অর্ধবর্বর' লোকদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

'এই শিক্ষার দ্বারা বিশেষত হিন্দুরা বেশি উপকৃত হবে। প্রথমত আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা তাদের মাঝে যাত্রা শুরু করতে হবে। ছোট ছোট বুকলেট ও পুস্তিকায় এইসব সন্নিবেশিত আছে। সর্বাগ্রে তাদের একত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করতে হবে। মানবসভ্যতার সত্যিকার ইতিহাস ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে হবে। তাদের পূর্বেকার সব মতবাদ ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা যথার্থই মিথ্যা। অতঃপর তাদের পবিত্র ও উত্তম কর্তব্যাদির প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ধাবিত করতে হবে। পাপ, পুণ্য, শাস্তি ও পরকাল সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করতে হবে। এই ধরনের শিক্ষা যেখানে শুরু হবে, স্বভাবতই সেখানে মূর্তিপূজা এবং কাষ্ঠ ও মাটির তৈরি প্রতিমার উপাসনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।[১০৫]

এখানে মুসলিমদের সম্পর্কে কোনোপ্রকার মন্তব্য তখন ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কেননা, লেখক তার লেখার অন্য স্থানে মুসলিমদের সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, মুসলিমরা সংকীর্ণমনা, অহংকারী ও ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস পোষণ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কিত তার প্রস্তাবে প্রথমেই তিনি মুসলিমদের জড়ানো সমীচীন মনে করেননি। কেননা এতে সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। মোটকথা, এই ছিল পাক-ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের প্রথম প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনা।

মি. গ্রান্টের এই পরিকল্পনা ১৭৯৩ সালে পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। এই পরিকল্পনানুযায়ী সরকারি শিক্ষা ইশতেহারে এ সংক্রান্ত আরও দুইটি ধারা সংযোজন করা হয় :

১. ব্রিটিশ শাসিত ভারতের লোকদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সবরকম সম্ভাব্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য এমনসব পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে ক্রমান্বয়ে ভারতীয়রা উপযুক্ত সুযোগ পায় এবং তা তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির সহায়ক হয়।

---

১০৫. History of English education in India by Saved Mahmud, P. 13.

২. ভারতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মভিত্তিক মতবাদ অনুযায়ী উপাসনা ও শিক্ষার পথ সুগম করতে হবে এবং এজন্য সময়ান্তরে শিক্ষক প্রেরণ করতে হবে।[১০৬]

কিন্তু বিলাতের পার্লামেন্টের দূরদর্শী সদস্যরা শিক্ষা সম্পর্কিত ধারার এই মর্মে বিরোধিতা করেন যে, এতে আইনগতভাবে কতগুলো অসুবিধার সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেকটরবৃন্দ (পার্লামেন্ট সদস্যও) এর তীব্র বিরোধিতা করেন। শিক্ষানীতি সম্পর্কে মতবিরোধ প্রসঙ্গে তারা যে কারণ দেখিয়েছেন নিম্নে তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো :

১. এই পরিকল্পনা খুবই বিপজ্জনক এবং রাজনীতির পরিপন্থি। এতে দেশের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে এবং সম্ভবত এতে রাজত্বের ভিত্তিমূল নড়ে উঠবে। এতে আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যেরও সমূহ ক্ষতি হবে। এই শিক্ষানীতি দেশে বিপ্লবের সূত্রপাত করবে এবং আমাদের ধর্মের সর্বনাশ ডেকে আনবে। এই দেশের লোকদের ধর্মান্তরের প্রতি আকৃষ্ট করতে গেলে ব্রিটিশকে পাততাড়ি গুটাতে হবে।

২. একটি ধর্ম যখন প্রবর্তিত হয়, লোকদের উদ্দেশ্য তখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। ভিন্নধর্মী লোকদের নিজেদের ধর্মে আকৃষ্ট করার এই প্রয়াস অষ্টাদশ শতাব্দীতে আদৌ প্রযোজ্য নয়; বরং শান্তি বিনষ্ট করবে। কিছুসংখ্যক লোক যদি এই অভিযানে সংক্রমিত হয় এবং কয়েক লক্ষ লোক খ্রিষ্টান হয়ে যায় তাতে এমন বেশি কিছু লাভ হবে না; বরং পরিণামে চরম সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কলেজ পত্তনের দরুন আমরা সেই দেশ হাতছাড়া করেছি। অনুরূপভাবে এই দেশেও যুবক পাদরি সম্প্রদায় জনসাধারণের মাঝে ঢুকে পড়লে কোম্পানির ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি সাধিত হবে। কোনো ভারতীয় ছাত্র যদি সত্যি পাশ্চাত্য শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়, বিলাতে এসে দিব্যি লেখাপড়া করতে পারবে।[১০৭]

তীব্র বিরোধিতার মাঝে পার্লামেন্ট এই শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করে। তারপরও মি. গ্রান্ট নিবৃত্ত হন না। মি. গ্রান্ট শুধু একজন খ্রিষ্টান ছিলেন না, তিনি একজন ধর্মযাজক ছিলেন। পার্লামেন্টের এই বিরোধিতার মাঝে তিনি আরও আশার আলো খুঁজে পেলেন এবং এই ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য তিনি কোম্পানির একজন অন্যতম ডিরেকটর নির্বাচিত হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকলেন। অবশেষে মি. গ্রান্টের ইচ্ছা পূরণ হলো এবং ১৭৯৪ সালে তিনি কোম্পানির ডিরেকটর এবং ১৮০২ সালে বিলাতের পার্লামেন্টের সদস্যপদ লাভে সমর্থ হলেন। এবারে তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উঠেপড়ে

---

১০৬. Education In India under E. I. Company by Basu, P. 204.

১০৭. Education in India under E. I. Company by Basu, p. 204.

লাগলেন। তিনি ইন্ডিয়া হাউজ এবং পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে নিজের ইচ্ছার প্রচারণা চালাতে থাকলেন। বলতে লাগলেন, আমাদের ধর্মযাজক ও পাদরিদের ভারতে গিয়ে 'অর্ধবর্বর' ভারতীয়দের সুসভ্যরূপে গড়ে তোলার জন্য পার্লামেন্টের অনুমতি দেওয়া উচিত। তিনি এই প্রচারণার জন্য একখানি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি ভারতীয়দের নীচ-জীবন সম্পর্কিত মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরতেন এবং বলতেন, এই অসভ্য বর্বরের দেশে শীঘ্র আমাদের শিক্ষাবিদ ও পাদরিদের রওনা হওয়া উচিত। ব্রিটিশ নাগরিকদের ভাবাবেগ উত্তেজিত করার জন্য এই পত্রিকায় বলা হতো আমাদের অধিকৃত দেশসমূহে এমনসব অসভ্য ও অশিক্ষিত লোক আছে যাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। এতে আমাদের ধর্মীয় উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনই আমাদের রাজনীতির অঙ্গনও সম্প্রসারিত হবে। আমরা যদি আমাদের ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা ও মতবাদ এশীয় রাজ্যসমূহে প্রবর্তন করতে পারি তখন হবে আমাদের সত্যিকার বিজয়। মোটকথা, এভাবে আট-দশ বৎসরের প্রচারণায় তিনি লোকদের তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হন।

শিক্ষানীতি সমর্থিত

পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূলে আসার পর মি. গ্রান্ট তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উক্ত বিল পার্লামেন্টে পেশ করেন এবং পার্লামেন্টে উক্ত বিলে নিম্নোক্ত বাড়তি ধারাটুকু সংযোজন করে সংশোধনী শিক্ষা বিল পাশ করেন যে : 'ভারতীয়দের উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সবরকম উপকরণ ও উপাদানের বন্দোবস্ত করতে হবে। তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ ও ধর্মীয় উন্নতির জন্য যারা এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শন করার জন্য ভারতে অবস্থান করতে চায় তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হবে।'

বাহ্যত এই বিলে ভারতীয়দের শিক্ষা এবং চারিত্রিক উন্নতির জন্য ব্রিটিশ সরকারের অপেক্ষাকৃত দরদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আসলে এই বিলে নিহিত আসল যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা মূলত এ দেশীয় লোকদের খ্রিষ্টান বানানোর এক বৃহৎ পরিকল্পনা। এ দেশীয়দের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যারা ভারতে এসে অবস্থান করবে (তাদের জন্য বিশেষ সরকারি সুযোগ-সুবিধা থাকবে) তারা খ্রিষ্টানদের পাদরিকুল। কেননা, সেকালে খোদ ব্রিটেনেও শিক্ষার মূলভিত্তি ছিল ধর্মপ্রসূত। জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে এ কথা আরও স্পষ্ট হয় :

'সেকালে ইংল্যান্ডের শিক্ষা ছিল নামেমাত্র এবং তাও ধর্মীয় লোকেরা শিক্ষা দিতেন যা সর্বতোভাবে ধর্মসংক্রান্ত ছিল। যারা তখন শিক্ষালাভ করত তাদের উদ্দেশ্যও ছিল ধর্মসংক্রান্ত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা।'[১০৮]

---

১০৮. English National Education by H. Hole, p. 12.

১৮১৩ সালে এই শিক্ষানীতি যখন পাস হয় তখন ইংল্যান্ডের শিক্ষা ছিল চার্চকেন্দ্রিক, অতএব উৎকৃষ্ট শিক্ষার অর্থ খ্রিষ্টধর্মের 'প্রোপাগান্ডা' এবং 'যারা ভারতে থাকতে চায়' তারা হচ্ছে পাদরি সম্প্রদায়। অথচ উক্ত বিলের ভাষা এতই প্রচ্ছন্ন যে, সরল দৃষ্টিতে কারও এই গূঢ় রহস্য উদ্ধার করার উপায় ছিল না।

এরপর এই শিক্ষানীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হলো, ভারতীয়দের শিক্ষাখাতে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু ভারত সরকার অসাবধানতাবশত ১৮২৩ সাল অবধি এই অর্থ ব্যয় করল না। কিন্তু এই নতুন অ্যাক্ট পাদরিদের জন্য ভারতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় এবং তারা ভারতে এসে নানাস্থানে ইচ্ছানুযায়ী ছোট ছোট স্কুল খুলে বসে।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলেজের গোড়াপত্তন

এই সময় কলকাতার একজন নামজাদা জমিদার রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ডেভিড হেয়ার নামক একজন ঘড়িনির্মাতার বন্ধুত্ব হয়। রাজা রামমোহন হিন্দু ছিলেন কিন্তু পৌত্তলিকতা পছন্দ করতেন না। তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে দেদার পড়াশোনা করেছিলেন। ডেভিডের সংস্পর্শে তিনি খ্রিষ্টধর্মে আকৃষ্ট হন এবং খ্রিষ্টানদের সঙ্গে তাদের গির্জার উপাসনায় অংশ নেন। এর কিছুদিন পর তিনি 'ব্রাহ্ম-সমাজ' নামক একটি সম্প্রদায়ের পত্তন করেন। ডেভিড লেখাপড়া জানত না। কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ছিল। ডেভিডের পরামর্শক্রমে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলেজ' নামে একটি পাবলিক কলেজের পত্তন করেন। এই কলেজ পত্তনের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের সমকক্ষ অন্যান্য জমিদারের নিকট হতে ১১ লক্ষ ৩ হাজার ১৭৯ টাকা চাঁদা আদায় করেন। ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতায় এটিই প্রথম কলেজ। অতঃপর ১৮১৮ সালে কেরি নামক জনৈক পাদরি বেনারসে জয়নারায়ণ কলেজ নামক অপর একটি কলেজের পত্তন করেন। এরপর এই ধরনের কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়। ১৮২১ সালে পুনার হিন্দুকলেজ ও ১৮২৩ সালে আগ্রা কলেজের পত্তন হয়। এর অব্যবহিত পরই ১৮২৬ সালে গভর্নর জেনারেলের আদেশক্রমে কলকাতার আলিয়া মাদরাসা এবং হিন্দু কলেজেও ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

মি. গ্রান্টের স্বপ্ন সফল

এই দেশের ধর্মীয় স্বরূপের বিকৃতি করে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য মি. গ্রান্ট যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা কতটুকু বাস্তবে রূপলাভ করেছে তা ১৮৩১ সালে প্রকাশিত শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট থেকেই প্রতীয়মান হয়। রিপোর্টে বলা হয় :

'হিন্দু কলেজের (রাজা রামমোহন রায়ের কলেজকে হিন্দু কলেজও বলা হতো) সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের প্রতি এই কমিটির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এর ফলে যা দাঁড়িয়েছে তা সম্পূর্ণ আশাতীত। ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার পাশাপাশি নৈতিক

উন্নতিও যথেষ্ট সাধিত হয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছাত্ররা এবং যথার্থ যোগ্য হিন্দু ছাত্ররা নিজেদের তথাকথিত ধর্মের আবেষ্টনী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তারা প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্মের অসারতা সম্পর্কে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করে না। সম্ভবত পরবর্তী বংশধরদের মাঝে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের আরও উৎকর্ষ ও পরিবর্তন সাধিত হবে।[১০৯]

এখানেও ইচ্ছাকৃত মুসলিমদের কোনো কথা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। আসলে তাদের অভিযান উভয় জাতির বিরুদ্ধেই ছিল। কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের মতবাদ এবং ধর্মবিশ্বাসে তেমন অটল ছিল না বলে ইংরেজদের মিশন তাদের মাঝে বেশি কার্যকরী হয় এবং প্রকাশ্যে বলার মতো হিন্দুদের সম্পর্কেই তাদের কিছু বক্তব্য ছিল। পক্ষান্তরে, মুসলিমরা তাদের মতবাদ ও ধর্মবিশ্বাসের বেলায় সম্পূর্ণ আপসহীন ছিল। এইজন্য মুসলিমদের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত হুঁশিয়ার ছিল ও সন্তর্পণে অগ্রসর হয়েছিল। মি. গ্রান্টের এই মিশন তথা ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের কী অভিসন্ধি ছিল স্যার চার্লস ট্রেভল্যান নামক জনৈক ইংরেজ অফিসারের প্রদত্ত বিবরণে তা আরও সুস্পষ্ট হয়। ১৮৫৩ সালে পার্লামেন্টের সাব কমিটিতে প্রদত্ত এই বিবরণীর অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

'দেশের বর্তমান প্রচলন ও রেওয়াজ অনুযায়ী মুসলিমরা আমাদের অভিশপ্ত কাফের ও বিধর্মীদের দলভুক্ত মনে করে, যারা বলপূর্বক একটি সমৃদ্ধিশালী ইসলামি সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং প্রচলিত ধর্মীয় বৈষম্য অনুযায়ী হিন্দুরাও আমাদের ম্লেচ্ছ বলে আখ্যায়িত করে। অর্থাৎ এদের সাথে কোনোরকম সম্পর্ক রাখা সমীচীন নয়। এই উভয় জাতি মনে করে, আমরা বলপূর্বক তাদের সাম্রাজ্য কেড়ে নিয়েছি। তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আমরা হরণ করেছি। এমতাবস্থায় এদের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের অর্থ দাঁড়াবে তাদের মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেওয়া। যেসব নবীন যুবক আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করবে, পূর্বেকার ধারা অনুযায়ী তারা প্রচলিত নিয়মে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার কথা ভুলে যাবে। অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে হলেও তারা তখন দেশের সকল পর্যায়কে পাশ্চাত্য রঙে রঙিন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

এই শিক্ষার প্রসার হলে ক্রমান্বয়ে তারা আমাদের জবরদস্তি শাসক হিসেবে মনে করবে না। বরং তারা আমাদের বন্ধু হিসেবে জ্ঞান করবে এবং আমাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জ্ঞান করবে। মনে করবে এদের হেফাজতে থেকে আগামী দিনে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাতে পারব। এই ভূখণ্ডের পুরোনো ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি সম্ভবত এমনও হতে

---

[১০৯]. History of English education by Syed Mohammad, p. 35.

পারে যে, আমরা একদিনেই এই উপমহাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হব। যারা আকস্মিকভাবে বিপ্লব ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখে তারা অতি গোপনে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু নতুন ও উন্নত পদ্ধতিতে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে খুবই মন্থর গতিতে এই অভিযানে অগ্রসর হতে হবে এবং স্বভাবতই তাতে যুগযুগান্তর লেগে যাবে।

এদের সমন্বয়ে বর্তমানে একটি ছোট দলের সৃষ্টি হয়েছে। তারা আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এরা দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সাহায্যপ্রার্থনা করবে। এজন্য আগামী দিনে তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। ক্রমশ তাদের দল যাতে ভারী হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন কখন হবে? কেউ বলতে পারে না। আর আমরাও এ কথা বলতে পারি না, সরকারের সমস্ত দায়িত্ব স্থানীয় লোকদের হাতে সোপর্দ করে আরও কতকাল এই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে আমরা যদি সঠিক পথ অনুসরণ করি সম্ভবত এই দেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক তেমন উন্নত থাকবে, যেমন কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। সাময়িকভাবে যদি আমরা এ কথা মেনে নিই যে, এই দেশের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির রূপটা এ দেশের পুরোনো নিয়মেই হবে, তাহলেও তা হবে সম্পূর্ণ আকস্মিক ও ভয়ানক দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির মাধ্যমে এবং এই সম্পর্কচ্যুতি অসহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। আমরা তখন এমন একটি দেশ পরিত্যাগ করে যাব যে দেশের মানসিকতা খুবই নীচ এবং আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে তারা সবচেয়ে চরম শত্রু প্রতিপন্ন হবে। পক্ষান্তরে আমরা যদি সম্পর্ক উন্নয়নের পন্থা অন্যভাবে গ্রহণ করি তাহলে আমরা একটি সুসভ্য দেশকে ত্যাগ করে যাব এবং আমাদের প্রতি তারা কৃতজ্ঞ থাকবে।'[১১০]

অনুরূপ ১৮৩৫ সালের ২৮ জুন স্যার চার্লস ট্রিভলেন দ্বিতীয়বারের মতো এই মর্মে বিশেষ কমিটির নিকট আরও একটি বিবরণ পেশ করেন। নিম্নে উক্ত রিপোর্টের চমকপ্রদ অংশ তুলে ধরা হলো :

'যদিও ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সরকারি কলেজসমূহের পাঠ্যতালিকায় বাইবেলের অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের প্রচারের প্রশ্নে এ ক্ষেত্রে একটি অহেতুক বাধার সূত্রপাত করা হয়েছে বলে আমরা এর প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমার মতে এই অভিযোগ অমূলক এবং সম্পূর্ণ অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। কেননা, বিভিন্ন কলেজের জন্য ইংরেজি বইয়ের লাইব্রেরির পত্তন করা হয়, প্রত্যেক লাইব্রেরিতে বাইবেলের কপিও রাখা হয়। এখন তো আমি এ খবরও শুনছি, লোকেরা বাইবেলের ব্যাখ্যাপুস্তকও অনুসন্ধান করছে। এখন

১১০. History of Muslim education by Syed Mahmud, p. 65.

লাইব্রেরিতে এর ব্যাখ্যাপুস্তকও রাখতে হবে। সেইসঙ্গে অন্যান্য ধর্মের ভালো গ্রন্থাবলিও রাখা উচিত হবে।

আমি যেমন পূর্বে বলেছি, বাইবেল যদিও পাঠ্য হিসেবে পড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু সরকারি কলেজসমূহে ইংরেজি সাহিত্য তো পড়ানো হয়। যথা মিল্টন, বেকন, এডিসন ও জনসন প্রমুখের কাব্য ইত্যাদি। এদের সকল পুস্তকেই বাইবেলের শিক্ষার সমাহার রয়েছে এবং এসব ছাত্রকে বোঝাতে হলে বারবার বাইবেলের উদ্ধৃতি এবং বাইবেলের শিক্ষা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হবে। এইভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে সাহিত্য পর্যায়ে বাইবেলের চর্চা বাড়াতে হবে। ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখে বোঝা যাবে খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে তাদের জানাশোনা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচিত ছাত্রদের দেশের সত্যিকার ইতিহাস, সত্যিকার দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। যারা সরকারি শিক্ষার বিরোধিতা করে তারা কি বলতে পারেন যে, সত্যিকার ইতিহাস, আসল দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা ধর্মের জন্য ক্ষতিকর? যারা ক্ষতিকর মনে করেন তারা খুবই ভুল করছেন।'[১১১]

এবার দেখুন, মুসলিমদের জন্য কতখানি বিপজ্জনক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই চক্রান্ত থেকে কোনো মুসলিমের অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ থাকে না।

চার্লস ট্রিভলেন পুনরায় বলেন : 'আমার মতে যেসব স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত রয়েছে, সেগুলোতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য করা উচিত। আমার উদ্দেশ্য এমন নয় যে, এমন দিন কোনো সময়ই আসবে না যখন সরকারি কলেজসমূহেও খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা চালু করা যাবে। আমার মতে এমন উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যার ফলে এদিকে লোকেরা সহজে আকৃষ্ট হয়। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, খ্রিষ্টধর্মভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া কোনো শিক্ষাই পরিপক্ব ও সুসম্পন্ন নয়। ভারতের একটি অংশ যখন শিক্ষিত হবে তখন আমাদের উচিত হবে খ্রিষ্টধর্মীয় শিক্ষা চালু করা। কিন্তু আমাদের এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে সেনাবাহিনীতে কোনোরকম অসন্তোষ সৃষ্টি না হয়। কলকাতা থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে আমি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী এ দেশীয় উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলাম। এইসব ব্যক্তি হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করত। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের মূলে এদের প্রচুর সাধনা ও সহযোগিতা ছিল। এদের কীভাবে খ্রিষ্টান করতে হবে, লোকেরা তার ফন্দি জানে না। আমার তো বিশ্বাস, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন সকলে গোত্রবন্দি হয়ে খ্রিষ্টান হয়েছেন, এখানকার লোকেরাও দলে দলে

---

১১১. History of English education by Syed Mahmud, p. 67.

খ্রিষ্টান হয়ে যাবে। এই দেশে পরোক্ষভাবে পাদরিদের দ্বারা এবং প্রত্যক্ষভাবে বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা ও ইংরেজদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মেলামেশার দ্বারা খ্রিষ্টধর্ম প্রবর্তিত হতে পারে।'[১১২]

এই বিশিষ্ট ইংরেজ নাগরিক দেশের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য এবং গভর্নরও ছিলেন। তার উপর্যুক্ত মতামতে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার জিগির সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্যদিকে এই ব্যক্তি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কতখানি আশাবাদী, তার বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, স্কুলকলেজের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কী। তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আসল উদ্দেশ্য হলো স্কুলকলেজে হিন্দুধর্ম বা ইসলামধর্মের কোনো শিক্ষা দেওয়া চলবে না বরং সে স্থলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খ্রিষ্টধর্মের অনুশীলন চলবে। এই প্রয়াস ধর্মনিরপেক্ষ নয় তাও বলা যায় না। কেননা এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষানীতিতে ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারটি ঊহ্য রাখা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। দ্বিতীয়ত পুরোনো রীতির শিক্ষায়তনগুলোর দ্বার বন্ধ করে দেবে এবং তারা এই শিক্ষানীতির দোষত্রুটি খোঁজা শুরু করবে। ফলে জনসাধারণ এই শিক্ষার বিরোধিতা শুরু করবে। কেননা জনসাধারণ যখন দেখবে এই শিক্ষায় কোনো বাস্তব লাভ নেই তখন স্বাভাবিকভাবে এর প্রতি তারা অনীহা প্রদর্শন করবে। এরপরও যেসব ধর্মে উৎসর্গপ্রাণ ব্যক্তিরা এর পক্ষে সংগ্রাম করবে তাদের নিরস্ত্র করার জন্য এই শিক্ষার দোষত্রুটি প্রমাণ করার জন্য তাদের নিজস্ব (স্থানীয়) ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে। এরপর যুবক শিক্ষানবীশরা নিজেদের ধর্মের প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ হবে এবং জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে খ্রিষ্টধর্মের জালে আটকা পড়ে যাবে।

তাদের এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সাফল্য সম্পূর্ণ সন্তোষজনক এবং তা চতুর্দিকে ডালপালা বিস্তার করছে, তাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, পুরোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক সংস্কার। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আলিয়া মাদরাসার ওপর পড়ে।

মাদরাসা সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য

আলিয়া মাদরাসা সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই প্রাচীনতম ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করে এতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করা। আলিয়া মাদরাসার অস্তিত্ব সরকারের কোনো উপকারে আসে না। এইজন্য এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করা সরকারের অনাগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতএব এই প্রতিষ্ঠানে পঠিত মুসলিমদের প্রয়োজনীয় বিশেষ বিষয়গুলোর প্রাধান্য কমিয়ে দেওয়া হলে এই প্রতিষ্ঠান বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়বে। বিখ্যাত

[১১২]. History of English education in India, Syed Mahmud, p. 69.

ঐতিহাসিক ড. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার এই সম্পর্কে সরকারকে যে পরামর্শ প্রদান করেছিলেন তার উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

'...কিন্তু এও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যদি মাদরাসার শিক্ষা বিষয় হতে ফেকাহশাস্ত্র সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়। এমন করলে প্রজন্মের নিকট এই কলেজের (মাদরাসা) কোনো গুরুত্ব থাকবে না। অতঃপর এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, এই ইসলামি বিষয়টি শিক্ষা দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য হলো 'কাজি' উৎপাদন করা। অতএব তা তুলে দিলে এই শিক্ষারই আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না আর ছাত্ররাও এর দ্বারা লাভবান হবে না। এর উপযুক্ত শিক্ষা আলাদা আলাদা বক্তৃতার মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন হিন্দু আইন শিক্ষা দেওয়া হয়, কার্যত প্রতিনিয়ত ফেকাহর পাঠ্য না রেখে সে স্থলে আরবি, ফারসি ও বিভিন্ন সাহিত্য পড়ানো যেতে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত পড়াশোনাও উর্দু ভাষার মাধ্যমে চালু করা যেতে পারে।

এভাবে মুসলিমরা এমন একটি উন্নত নবীন জাতিতে পরিণত হবে যে, তখন সীমিত পরিমণ্ডলে তাদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে না। তখন তারা শুধু তাদের শিক্ষার নীতিমালাই পাঠ করবে না বরং এর মধ্যে নিহিত গভীরতর সত্যকে পাশ্চাত্য আলোকে পরখ করবে। এইসঙ্গে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষাও লাভ করবে যা দ্বারা নিজেদের মধ্যে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। ইংরেজি শিক্ষার প্রবণতা তাদেরকে লাভজনক পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে।'[১১৩]

ইংরেজি শিক্ষা এবং আলেমদের বিরোধিতা

যারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে আলেম সম্প্রদায় ছিলেন সর্বাগ্রে এবং এজন্যই আজ ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী হিসেবে একমাত্র তাদেরই চিহ্নিত করা হয়। অথচ এর সত্যিকার তাৎপর্য কেউ বিচার করে দেখে না। পূর্বে বর্ণিত রিপোর্ট এবং মতামত ইত্যাদি থেকে এ কথা তো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাচ্য মানসিকতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার জটাজালে আবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলধন বিনষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা রয়েছে তা রোধ করার জন্য আলেমসমাজ এগিয়ে আসবেনই। কালে কালে তারা ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য এ ধারায় চেষ্টা করেছেন এবং চিরকাল চেষ্টা করে যাবেন। কেউ সে কথায় কর্ণপাত করুক বা না করুক।

---

১১৩. Our Indian Musalman, Hunter, p. 204.

হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাগত জানায়

হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষাকে অমৃত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারা প্রথমেই সরকারি অফিস-আদালতে ঢুকে পড়েছিল। কেননা ইংরেজরা হিন্দুদের আনুগত্যের ওপর পুরাপুরি আস্থাশীল ছিল। মুসলিমদের তারা আহত সিংহ মনে করত এবং কোনোক্রমেই তাদের বিশ্বাস করতে পারত না। এজন্য প্রথম থেকে যেখানে হিন্দুদের দ্বারা কাজ চলে, পারতপক্ষে সেখানে মুসলিমদের নিয়োগ দিত না। কিন্তু বিরাট দায়িত্ব বা সাহসিকতার কাজে হিন্দুদের পাওয়া যেত না, সেখানে মুসলিমদের ডাক পড়ত। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিমদের অনীহা ও বিরোধিতা হিন্দুদের বৈষয়িক অগ্রসরের পথ আরও সুগম করেছিল। ফলে সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দুরা মুসলিমদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে গেল। সরকারেরও এই ইচ্ছা ছিল, যেভাবে হোক হিন্দুরা যেন মুসলিমদের এই ব্যাপারে অতিক্রম করে যায়।

ইংরেজি শিক্ষার আরও সম্প্রসারণ

ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন এবং সম্প্রসারণের জন্য ১৮২৯ সালে শিক্ষা কাউন্সিল গভর্নর জেনারেলকে জানান, যতদিন ইংরেজিকে দফতরের ভাষা না করা হবে, লোকেরা এর প্রতি তত আকৃষ্ট হবে না। এর উত্তরে বঙ্গ দেশের সরকারের ফারসি বিভাগের সেক্রেটারি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইশতেহার (২৬ জুন ১৮২৯ সাল) প্রকাশ করেন। নিম্নে তার অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো :

'বর্তমানে একটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইংরেজি শিক্ষার্থীদের আরও প্রেরণা ও উদ্দীপনা জোগানোর জন্য কী করা উচিত? এজন্য পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক ও অন্যান্য বন্দোবস্ত কীভাবে সম্পন্ন করা যায়! আপনাদের কমিটি এ কথা জানিয়েছে, যতদিন ইংরেজিকে সরকারি অফিস-আদালতের ভাষার মর্যাদায় উন্নীত না করা হবে ততদিনে জনগণের মনে এর প্রতি যথার্থ আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। আপনাদের এই রিপোর্টের সঙ্গে প্রদত্ত (চলতি মাসের ৩ তারিখে) মি. ম্যাকেঞ্জির নোটে বলা হয়েছে, এখন আর বিলম্ব না করে ঘোষণা করা উচিত, এখন থেকে সরকারি অফিসের কাজকর্ম ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে এ কথাই প্রতিপন্ন হবে যে, আমরা আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মর্যাদা দিই না। এ ব্যাপারে আরও উল্লেখ করেছেন, আগামী তিন বৎসর পর সরকারি দফতরগুলোতে ইংরেজিতে কাজকর্ম শুরু হবে, এ কথা যেন ঘোষণায় বলা হয়। দিল্লির শিক্ষা কাউন্সিলও এ কথার ওপর জোর দিয়েছেন, আমরা অচিরেই এই ঘোষণা করব। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে আপনাদের এমন প্রস্তাব এবং পরামর্শে গভর্নর জেনারেল খুব অনুপ্রাণিত হয়েছেন, আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার যথার্থ বিকাশের জন্য আপনাদের এই প্রস্তাবনা এবং ব্যাখ্যা তিনি যথেষ্ট সংবেদনশীল মন নিয়ে গ্রহণ করেছেন এবং এ

ব্যাপারে আপনাদের কমিটির ওপর সমুদয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হচ্ছে। আপনারা অচিরেই স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জানিয়ে দেবেন, ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান অভিপ্রায় ও নীতি হলো দেশের সকল সরকারি অফিস-আদালতে তাদের ভাষা চালু করবেন এবং ক্রমশ এই ভাষা যাতে সর্বজনীন ভাষায় রূপান্তরিত হয় সে ব্যাপারে সদা সচেষ্ট থাকবেন। তবে কতদিনে এই ভাষা যথার্থভাবে অফিস-আদালতে চালু করা হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ বলতে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল প্রস্তুত নন।[১১৪]

পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে মতবিরোধ

এই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে এই শিক্ষার হিতাকাঙ্ক্ষীদের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এত সবার কাছে স্বীকৃত যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ করা অপরিহার্য কর্তব্য, কিন্তু এই শিক্ষার মাধ্যম কী হবে (Medium of Instruction) তা নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ ছিল না। একদল মত প্রকাশ করলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম শুধু ইংরেজি থাকবে। অন্যদল এর বিরোধিতা করে বললেন, এই দেশীয় লোকদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করলেই তারা সম্যক আয়ত্ত করতে পারবেন। উভয় দল নিজেদের মতামতের পক্ষে নানাবিধ যুক্তিপ্রমাণ পেশ করেন, উভয় দল নিজেদের যুক্তির মাধ্যমে সরকারকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। এ সময় বোর্ড অব ডিরেকটরসের পক্ষ হতে গভর্নর জেনারেলের নামে ১৮৩০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরে একখানা চিঠি প্রেরিত হয়। তাতে বলা হয়, ইংরেজি শিক্ষার প্রসারই ব্রিটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ব্যাপারে যেন তেমন তাড়াহুড়া না করা হয়, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করা হয়। অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে হবে, যাতে আগামী দিনে যখন অফিস-আদালতে ফারসির স্থলে ইংরেজি প্রবর্তন করা হবে, তখন ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের কোনো অভাব যেন না হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হবে। প্রাচ্য (ভারতীয়) শিক্ষাকেও সমুচিত স্থান প্রদান করতে হবে। এই সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য হলো, বিচার বিভাগীয় সমস্ত কার্যক্রম এখনো দেশি ভাষার মাধ্যমেই চালু থাকবে।

এই নির্দেশের ফলে ইংরেজি গ্রন্থাবলি উর্দু, বাংলা ও ফারসিতে অনূদিত হতে থাকল। অনুবাদক ও এ দেশীয় শিক্ষাবিদ লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু যারা স্থানীয় ভাষার এমন মর্যাদা সহ্য করল না এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রশ্নে ইংরেজির বাস্তবায়নকেই একমাত্র মোক্ষলাভের পথ বলে মনে করত, তাদের উদ্দেশ্য আর সফলকাম হলো না। এমনিতেই শিক্ষা কাউন্সিলেও

---

১১৪. History of English Education by Syed Mahmud, p. 78.

এই উভয় মতাবলম্বী লোক ছিল এবং উভয় পক্ষের সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। এজন্য উভয়ের বাদানুবাদ প্রায় অমীমাংসিত থেকে যায়। এই সম্পর্কে চার্লস ট্রিভলেন বলেন :

'এই সময় শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শিক্ষা কাউন্সিলের কাছে এ সম্পর্কে প্রচুর চিঠিপত্র আসতে থাকল। ইংরেজি পুস্তকাদির চাহিদা অনেক বেড়ে গেল, পক্ষান্তরে আরবি ও সংস্কৃত পুস্তকের ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। শেষে আরবি ও সংস্কৃত পুস্তকের মুদ্রণখরচও উসুল করা দায় হয়ে পড়ল। এই লোকসান রোধ করার জন্য সরকার আরবি ও সংস্কৃত পুস্তক ছাপানো বন্ধ করে দিলো। শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা উভয় পক্ষেই সমান ছিল। ফলে কিছুদিন শিক্ষা কাউন্সিলকে নিষ্কর্মা বসে থাকতে হলো এবং কোম্পানির কাজও প্রায় তিন বৎসর যাবৎ স্থগিত ছিল। এখন এই উভয় দলের মতামত সরকারকে অবহিত না করে কোনো গত্যন্তর রইল না। এরপর সরকার নিজেই এই ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। অন্যথায় শিক্ষা কমিটির এই বন্ধ্যত্ব একটি সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় এমন একজনের হাতে শাসনদণ্ড ছিল, যিনি একান্তই নিরপেক্ষ প্রকৃতির এবং দ্বিতীয় সৌভাগ্য হলো, ভারতে এমন একজন তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন যিনি ইউরোপে ইংরেজি সাহিত্যকে উন্নতির উচ্চ শিখরে তুলে ধরেছেন। তিনি এমন সন্ধিক্ষণে এশিয়া ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন যখন ইংরেজি সাহিত্যের তুলাদণ্ড টলটলায়মান।[১১৫]

লর্ড ম্যাকালের সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত ব্যক্তিদ্বয় যথাক্রমে লর্ড বেন্টিংক ও লর্ড ম্যাকালে। লর্ড ম্যাকালে ১৮৩৪ সালে ভারতে সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে আগমন করেন। তারপর বড় লাট তাকে শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি পদে নিয়োগ দান করেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে উভয় দলের যুক্তি ও প্রমাণাদি শিক্ষা কাউন্সিলে পেশ করা হলে কাউন্সিলের রায় প্রদানের জন্য সর্বময় ক্ষমতা লর্ড ম্যাকালের ওপর অর্পণ করেন। উভয় পক্ষের ভোট সমান সমান ছিল। এমতাবস্থায় লর্ড ম্যাকালে ইংরেজির স্বপক্ষে ভোট প্রদান করেন এবং ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই মহাদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে মর্যাদা প্রদান করা হয়।[১১৬]

---

১১৫. History of English Education by Syed Mahmud, p. 9-13.

১১৬. History of English Education by Syed Mahmud, p. 50.

লর্ড ম্যাকালের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মেজর বাসু

মেজর বাসু বলেন, লর্ড ম্যাকালে ১৮৩৪ সালে এ দেশে আসেন। তিনি পাক ভারতের রীতিনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, এই দেশের জনজীবন ও জীবিকার ধারা সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা ছিল না। অথচ লর্ড বেন্টিংক তার হাতেই শিক্ষা মাধ্যমের প্রশ্নটি নিষ্পত্তির দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন।

লর্ড ম্যাকালে পাক-ভারত সম্পর্কে তার স্মৃতিকথায় যা উল্লেখ করেছিলেন তা খুবই নিন্দাজনক এবং উল্লেখের অযোগ্য। এই স্মৃতিকথা ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি এই দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেন :

'আমরা এমনসব পুস্তক ছাপিয়ে থাকি (অর্থাৎ বোর্ড কর্তৃপক্ষ), এর মূল্য যেমন কম তেমনই কাজও অত্যন্ত বাজে আর আমরা কৃত্রিম ও মিথ্যা অনুপ্রেরণা, মিথ্যা ইতিহাস, অবান্তর বিজ্ঞান, অকেজো দর্শন এবং ভ্রষ্ট মতবাদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছি।'[১১৭]

লর্ড ম্যাকালের এই মন্তব্য এবং শিক্ষা সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তে লর্ড বেন্টিংক খুব প্রীত হন এবং ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে নিম্নোক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয় :

'গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল শিক্ষা কমিটির উভয় চিঠি (২১ ও ২২ জানুয়ারি) বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়েন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রও পর্যালোচনা করেন। তারপর এই মর্মে নিম্নোক্ত ধারাবলি গৃহীত হয় :

১. গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের মতে ব্রিটিশ সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় লোকদের পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। এইজন্য শিক্ষাখাতের সব অর্থ ইংরেজি শিক্ষার জন্য খরচ করা শ্রেয়।

২. কিন্তু গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল এও চান না, স্থানীয় লোকদের আদি শিক্ষার স্কুলকলেজ বন্ধ করে দিতে হবে। কমিটির অধীনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এবং শিক্ষকরা যে হারে বেতন ও ভাতা পেত তা যথানিয়মে চালু থাকবে। তবে সরকার ছাত্রদের নিয়মিত ভাতার ব্যাপারে কঠোর বিরোধিতা পোষণ করেন। আগামী দিনে যেসব ছাত্র নতুন ভর্তি হবে তাদের জন্য কোনোরকম বেতন বা ভাতা দেওয়া হবে না। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো অধ্যাপকের পদ খালি হলে কমিটি যেন অনতিবিলম্বে তা সরকারকে অবহিত করে। এইসঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্লাসের বিস্তারিত বিবরণ এবং ছাত্রসংখ্যা সম্পর্কেও সরকারকে রিপোর্ট দেবে যাতে উপযুক্ত লোক স্থলাভিষিক্ত করা যায়।

---

[১১৭]. Education in India under E. 1. Company, Basu, p. 80.

৩. গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল জানতে পেরেছেন, এই দেশীয় শিক্ষাদির পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে কমিটি অজস্র টাকার অপচয় করছেন।

সাবধান করা হচ্ছে, আগামী দিনে এই খাতে কোনো টাকা আর ব্যয় করা যাবে না।

৪. কমিটিকে আরও উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, শিক্ষা সম্পর্কিত এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর উদ্বৃত্ত সব টাকা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পঠিতব্য পাশ্চাত্য শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হবে। কমিটিকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, তারা যেন এই নির্দেশ যথাশীঘ্র কার্যকরী করার জন্য অচিরে একটি পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করেন।'

এই ঘোষণায় হিন্দুরা যারপরনাই খুশি হলো। কিন্তু মুসলিমরা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং কঠোর প্রতিবাদ জানায়। এই ঘোষণায় মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি মি. এইচ. এইচ. উইলসন ১৮৫৩ সালের ৫ জুলাই একটি রোয়েদাদ পেশ করেন :

'সরকার যখন ছাত্রদের বৃত্তি বা ভাতা বরাদ্দ করে, শিক্ষা খাতের সব টাকা ইংরেজি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করলেন, কলকাতার মুসলিম ৮০০ দস্তখতসংবলিত সরকারের কাছে একটি আবেদন পেশ করে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, একই শিক্ষার জন্য সমুদয় টাকা বরাদ্দ করার অর্থ এই দেশের লোকদের খ্রিষ্টান বানানোর এক অশুভ পাঁয়তারা ছাড়া কিছু নয়। সর্বস্তরে ইংরেজি চালু করার অর্থ মূলত খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচারমাত্র। এই প্রতিবাদকারীদের মধ্যে মুসলিমদের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট আলেম সম্প্রদায় ছিলেন।'

মি. উইলসন প্রসঙ্গান্তরে বলেন : 'আমি মি. ম্যাকালের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশংসা করি। কিন্তু তিনি এই দেশের মাটিতে সম্পূর্ণ নবাগত। এই দেশের মানুষ এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। তিনি নিজের রায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিকটতম পারিপার্শ্বিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। যারা ইংরেজি শিক্ষার প্রসার কামনা করেন তাদের জন্য এই পদক্ষেপ মস্তবড় ভুল। জনসাধারণ কী চায়, এই সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। শহরের লোকদের মানসিকতা এবং জীবনযাত্রার ওপর নির্ভর করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ শহরের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি চালু আছে। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ নিন, মনে করুন হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র পাশ করার পর সদর আমিন নিযুক্ত হয়ে মফস্বলে চলে গেলেন। সেখানে তার সঙ্গে কোনো লোক ইংরেজিতে কথা বলবে না। তা ছাড়া তিনি যেসব কাজকর্ম সম্পাদন করবেন সেখানে ইংরেজির কোনো ব্যবহার হবে না। সেখানে বরং নিজের ভাষাটা ভালো করে জানার প্রয়োজন হবে এবং সেইসাথে আইনকানুন, কাজকর্ম এবং লোকদের রীতি-রেওয়াজটুকুও ভালোভাবে রপ্ত থাকতে হবে।

হিন্দু কলেজে তিনি যে চরিত্রের শিক্ষা পেয়েছেন তার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের চরিত্রের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব দেশের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ইংরেজির ব্যবহার এবং কার্যকারিতা তো নগণ্য। ইংরেজির ব্যবহার শুধু বড় বড় শহরে, আমাদের হেড কোয়ার্টারে এবং ইউরোপীয় সোসাইটিতে সীমিত।

ইংরেজি শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্পর্কে আমার কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু একটি ব্যাপারে, তা হলো, আমরা কেন শুধু একটি উদ্দেশ্যের মাঝে নিজেদের সীমিত রাখব না। এই দেশের ভাষার সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত তারাও চায় আমরা যেন শুধু একটি ভাষাকে আমাদের উদ্দেশ্য নিরূপণে নিয়োজিত না করি। লোকেরা উপকৃত হবে এই ধরনের সবরকম শিক্ষাই চালু রাখতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, যথার্থ উপকারী শিক্ষা ইউরোপ থেকে সরবরাহ হবে এবং ইউরোপের সাহিত্য ও দর্শন আয়ত্ত করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু যারা ইংরেজি জানে, এইজন্যই নির্ধারিত থাকে, তাহলে আমাদের এই উদ্দেশ্য ততই সীমিত পরিমণ্ডলে কার্যকরী হবে। সত্যি বলতে কী, আমরা আলাদা আলাদা এমনসব ইংরেজ জাতি সৃষ্টি করেছি, আসল ব্রিটিশদের প্রতি তাদের অনুরাগ খুবই গৌণ। পক্ষান্তরে আমরা যদি একে এভাবে সীমিত না করি তাহলে আমরা আরও বেশি লাভবান হতে পারি।'[১১৮]

১৮৩৭ সালের শিক্ষা অ্যাক্ট ও ফারসির চির বিদায়

মুসলিমদের উপর্যুপরি প্রতিবাদসত্ত্বেও সরকার শেষ পর্যন্ত ১৮৩৭ সালের শিক্ষানীতি সম্পর্কিত ২৯ নম্বর ধারা শীর্ষক একটি আইন জারি করে। এই আইন অনুযায়ী দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত থেকে চিরতরে ফারসি ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং স্থানীয় ভাষাকে ফারসির স্থলাভিষিক্ত করা হয়।[১১৯]

ফারসির বদলে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার সম্পর্কেও তুমুল প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়। এমনকি পূর্ব বাংলা থেকেও ফারসিকে অফিস-আদালত থেকে বিদায় না করার জন্য বহু প্রতিবাদলিপি সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা থেকে ৪৮১টি দস্তখতসংবলিত একখানি আবেদন প্রেরিত হয়। দস্তখতকারীদের মধ্যে ১৯৯ জন ছিলেন হিন্দু। এই আবেদনপত্র তদানীন্তন জজ

---

১১৮. History of Education, Basu, p. 19.

১১৯. ২৯ নম্বর ধারা : (৯) এতৎসংক্রান্ত আইন জারি করা হচ্ছে যে, ১৮৩৭ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে শিক্ষা কাউন্সিল এই অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এই মর্মে আদেশ জারি করতে পারবে যে, দেশের পূর্ণ অঞ্চল অথবা বিশেষ এলাকায় যেখানে ফারসি ভাষায় কাজকর্ম নির্বাহ করা হয় এমনসব আদালতে অথবা অর্থসংক্রান্ত বিভাগে অথবা তা ছাড়া সরকারি যেকোনো দফতরে কোনো ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার যোগ্য মনে করবেন স্বচ্ছন্দে তা কার্যকরী করতে পারবেন। উপরন্তু উক্ত তারিখ থেকে গভর্নর জেনারেল এই অধিকারও সংরক্ষণ করবেন, কোন নির্দেশের বলে উক্ত বিধিসংক্রান্ত অধিকার পুরাপুরি বা আংশিক তার অধীনে কোনো অফিসারকে বিনা শর্তে বা শর্তসাপেক্ষে সোপর্দ করা যাবে।

মি. জে. এফ. কোক বাংলা সরকারের সেক্রেটারির কাছে প্রেরণ করেন। পূর্ব বাংলা থেকে প্রেরিত এই আবেদনের তরজমা নিম্নরূপ :

'আমি ঢাকা জেলার ৪৮১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের দরখাস্ত আপনার খেদমতে পেশ করছি। আপনি তা বাংলার ডেপুটি গভর্নরের সমীপে পেশ করবেন। ফারসি ভাষাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দরখাস্তটি করা হয়েছে। এই দস্তখতকারীদের মধ্যে ১৯৯ জন হিন্দুও রয়েছেন। এই দরখাস্তের বিস্তারিত বিবরণ হলো, আমাদের এখানে বহুকাল যাবৎ ফারসি ভাষা প্রচলিত। নতুন হুকুম অনুযায়ী ফারসির বদলে এখন বাংলা ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু এই নির্দেশে সমূহ অসুবিধা এবং সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. এক জেলার প্রবাদের সঙ্গে অন্য জেলার প্রবাদের কোনো মিল নেই। এইজন্য একধরনের ভাষা সব জেলার লোকদের কাছে সমান বোধগম্য হবে না। অনুরূপভাবে বাংলা ভাষার বিভিন্ন বর্ণও জেলাভেদে বিভিন্ন রকমের। শুধু এ অসুবিধা নয় বরং কেউ কিছু লিখে পুনরায় তা স্বচ্ছন্দভাবে পাঠোদ্ধার করতেও পারে না। ফলে কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রিতা ও শৈথিল্য পরিলক্ষিত হবে।

২. যদি আদালতের মন্তব্য বা মতামত ইত্যাদি প্রত্যেক অঞ্চলের নির্দিষ্ট ভাষায় লেখা হয় তাহলে তা যেমন দীর্ঘ হবে এবং তা কেউ ঠিকমতো বুঝতেও পারবে না। বর্তমান নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারীরা এখন এমনভাবে লিপিবদ্ধ করছে যে, তাতে সংস্কৃতের সংমিশ্রণ খুব বেশি এবং বক্তা ও শ্রোতা পরস্পরে নিজেদের কথা বুঝতে পারে না যতক্ষণ না তা তরজমা করে বোঝানো হয়। অথচ সরকারের উদ্দেশ্য, উভয় পক্ষের বক্তব্য যেন উভয়ের বোধগম্য হয় সহজে।

৩. ফারসি ভাষার এক বাক্যে যে বক্তব্য পুরোপুরিভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়, তা বাংলায় দশ লাইনেও সম্পন্ন করা যাবে না। যদি কেউ সংক্ষিপ্তভাবে তা বলতে চেষ্টা করে তাতে অনেক কথাই অস্পষ্ট থেকে যাবে। অতএব ভাষা বদল করে লাভ কোথায়?

৪. আপনি যদি চান, বাংলা পড়ে সরাসরি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে তাহলে বাংলার প্রতি বর্ণসহ পড়তে হবে। যিনি লিখবেন তিনিও বলতে পারবেন না যে, যা লেখা হলো তার বক্তব্য কী দাঁড়াল। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় যে, অমুক কথাটি কোথায় লেখা হয়েছে, তাহলে তাকে এর আগাগোড়া পাঠ করতে হবে। এ কারণেই এখনো বাংলায় লিখিত রোয়েদাদের টীকা ফারসিতেই লেখা হয়।

৫. ইতিপূর্বে সরকার বাংলা ভাষায় কোনো সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করেনি। এখন কোনো বিশেষ শব্দের বিশেষ অর্থ বোঝার জন্য যদি অনেক কষ্টে

তা ব্যক্ত করা হয়, তারপরও মতদ্বৈততার অবকাশ থাকবে। পক্ষান্তরে, ফারসি সব প্রবাদ এবং শব্দ সম্পর্কে লোকেরা সুপরিজ্ঞাত। বহুল ব্যবহারে ফারসি লোকদের কাছে সহজবোধ্য। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কোনো বিশেষ শব্দ নিয়ে যদি বাদানুবাদ বা মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয় তখন এ সম্পর্কে এমন একজন জজই সমাধান দিতে পারবেন যিনি বাঙালিদের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন। তা ছাড়া বাংলায় এমনসব শব্দ এবং এর জটিল উচ্চারণ রয়েছে যা ভালো পণ্ডিতদেরও রপ্ত নেই। অতএব এইসব প্রকাশ্য কারণগুলোর দরুন সরকারের ঈপ্সিত লাভের বদলে লোকসানের আশঙ্কা বেশি রয়েছে।

৬. বাংলার লিখনরীতি এমন আজব ধরনের যে, তা সহজে পড়া যায় না। অথচ ফারসি খুব প্রাঞ্জলভাবে লেখাও যায় পড়াও যায়।

৭. একটি রোয়েদাদ ফারসিতে এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করা সম্ভব, কিন্তু তা বাংলায় একদিনেও সম্ভব নয়। তা ছাড়া বাংলা ভাষার ফারসি তরজমা অতি দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দে করা চলে কিন্তু ফারসির বাংলা তরজমা তার বিপরীত।

ফারসি ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে কতিপয় ব্যাখ্যা

১. এই ভাষা দেশের অধিকাংশ এলাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ফারসি বর্ণও বেশ পরিষ্কার। ফারসিতে যা-ই কিছু লেখা যায় সহজে তা বোধগম্য হয়।

২. মনের ভাব ফারসিতে যত সহজে এবং প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা যায় বাংলায় তা সম্ভব নয়। ফারসির লিখনপদ্ধতিও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

৩. সরকারের সমস্ত রেকর্ড ফারসিতে। বাংলার চেয়ে তা অনেক সংক্ষিপ্ত এবং এতে কাগজও অনেক কম খরচ হয়েছে। কিন্তু বাংলায় নানাবিধ অসুবিধা ছাড়াও অজস্র কাগজের অপচয় হবে।

৪. ডিগ্রি ও অন্যান্য রেকর্ড অবলীলাক্রমে ফারসিতেই লিপিবদ্ধ করা সম্ভব।

৫. সম্ভ্রান্ত লোকেরা অধিকন্তু ফারসি জানেন এবং জনসাধারণের মাঝেও ফারসির জনপ্রিয়তা অত্যধিক।

৬. সকল হিন্দু এবং মুসলিমের একান্ত ইচ্ছা, ফারসিকেই সরকারি ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখা হোক। সরকার এই ভাষাকে বর্জন করতে চান এই সংবাদ জনসাধারণের মাঝে অসন্তোষের সূত্রপাত করেছে।'[১২০]

লর্ড অকল্যান্ডের ঘোষণা

১৮৩৯ সালের ২৪ নভেম্বর লর্ড অকল্যান্ড শিক্ষা সম্পর্কিত একটি নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করেন। তিনি এই দেশের মৌলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বিশেষ মমত্ব প্রদর্শন করেন এবং অধ্যাপকদের পদচ্যুতিরোধ ও ছাত্রদের বৃত্তি পুনর্বহাল করেন। অর্থাৎ লর্ড বেন্টিংক প্রদত্ত ছাত্রদের বৃত্তি বন্ধ এবং শিক্ষক

১২০. মওলা বখস কমিটির রিপোর্ট হতে সংকলিত, পৃষ্ঠা ১৪৯।

ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে না। লর্ড অকল্যান্ডের এই সিদ্ধান্ত বোর্ড অব ডিরেকটরস ১৮৪১ সালের জানুয়ারিতে একটি ইশতেহারে প্রকাশ করেন। তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেশীয় কলেজ ও প্রাচ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে যে ধারায় ব্যয় বরাদ্দ চালু ছিল তা যথানিয়মে বলবৎ থাকবে।[১২১]

আলিয়া মাদরাসার শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য চাকরির দ্বার ইতিমধ্যে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু লর্ড অকল্যান্ডের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আলিয়া মাদরাসা কোনোমতে বেঁচে থাকার অধিকার পেল। আলিয়া মাদরাসার বৃত্তি ও বরাদ্দ যা ছিল সে বিষয়েও কোনো হস্তক্ষেপ করা হলো না।

তারপর স্বভাবতই আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল, শেষ পর্যন্ত মাদরাসায় ইংরেজি ক্লাস বন্ধ করে দিতে হলো।

মাদরাসার প্রিন্সিপাল নিয়োগ

১৮৪০ থেকে ১৮৫০ সাল অবধি মাদরাসা সম্পর্কে ১৮৪৩ সালে সরকারের ১২ জুলাই '৪২ তারিখের রেজুলেশন অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগের জেনারেল কমিটি ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা শিক্ষা কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করা হয়। মাদরাসার সাব কমিটিও ভেঙে দেওয়া হয়। এখন মাদরাসার সেক্রেটারি সরাসরি কাউন্সিলের অধীনে হয়ে গেলেন। মি. লমডনের পরিবর্তে কর্নেল রেলেকে সেক্রেটারি নিয়োগ করা হয়। রেলে কিছুকাল পর এই পদ ত্যাগ করেন। এই সময় সহকারী সেক্রেটারি হাফেজ আহমাদ কবির সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। ফলে এই দুইটি পদ বেশ কিছুকাল খালি ছিল। ১৮৫০ সালে শিক্ষা কাউন্সিল অন্যান্য কলেজের মতো আলিয়া মাদরাসায়ও একজন ইংরেজ প্রিন্সিপাল নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। তবে এই প্রিন্সিপাল ক্লাসে শিক্ষাদানের সঙ্গে জড়িত থাকবেন না। একই প্রিন্সিপালের অধীনে হুগলি মাদরাসাও পরিচালিত হবে। কাউন্সিল এই প্রস্তাবের সঙ্গে মাদরাসার খতিব এবং মুয়াজ্জিনের পদ বিলুপ্তিরও সুপারিশ করেন। তারা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রেক্ষিতে এই দুটি পদ অবান্তর এবং অন্যান্য কলেজে এই পদ নেই। কাউন্সিলের এইসব প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেন।

এশীয় ভাষা ও শিক্ষাবিষয়ক পণ্ডিত ড. এ স্প্রিঙ্গার এম. এ.-কে আলিয়া মাদরাসার প্রথম প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। ইতিপূর্বে মাদরাসার প্রধান অধ্যাপককেই প্রিন্সিপাল বলা হতো। কিন্তু এই নবনিযুক্ত ইংরেজ প্রিন্সিপালের ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধান অধ্যাপকের পদবি দেওয়া হলো 'হেড মওলবি'।

---

[১২১]. Educational proceedings, April 1861.

প্রিন্সিপালের সংস্কারপ্রয়াস ও মাদরাসায় গোলযোগ

ড. স্প্রিঙ্গার প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণের পর মাদরাসার কতগুলো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রদবদল ও সংস্কারের চেষ্টা করেন। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি এই সংস্কারের একটি স্কিমও তৈরি করেন এবং সর্বাগ্রে মাদরাসার শিক্ষা বিষয়ের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ছাত্ররা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। প্রিন্সিপালকে ইট-পাটকেল ও পচা ডিম নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে নিরাপত্তার জন্য তিনি নিজের বাসভবনে অন্তরিন থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে প্রিন্সিপাল গোলযোগ সৃষ্টিকারী কতিপয় ছাত্রের নাম খারিজ করে দেন। ফলে বহিষ্কৃত ছাত্ররা পুনরায় প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। তারপর মাদরাসার এই গোলযোগ সম্পর্কে সরকারের ওপরস্থ মহল উদ্‌বিগ্ন হয়। শিক্ষা কাউন্সিল মাদরাসার এই গোলযোগ ও আন্দোলন পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি এর তদন্ত করে মাদরাসার মঙ্গলের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

গোলযোগের কারণ

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে জানা গিয়েছে, নিম্নলিখিত সংস্কার স্কিমের বিরুদ্ধে ছাত্ররা অসন্তোষ জানায় এবং এতে গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

১. মায়বুজি ও সদরাকে শিক্ষাবহির্ভূত করার প্রয়াস।

২. পুরোনো হেকমতকে বিষয়বহির্ভূত করে নতুন হেকমতের প্রবর্তন।

৩. আরবির বদলে উর্দু ভাষায় হেকমত (বিজ্ঞান) শিক্ষার প্রবর্তন।

৪. আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য জনৈক অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে (মি. লওয়ার) নিয়োগ করার প্রস্তাব।

এই আন্দোলনের সময় শিক্ষকরা ছাত্রদের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু প্রিন্সিপালকে তারা কোনোরূপ সহযোগিতা করেননি। তদন্ত কমিটি ৪ আগস্ট ১৮৫৩ সালে মাদরাসা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টের ফলাফলের ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা কাউন্সিলের মতামতের অংশবিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হলো :[১২২]

'শিক্ষা কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ কিছুকাল থেকে মোহামেডান কলেজ বা মাদরাসার শিক্ষা বিষয় সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করছেন। এইসঙ্গে কাউন্সিল 'হিন্দু কলেজ' সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করছে। হিন্দু কলেজে হিন্দু ছাত্ররাই পড়াশোনা করে। অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্ররা এই কলেজে পড়াশোনা করতে পারে না।

[১২২]. ১৮৪০-৫৯ সালের এডুকেশন রেকর্ড থেকে গৃহীত, সূত্র : আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস।

কাউন্সিলের সদস্যরা মনে করেন, এই দেশের এই দুইটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করার এখন সময় এসেছে।'

আলিয়া মাদরাসার দুটি বিভাগ

এই সময় আলিয়া মাদরাসায় দুটি বিভাগ ছিল। একটি আরবি বিভাগ। এই বিভাগে আরবি বর্ণমালা থেকে শুরু করে উচ্চতর আরবি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। মাদরাসার গোড়াপত্তন থেকে এই বিভাগ চালু রয়েছে। অপর বিভাগটির নাম ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। ১৮২৯ সালে এই বিভাগের পত্তন হয়। এই বিভাগের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অন্যরকম। এই বিভাগের ছাত্ররা মামুলি ফি দিত। নিম্নশ্রেণির মুসলিম পরিবারের ছেলেরাই বেশিরভাগ এই বিভাগে পড়াশোনা করত। এই ইংরেজি বিভাগকে মূলত ইংরেজি শিক্ষার প্রাইমারি পর্যায় বলা যেতে পারে। এই বিভাগে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাও পড়ানো হতো। ঐচ্ছিকভাবে ইংরেজির সঙ্গে বাংলা পড়তে পারত। ১৮৪৯ সালে মাদরাসায় একটি 'অ্যাংলো অ্যারাবিক' ক্লাসের পত্তন হয়। এই ক্লাসের মাসিক ব্যয় ছিল সর্বমোট ১০০ টাকা। কিন্তু তারপরও মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষার উন্নতির কোনো সুলক্ষণ দেখা গেল না। ইতিমধ্যে ইংরেজি বিভাগের একজন শিক্ষক বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেল, কিন্তু সেই শূন্য পদে কাউকেও বহাল করা হলো না। এর প্রেক্ষিতে কাউন্সিল চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেন, মাদরাসায় এখন আর মামুলি সংস্কার চলবে না। এইবার মাদরাসার আমূল সংস্কার করতে হবে।

শিক্ষা কাউন্সিল রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হন যে, বাংলার মুসলিমদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চবংশীয় লোকেরা এখন ক্রমান্বয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এবং তারা নিজেদেরকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজি শিক্ষার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। অবশ্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে মুসলিমরা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে ছিল।

মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ

এক শ্রেণির লোকের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি টান থাকা সত্ত্বেও আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষার তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। আসলে মাদরাসার ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আন্তরিক টান যেমন ছিল না, তেমনই এই বিভাগের বন্দোবস্তও ছিল নিম্নমানের। দ্বিতীয়ত যেসব মুসলিম বিশেষভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের সেন্টপল স্কুল ও প্যারেন্টাল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করাতেন। এই দুটি স্কুল মিশনারিদের প্রভাবমুক্ত ছিল। এজন্য কমিটি মনস্থ করেন, আলিয়া মাদরাসার ইংরেজি বিভাগের মান এবং বন্দোবস্তের উৎকর্ষ সাধন করলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তখন ছাত্ররা সেন্টপল বা প্যারেন্টাল অ্যাকাডেমির বদলে মাদরাসায় ভর্তি হবে।

অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগের প্রস্তাব

কাউন্সিলের পর মাদরাসার এই উভয় বিভাগের বিলোপ সাধন করে অ্যাংলো-পার্সিয়ান নামক একটি নতুন বিভাগ প্রবর্তন করার চিন্তা করেন। এই বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রদের শিক্ষার মান এতখানি উন্নত হবে যাতে এখান থেকে জুনিয়র স্কলারশিপের ছাত্র তৈরি করা যায়। এই বিভাগে মুখ্যত ইংরেজির সঙ্গে ফারসিও পড়ানো হবে। এই দুই বিষয় ছাড়াও এই বিভাগে ছাত্রদের জন্য বাংলা ও উর্দু শিক্ষারও বন্দোবস্ত থাকবে। কেননা উর্দু এই উপমহাদেশের সাধারণ ভাষা আর বাংলা এই প্রদেশের নিজস্ব ভাষা। মোটকথা, এই বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা জুনিয়র স্কলারশিপের মর্যাদা পাবে এবং যাকে 'স্কুল অনার্স' বলা যেতে পারে। এই কোর্সে ছাত্ররা ১০-১১ বছর বয়সে ভর্তি হবে এবং পাঁচ-ছয় বছরে কোর্স সম্পন্ন করবে। এই কোর্স পাশ করার পর ছাত্ররা ফারসিতে প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জন করবে। এই কোর্স শেষ হওয়ার পর ছাত্ররা ঐচ্ছিকভাবে ইংরেজি অথবা আরবি বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করতে পারবে। যারা আরবি পড়বে, তারা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হতে পারবে। আর যারা এরপর ইংরেজি পড়তে চায় তারা মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হতে পারবে। এই কলেজে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র ভর্তি হতে পারবে। এখানে ভর্তি হতে না পারলে হিন্দু কলেজের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। হিন্দু কলেজে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে।

মেট্রোপলিটন কলেজের ইতিবৃত্ত

কলকাতার ওয়েলিংটন স্কয়ারের বিখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবার এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেশের বাসিন্দাদের প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের শিক্ষাগত মান বেশ উন্নত ছিল। এই কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী অত্যন্ত বিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি চমকপ্রদ কাহিনি আছে। হিন্দু কলেজ সরকারের অধীনে দেওয়ার পর একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, এই কলেজে অকুলীন বংশের কোনো হিন্দু ছাত্র যেন ভর্তি না হয়। কিন্তু এই শর্ত বেশিদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। হীরা নাম্নী জনৈকা বিত্তশালী বেশ্যাজীবী মহিলার পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। ফলে উচ্চবংশীয় হিন্দু-সমাজে এর তীব্র বিরোধিতার ঝড় ওঠে এবং ছাত্রটিকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য করা হয়। পতিতার পুত্রের এই কলেজে ভর্তি হওয়ায় হিন্দু-সমাজ বিশেষভাবে অপমান বোধ করেন। ফলে তারা ১৮৫৩ সালে মেট্রোপলিটন কলেজ নামে অপর একটি কলেজের পত্তন করেন। তদানীন্তন বিশিষ্ট ইংরেজি শিক্ষাবিদ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনকে এই কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। অধ্যাপকমণ্ডলীতে ক্যাপ্টেন হারিস, উইলিয়াম ক্রুক, পেট্রিক ও উইলিয়াম মাস্টারের মতো বিখ্যাত শিক্ষাবিদরা ছিলেন। দত্ত পরিবারের

পৃষ্ঠপোষকতা ও উচ্চবংশীয় হিন্দু-সমাজের অজস্র সাহায্যপুষ্ট এই কলেজের ঐশ্বর্য ছিল তুলনাহীন। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় এই কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্রাঞ্চ স্কুল

কাউন্সিলের স্কিম-মতে অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থানান্তরে অসচ্ছল লোকদের বস্তি এলাকায় একটি ব্রাঞ্চ স্কুল খোলার প্রস্তাব পেশ করা হয়। গরিব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও গরিব মুসলিম ছেলেরা এই ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ে 'জুনিয়র স্কলারশিপ'-এর মান অর্জন করবে, এ ছিল এ স্কুল পত্তনের আসল উদ্দেশ্য। হিন্দু কলেজের ব্রাঞ্চ স্কুলের মতো এই স্কুলেও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকবে।

আরবি বিভাগের সংস্কার

শিক্ষা কাউন্সিল আলিয়া মাদরাসার মৌলিক শিক্ষা ঠিক রেখে ছাত্রদের পর্যাপ্ত ইংরেজি শিক্ষাদানের চেষ্টা করতেন যাতে তারা মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। কাউন্সিলের সংস্কারাধীন পরিকল্পনা অনুযায়ী আলিয়া মাদরাসার আরবি শিক্ষায় যুগোপযোগী সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন সংস্কৃত কলেজের যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করেছেন তেমনই এই মাদরাসার মৌলিক আরবি শিক্ষারও সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে কাউন্সিল মন্তব্য করে।

কাউন্সিলের এই ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাচীন হেকমত ও ফালসাফা (দর্শন), আরবিরা যেকোনো ভাষায় হোক তা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কেননা এতকাল পরও ২ হাজার বছরের পুরোনো বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ বাঁচিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ২ হাজার বছরে দুনিয়া এই ক্ষেত্রে বহু এগিয়েছে। সরকারের একটি বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের প্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকবে তা খুবই লজ্জাজনক। এই হেকমত বা ফালসাফার বদলে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন বরং দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে অথবা পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করে শিক্ষা বিষয় হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন

১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই কোর্ট অব ডিরেকটরস ভারত সরকারের নামে একটি বিশেষ নির্দেশ জারি করে, যার ফলে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার বুনিয়াদ আরও সুদৃঢ় হয়। এই নির্দেশে বলা হয়, ভারতীয়দের শিক্ষার সমুদয় দায়িত্ব এবং অধিকার ক্ষমতাসীন সরকারের রয়েছে। এখন থেকে সরকারের সমুদয় প্রয়াস ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের কাজে ব্যয় হবে। ভারতের প্রতিটি পল্লি-গ্রাম পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে, এই সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই

ব্যাপকতর শিক্ষাপরিকল্পনায় জাতি-ধর্ম ও ছোট-বড়-নির্বিশেষে সকলের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে হবে। কোর্ট অব ডিরেকটরসের এই ফরমানের প্রেক্ষিতে ভারত সরকার ১৮৫৭ সালে ১১ নম্বর শিক্ষা অ্যাক্ট পাশ করে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের পর এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত্তিমূল আরও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল শ্রেণির লোকের জন্য এই শিক্ষা সহজলভ্য হয়।

মাদরাসার প্রতি লে. গভর্নরের কোপদৃষ্টি

১৮৫৭ সালে মি. উইলিয়াম নাসানলিজকে আলিয়া মাদরাসার দ্বিতীয় প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এর পরবর্তী বছরই বাংলার লে. গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক হালিডে মাদরাসার শিক্ষা ও তৎপরতার ওপর বিশেষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এর অন্যতম কারণ ছিল সিপাহি বিপ্লব। কারণ এই বিপ্লবে মাদরাসার ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছিল। মাদরাসার ছাত্ররা ধর্মযুদ্ধ, জিম্মি, দারুল হারব ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি পাঠ করে বিদেশি শাসকদের প্রতি বিষোদ্‌গার করত এবং জনসাধারণের মাঝেও তাদের মনোভাব প্রচার করত। মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা যেহেতু কোনো সরকারি চাকরিতে ছিল না, এজন্য সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। তারা দিব্যি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাত। মাদরাসার প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক মাওলানা আজিজ জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করতেন না। কেননা তিনি এই দেশকে দারুল হারব (বিজাতি শাসিত) মনে করতেন। এইসব কারণের প্রেক্ষিতে লে. গভর্নর মাদরাসা ধারার শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই শিক্ষা ক্ষমতাসীন সরকারের কোনো উপকার তো দূরের কথা বরং তা ক্ষতির কারণ বলে তিনি মনে করতেন।

অতএব এই মর্মে লে. গভর্নর ডিরেকটর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে (১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত) নিম্নোক্ত নির্দেশ জারি করেন :

'সরকারি খরচে ভবিষ্যতে মাদরাসা পরিচালিত হবে কি না এখন এই বিষয় চিন্তা করার সময় হয়েছে। বর্তমান সময়ে মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাও বিবেচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে ডিরেকটর স্বয়ং যেন চিন্তাভাবনা করেন এবং মাদরাসার প্রিন্সিপাল মি. লিজের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।'

লে. গভর্নরের নির্দেশক্রমে মাদরাসার প্রিন্সিপাল মি. লিজ নিম্নোক্ত রিপোর্ট পেশ করেন :

'ভারতীয় মুসলিমদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার দ্বিবিধ প্রকারে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। মুসলিমদের তাদের নিজস্ব নিয়মে বিচরণ করতে দিতে হবে এবং এভাবে অধঃপতন থেকে তাদের টেনে তুলতে হবে। এই ব্যাপারে আমি

বিস্তারিতভাবে জানাতে চাই যে, ব্রিটিশ সরকার যখন এ দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন মুসলিমরা সরকারের সঙ্গে শুধু একটি কারণে নিশ্চিন্ত ছিল, দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যখন ক্রমান্বয়ে দেশের সর্বময় ক্ষমতার ওপর জেঁকে বসলেন এবং মুসলিমদের সমস্ত অধিকার হরণ করলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সরকার ফৌজদারি আদালতগুলোতে পর্যন্ত মুসলিমদের পরিবর্তে ইংরেজ জজ নিয়োগ করেন। তারপর সরকার দেশময় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এই দেশের শিক্ষার মানদণ্ড হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেন। এ অবস্থায় মুসলিমদের মর্যাদা ও সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অথচ পূর্বে মুসলিমরাই সমস্ত সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই সময় হিন্দুরা সবরকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং ইংরেজি শিক্ষাকে তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা বিদ্বেষপ্রসূত এই শিক্ষাকে বর্জন করে। যার ফলে তারা সরকারি চাকরির সুযোগ হারায় এবং দিন দিন তারা পতনের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে। এখন সরকার যদি তাদের এই অবস্থায় ছেড়ে দেন তাহলে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে এবং তাদের সম্ভ্রান্ত লোকেরাও পেটের দায়ে অন্যের দ্বারস্থ হবে। তখন একটি জাতির এই পতনের জন্য সরকারকে লজ্জিত হতে হবে। এমতাবস্থায় একটি প্রগতিশীল ও জনকল্যাণকামী সরকারের উচিত তাদের হৃত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং সমাজে তাদের বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা। আলিয়া মাদরাসার মতো প্রতিষ্ঠানই এই উদ্দেশ্য যথার্থ পালন করতে পারবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই, বর্তমানে মাদরাসার উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। ১৮২৪ সালে শিক্ষা কাউন্সিল মাদরাসায় যে সংস্কার কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন তা করা সম্ভব হয়নি। কারণ মুসলিমরা এর বিরোধিতা করেছিল। এতৎসত্ত্বেও বর্তমানে মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া মোটেই সমীচীন হবে না। কেননা মুসলিমদের বিশ্বাস, এই প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা তাদের কল্যাণ হচ্ছে। তা ছাড়া মাদরাসাকে বিশেষভাবে আরবি শিক্ষার জন্যও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবে এর নাম পরিবর্তন করে 'আরবি কলেজ' রাখতে হবে। অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগও যেমন ছিল তেমনই থাকবে। কেননা এই বিভাগের সাফল্য বেশ উল্লেখযোগ্য। মুসলিমরা এই বিভাগটির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট। ১৮৫৩ সালের পূর্বে মাদরাসার বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩২ হাজার টাকা। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে তা বাড়িয়ে ৩৩ হাজার ২০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। মাদরাসার উভয় বিভাগের সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৩ জন। অতএব প্রতিটি ছাত্রপিছু সরকারের ব্যয় ছিল ১৮৫ টাকার মতো। এই ব্যয় যদিও বেশি মনে হয়, কিন্তু

বৃহৎ স্বার্থের খাতিরে তা খরচ করা হয়। যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহলে বুঝব, এই ব্যয় সঠিকভাবে করা হয়েছে।'[১২৩]

শিক্ষা কাউন্সিলের সংস্কার অভিযান মাদরাসায় কেন কার্যকরী হয়নি, মি. লিজ সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত কারণ দেখিয়েছেন :

১. সংস্কার ও সংশোধনী কার্যকরী করার ব্যাপারে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

২. হেড মওলবির অসহযোগিতা।

৩. শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির গোঁড়ামি। প্রথমত তারা আধুনিক নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যাপারে অযোগ্য, দ্বিতীয়ত তারা যে পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেছেন সেই পদ্ধতি তারা ছাড়তে চান না।

মাদরাসা বন্ধ করার প্রস্তাব

মি. লিজের রিপোর্টের সঙ্গে পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ডিরেকটর মি. ডব্লু গোর্ডন একমত ছিলেন না। বরং মি. লিজের রিপোর্টের জবাবে মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেন এবং তা লে. গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেন। লে. গভর্নর উক্ত নোট পেয়ে গভর্নর জেনারেলকে লেখেন : অচিরেই মাদরাসার আরবি বিভাগ বন্ধ করা হোক এবং অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ যথানিয়মে চালু থাক। আরবি শিক্ষার জন্য অ্যারাবিক প্রফেসরশিপ অথবা তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া হোক অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজে এর একটি বিভাগ খোলা হোক। আরবি শিক্ষার জন্য এতটুকু বন্দোবস্তই যথেষ্ট।

গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

গভর্নর জেনারেল লে. গভর্নরের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং লে. গভর্নরকে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে নোট দেন। সরকারের সেক্রেটারি মি. ডব্লু গ্রে এই মর্মে জনশিক্ষার ডিরেকটরকে এক চিঠিতে জানান : 'গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল মনে করেন, লে. গভর্নর মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করেছেন তা সম্পূর্ণ কল্যাণবিরোধী। আলিয়া মাদরাসার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তিনি মানতে প্রস্তুত নন যে, মাদরাসার ছাত্ররা বাংলাদেশের লোকদের মাঝে ভ্রান্ত ধারণার বীজ বপন করছে এবং এতে বিরাটরকম রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। লে. গভর্নরের এ কথায় সত্যের অপলাপ রয়েছে যে, মাদরাসাটি সন্ত্রাস এবং গোলযোগের কেন্দ্রস্থল। গভর্নর জেনারেল এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন যে, যারা আলিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করেছে তারা সিপাহি বিপ্লবের সময় অংশগ্রহণ করেননি উপরন্তু তারা

[১২৩]. Past and Present of Bengal, vol. VIII, June and March 1914.

এই দাঙ্গা নিবৃত্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন (অর্থাৎ নওয়াব আবদুল লতিফ সি. আই. এ প্রমুখ)।

এভাবে মাদরাসা বন্ধের প্রস্তাব ব্যর্থ হয় এবং ১৮৩৫ সালে শিক্ষা কাউন্সিল যে সংস্কার স্কিম প্রস্তুত করেছিলেন তাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়। এ ব্যাপারে মাদরাসার প্রিন্সিপালকে আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

মি. লিজের দ্বিতীয় রিপোর্ট

১৮৬০ সালে জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেকটরকে প্রদত্ত মাদরাসার সংস্কার সম্পর্কিত মি. লিজের আরও একটি রিপোর্টের সন্ধান পাওয়া যায়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে :

মাদরাসার অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতি বছর এই বিভাগ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। ১৮৫৮ সালের সংস্কারের পর আরবি বিভাগেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। অতএব আপাতত আর কোনো নতুন সংস্কারের প্রয়োজন নেই। মাদরাসার কার্যক্রম নির্বিবাদে চলছে। এই সময় নতুন করে কোনো সংস্কারের প্রশ্ন তুললে ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। আরবি বিভাগের অধ্যাপকরা ভাবতে শুরু করেছেন, সরকার সংস্কারের নামে যে তৎপরতা গ্রহণ করেছেন তাদের স্বজাতির কল্যাণের জন্যই তা করছেন। অতএব, কোনো অধ্যাপক সম্পর্কেও কোনো অভিযোগের অবকাশ নেই। এ কথা সত্য আরবি বিভাগ যেমন থাকার দরকার তেমন নেই। এর চেয়ে ভালো করতে হলে উৎকৃষ্ট শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষক কোথায় পাব?

প্রিন্সিপালের আরও একটি প্রস্তাব

মাদরাসার শিক্ষা সম্পর্কে প্রিন্সিপাল আরও একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেন, অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ থেকে ছাত্ররা জুনিয়র স্কলারশিপে উত্তীর্ণ হলে ঐচ্ছিকভাবে তারা আরবি বিভাগে ভর্তি হতে পারবে। তবে তাদের অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগের শেষ দুই বর্ষে ইলমে নাহু ও সরফ পড়তে হবে। জুনিয়র স্কলারশিপ প্রাপ্তির পর ছাত্ররা আরবি বিভাগ বা উচ্চতর কলেজ যেখানেই ভর্তি হবে তাদের বৃত্তির কোনোরকম ব্যাঘাত হবে না।

লে. গভর্নর প্রিন্সিপালের এই প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু শেষ দুই বর্ষে ইলমে নাহু ও সরফ পড়ার প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন রাখেন। কেননা এই বিভাগের ছাত্রদের ইংরেজির সঙ্গে ফারসি পড়তে হতো। তদুপরি আরবির নাহু-সরফ পড়ালে তাদের পাঠ্যের বোঝা ভারী হতো। বরং আরবি বিভাগের প্রারম্ভেই নাহু-সরফ ইত্যাদির জন্য বাড়তি প্রাথমিক ক্লাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রিন্সিপাল লিজ মাদরাসাসংক্রান্ত আরও একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। এই রিপোর্টে তিনি মাদরাসার অভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত

সন্তোষজনক বলে জানান এবং মাদরাসার মৌলিক আরবি বিভাগের পুনরায় কোনো সংস্কার বা সংশোধনের কোনো প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেন।

আলিয়া মাদরাসা উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায়তন। বাংলাদেশের সকল শিক্ষাবিদ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। অতএব এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির মৌলিক রূপ বিকৃত করা উচিত হবে না।

অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ সম্পর্কে তিনি বলেন, এই বিভাগ থেকে ছাত্ররা পাশ করে প্রতি বছর ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করে এবং উচ্চশিক্ষার্থে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়। আমি মাদরাসার ছাত্রদের পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি তুলনামূলক আরবি তথা মুসলিম শিক্ষার মাহাত্ম্য তুলে ধরেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগের কোনো ছাত্র আরবি বিভাগে ভর্তি হয়নি। তারা বরং এই বিভাগ থেকে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। মাদরাসার প্রতি তাদের মনোযোগ খুবই কম। কেননা মাদরাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকায় এর গুরুত্ব খুবই কম মনে হয়। অতএব মাদরাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করলে এই ছাত্ররা অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ শেষ করে মাদরাসার আরবি বিভাগে ভর্তি হবে।

বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যে সংস্কৃত কলেজসহ সব উচ্চপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আলিয়া মাদরাসাকে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়নি। এইজন্য লে. গভর্নর সংস্কৃত কলেজের মি. কোয়েলকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদরাসার অন্তর্ভুক্তির বিয়ষয়টি তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য নির্দেশ দেন। এবং প্রদেশের সাধারণ শিক্ষার পাশে আরবি শিক্ষার অবস্থান সম্পর্কেও বিশেষভাবে মতামত ব্যক্ত করার জন্য বলেন। কিন্তু মি. কোয়েল লে. গভর্নরের এই আদেশ পালন করতে অসম্মতি জানান এবং বলেন, তিনি বরং সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে যদি কোনো রিপোর্ট দিতে বলেন মি. কোয়েল তা স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ও আলিয়া মাদরাসা

মাদরাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াসের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সিপাহি বিপ্লব। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল, মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষা তাদের হীন ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে গড়ে তোলে। এবং সিপাহি বিদ্রোহের পেছনে আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীদের বিশেষ হাত রয়েছে। অতএব আগামী দিনে যেন কোনোরূপ ষড়যন্ত্র বা বিপ্লব দানা বাধতে না পারে সেজন্য মাদরাসাকে অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করলে মাদরাসা সাধারণ শিক্ষায় রূপান্তরিত হবে এবং চিরতরে

মাদরাসার অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাবে। কিন্তু ভারত সরকারের অসহযোগিতার ফলে এইসব ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি।

কিন্তু তারপরও প্রিন্সিপাল লিজ আরও একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। তিনি অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগকে আরও উন্নত করে আরবি বিভাগ থেকে ফেকাহ, মানতেক ও ফালসাফা খারিজ করার প্রস্তাব করেন। যার ফলে আরবি বিভাগ ক্রমান্বয়ে অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগে লীন হয়ে যাবে এবং এভাবে মাদরাসা পাশ্চাত্য শিক্ষায় রূপান্তরিত হবে।

প্রিন্সিপাল ও লে. গভর্নরের টাগ অব ওয়ার

লে. গভর্নরের ইচ্ছা ছিল মাদরাসা সমূলে বিলুপ্ত করে দেবেন। কিন্তু সরকারের বিরোধিতার দরুন তার ইচ্ছা ফলবতী হতে পারেনি। তদুপরি মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাদরাসাসংক্রান্ত যেসব রিপোর্ট পেশ করেছেন তা মাদরাসার অস্তিত্বকে অক্ষত রাখতে ভূমিকা রেখেছে।

লে. গভর্নর স্যার সিসিল বেডেন ও তাঁর সেক্রেটারি মি. গ্রে এরপর জিদ ধরেন, মাদরাসা বিলুপ্ত করতেই হবে এবং এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন, ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক বলেছেন : 'মাদরাসা শিক্ষা সরকারের কোনো উপকারে আসছে না। অতএব মাদরাসার জন্য অর্থ ব্যয় করা অনুচিত এবং অচিরেই মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

এভাবে প্রাদেশিক সরকার ও মাদরাসার প্রিন্সিপালের মাঝে দীর্ঘকাল টানাহ্যাঁচড়া চলল। তারপর প্রিন্সিপাল সরাসরি বাংলা সরকারকে জানান, আমি যতদিন এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল পদে আছি মাদরাসা বন্ধ করতে দেবো না। একসময় বিষয়টি আলোচনা থেকে হারিয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রিন্সিপালের পক্ষে মত পোষণ করেন।

মুসলিম কাজি নিয়োগব্যবস্থা বাতিল

১৮৬৪ সালে ভারত সরকার ১০ নম্বর বিধি অনুযায়ী মুসলিম কাজি এবং পরিসংখ্যানবিদ (অ্যাসেসর) নিয়োগ বাতিল করেন। এতকাল বিচারালয়গুলোতে জজের সঙ্গে কাজিও বিচারিক দায়িত্ব পালন করতেন। এই পদে আলিয়া মাদরাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদেরই নিয়োগ করা হতো। এই বিধি জারি হওয়ার পর মুসলিমদের জীবিকার সংস্থান সংকুচিত হয়। এই বিধি জারির দরুন ভারতীয় মুসলিমদের সামাজিক জীবনের বিপর্যয় সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হান্টার বলেন :

'আমাদের প্রতি মুসলিমদের একটি অভিযোগ, আমরা তাদের শুধু যে আইন পেশা থেকে বহিষ্কার করেছি তা নয় বরং আইনগতভাবে তাদের ধর্মীয় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকেও তাদের বঞ্চিত করেছি। ইসলামি সাম্রাজ্যে কাজির ওপর ফৌজদারি, দেওয়ানি ও ধর্মীয় আদালতের কার্যক্রম নির্ভরশীল ছিল।

আমরা যখন এই দেশ অধিকার করি, প্রথমদিকে আমরা বিচার বিভাগ চালু রাখার জন্য এদের ওপর নির্ভর করেছিলাম। আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ের শাসনতন্ত্রের আওতায় মুসলিমদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আমরা তাদের কাজির পদ বলবৎ রেখেছি। কাজিদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে ভারতীয় শাসনবিধিতে ২৫টি বিশদ উপধারা রয়েছে।[১২৪]

প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে কাজির গুরুত্ব এত বেশি যে, এই বিষয়ে মুসলিমরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, যতদিন দেশে কাজি প্রথা বলবৎ থাকবে ততদিন ভারতকে 'দারুল ইসলাম' আখ্যায়িত করা যাবে। যখন এই পদ বিলুপ্ত হবে তখন একে 'দারুল হারব' বলা হবে। মুসলিমদের অসন্তোষের দরুন বাধ্য হয়ে আমাদের তাদের ইচ্ছা ও দাবি খতিয়ে দেখতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত এই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং বহু বাদানুবাদের পর পুরোনো আইন বাতিল করে কাজি নিয়োগের প্রথা বাতিল করা হয়েছে। ফলে মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান এবং বড় একটি গোষ্ঠী এমন কতগুলো পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন যা মুসলিমদের বিবাহশাদি ও অন্যান্য পারিবারিক কার্য সম্পন্নের বেলায় জরুরি। প্রথমদিকে এই সমস্যা তেমন প্রকট আকার ধারণ করেনি। কেননা তখনও অনেক পুরোনো কাজি বেঁচে ছিলেন। তাদের পরলোকগমন বা পেনশনপ্রাপ্তির পর উক্ত পদে পুনরায় আর কাজি নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

মাদরাসায় কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

১৮৬৬ সালে মুসলিমরা সরকারের কাছে এই মর্মে দাবি জানায়, অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগকে আরও সম্প্রসারণ করে তাকে কলেজে উন্নীত করা হোক। সরকার তাদের এই আবেদন মেনে নেন এবং যথানিয়মে কলেজ চালু করেন। কিন্তু এই কলেজ সাফল্য লাভ করতে পারেনি এবং অচিরে কলেজ বন্ধ করে দিতে হয়। প্রথম বৎসরে মাত্র ছয়জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল। পরবর্তী বৎসরে তারা মাত্র তিনজন ছিল এবং শেষাবধি তারাও কেটে পড়ল।

এরপর মাদরাসায় একজন ফুলটাইম ইংরেজ প্রফেসরের অবস্থানের জন্য প্রস্তাব করা হলো। কিন্তু ছাত্ররা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। মাদরাসায় ইংরেজি প্রফেসরের প্রবেশাধিকার কোনোক্রমেই তারা বরদাশত করবে না। কিন্তু ছাত্রদের চোখে ধুলা দিয়ে রাতারাতি একজন ইংরেজ প্রফেসরকে অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগের হেডমাস্টার হিসেবে নিয়োগ করে তার নিরাপত্তায়ও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

---

১২৪. বেঙ্গলকোড, আর, ৪-১৭৯৩ ও আর ১২ ইত্যাদি।

পুনরায় মাদরাসা তদন্ত কমিটি গঠিত

১৮৬৮-১৮৬৯ সালে মাদরাসার বিখ্যাত প্রিন্সিপাল মি. লিজ কিছুকালের জন্য বিলাতে চলে যান, এই সময় কলকাতার 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' (বর্তমানের 'স্টেটসম্যান') পত্রিকায় ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, মাদরাসার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পড়াশোনা সন্তোষজনক নয়। এজন্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যাতে এই শিক্ষা মুসলিমদের জন্য ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। এ সময় স্বয়ং সরকারও মুসলিমদের শিক্ষা প্রসঙ্গে ভাবছিলেন। কেননা 'ওয়াহাবি আন্দোলনের' প্রেক্ষিতে অনেক আলেম ও মাদরাসার শিক্ষক ইংরেজদের সন্দেহভাজন হয়েছিলেন এবং এই পুরোনো ধারার ঐতিহ্যিক শিক্ষা চালু থাকলে অচিরে মুসলিমরা অপর কোনো বিপ্লব ঘটাতেও পারে, এই ছিল ইংরেজদের আশঙ্কা। এর প্রেক্ষিতে মাদরাসাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন :

১. মি. সি. এইচ. ক্যাম্পবেল, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার।

২. মি. জে. স্টেকলিফ, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল।

৩. খান বাহাদুর মৌলবি আবদুল লতিফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র।

কমিটির রিপোর্ট

তদন্ত কমিটি সরকারের কাছে মাদরাসাসংক্রান্ত যে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে, মাদরাসার শিক্ষার মান অনেক নিম্নস্তরে পতিত হয়েছে। একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদরাসার যে সুনাম এবং গাম্ভীর্য জনমনে ছিল তাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাদরাসার এই অবনতির পেছনে নিম্নোক্ত কারণগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

ক. আট বৎসরের কোর্সকে পাঁচ বৎসরে সীমিত করা হয়েছে।

খ. অসামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক।

গ. ছাত্রদের বৃত্তির যে অঙ্ক ধার্য করা হয়েছে তা খুবই সামান্য।

ঘ. শিক্ষকদের দক্ষতা এবং পাণ্ডিত্য অপ্রতুল।

ঙ. বিচার বিভাগ থেকে তাদের বঞ্চিত করার দরুন এই শিক্ষার প্রতি তাদের আকর্ষণ কমে গিয়েছে।

চ. উচ্চপর্যায়ের শিক্ষায় কর্তৃপক্ষের অমনোযোগিতা। বিচার বিভাগ ও অন্যান্য জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরও মুসলিমদের মনে আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল অপরিসীম। কেননা মাদরাসা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার খাতিরেই

মাদরাসার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় চেতনা অর্জন ছাড়া এই শিক্ষার আর কোনো পার্থিব সুবিধা ছিল না। এজন্য সমাজসচেতন মুসলিমরা তাদের ছেলেদের মাদরাসার মৌলিক (আরবি) বিভাগের বদলে অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি করতে শুরু করলেন। অতএব এমতাবস্থায় হয় মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া হোক, না হয় কমিটি মাদরাসার জন্য যে আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করেছে তা অচিরে কার্যকরী করা হোক।

এ সময় যারা মাদরাসার বিরোধিতা করতেন তাদের যুক্তি ছিল এমন যে, মাদরাসার এই অধঃপতনের জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারই দায়ী। কেননা, সরকার দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার করে মাদরাসার গুরুত্ব দিন দিন ক্ষীণ করে ফেলেছে। মাদরাসার উত্তরাধিকার আইন, হেবা, ওয়াকফ, বিবাহ, তালাক, যৌতুক, অসিয়ত ইত্যাদি বর্তমান ব্রিটিশ শাসিত ভারতে কার্যকরী করা মোটেই সম্ভব নয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, বর্তমানে মাদরাসায় যেসব বিষয় পড়ানো হয় শুধু পূর্ব বাংলার ছাত্ররা ছাড়া আর কেউ এর দ্বারা উপকৃত হয় না। অথচ এজন্য হুগলিতেও একটি মাদরাসার পত্তন করা হয়েছে। এই মাদরাসার খরচ জনৈক দানবীর হাজি মুহাম্মদ মুহসিন নিজে বহন করেন। আরবি শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হুগলি মাদরাসাই যথেষ্ট। কলকাতার মাদরাসা তুলে দিয়ে বরং এখানকার ছাত্ররা যেসব বৃত্তি পেত তা হুগলি মাদরাসার ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। আলিয়া মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়ার প্রশ্নে যে বিতর্ক উঠেছিল, কমিটি তাতে একমত থাকলেন না। ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও মুসলিমদের একান্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন বিষয়াদি জানার জন্য মাদরাসা শিক্ষা অপরিহার্য। এইজন্য আরবি শিক্ষা না করে গত্যন্তর নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও লোকেরা তা আয়ত্ত করতে পারবে। এইজন্য বেসরকারি মাদরাসাগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু কমিটির সদস্যরা এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষা চালু রাখার একটি দায়িত্বও সরকারের রয়েছে এবং তাতে আরবি অপরিহার্য একটি বিষয়। অতএব মাদরাসা বন্ধ না করে বরং মাদরাসার ফেকাহ-সংক্রান্ত যেসব মাসআলা-মাসায়েল আপত্তিকর এবং যুগোপযোগী বলে মনে হবে না তা বাদ দেওয়া যেতে পারে।

হুগলি মাদরাসা

এই মাদরাসার সবচেয়ে বড় দৈন্য ছিল এখানে কোনো ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত ছিল না। কেননা, হিন্দুপ্রধান এলাকায় মাদরাসাটি অবস্থিত। এখানে মুসলিম ছাত্রদের জন্য কোনো ছাত্রাবাস স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। অন্যথায় পড়াশোনার দিক থেকে এই মাদরাসার তুলনা হয় না। কেউ কেউ বলত, হুগলি মাদরাসাই আরবি শিক্ষার জন্য যথেষ্ট, কলকাতার মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া হোক।

পলাশি থেকে ধানমণ্ডি

[তৃতীয় খণ্ড]

মনযূর আহমাদ

চেতনা
প্রকাশন

১৪৯ | পলাশি থেকে ধানমণ্ডি

ব র্ণ না ধা রা...

📖 **একাদশ অধ্যায় :**

▶ **প্রথম পরিচ্ছেদ : আঠারোশ একাত্তর [১৮৭১] আপসহীন ধারার অবক্ষয় ১৫**

সৈয়দ আহমদ খান, আবদুল লতিফ ও আমির আলির আবির্ভাব ১৫
মোহাচ্ছন্ন হিন্দু মধ্যশ্রেণি.....১৬
নবচেতনার হাতছানি ১৬
মহসিন ফান্ড পুনরুদ্ধার ১৭

▶ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ ও কলকাতার বিরোধিতার ছয় কারণ ১৮**

ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ ও কলকাতার বিরোধিতার ছয় কারণ ১৮
এক. জমিদারদের স্বার্থে আঘাত ১৮
দুই. ব্যবসাকেন্দ্র স্থানান্তর ১৮
তিন. আইনজীবীদের মক্কেল হারাবার ভয় ১৯
চার. পত্রিকার বাজার ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য খব ১৯
পাঁচ. বর্ণহিন্দুদের রাজনৈতিক কায়েমি স্বার্থ নাশ ১৯
ছয়. নতুন প্রদেশে বঞ্চিত মুসলিম কৃষক-প্রজারা মাথা তোলার মওকা পাবে ..১৯
ঢাকায় রাজধানী ও কলকাতার বিরোধিতার মনস্তত্ত্ব ১৯
নতুন প্রদেশ ও 'বিক্রমপুরের বাবুগণ' ২১
'স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি সংকুচিত হয়ে গেল' ২২
দেড়শ বছরের 'গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়' ২৪
প্রতিপক্ষ রবীন্দ্রনাথ ও 'আমার সোনার বাংলা' ২৪
নতুন প্রদেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব ২৫
'সেটেলড ফ্যাক্ট'-কে 'আন সেটেলড' করতে সাহিত্য-বন্যা ২৫

▶ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 'বঙ্গভঙ্গ' রুখতে 'স্বদেশি' শোরগোল ২৭**

স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা ও বিলাতি পণ্য বর্জনের ডাক.....২৭
স্বদেশি আন্দোলন ও উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা..... ২৯
স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান নেতাগণ ২৯
যুবক-বৃদ্ধ-জমিদার সব যেখানে একাকার ৩০
ষোলোই অক্টোবরের কলকাতা ও ধর্মঘট, গঙ্গাস্নান ও রাখিবন্ধন ৩১

'বাংলার মাটি বাংলার জল...' ৩২
অনুশীলন সমিতি ও ঢাকাবিরোধী বোমা রাজনীতি
সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর গোষ্ঠীর জন্ম ৩৩
▶ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা ৩৪
অনুশীলন সমিতি : মুসলিমদের যেখানে প্রবেশ নিষেধ ৩৫
বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' থেকে 'অনুশীলন সমিতি' ৩৬
রমনা ও সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য প্রতিজ্ঞা ৩৯
চিনিশপুরের হিন্দু মেলা : পাঁঠাবলি ও মুসলিমবিরোধী কুচকাওয়াজ..... ৪১
'স্বদেশি'দের বোমাবাজি, সিন্দুক ভাঙা ও খুনখারাবি ৪৩
▶ পঞ্চম পরিচ্ছেদ : 'স্বদেশি' সন্ত্রাস ও 'ক্ষুদ দিয়ে কেনা ক্ষুদিরাম' ৪৬
কে এই ক্ষুদিরাম! ৪৬
ভবানীমন্দিরে ক্ষুদিরামের দীক্ষা ৪৭
কালীর কৃপায় পাঁঠা খাওয়া মেদিনিপুর ৪৭
ক্ষুদিরাম সম্পর্কে অতিকথন ও একটি মূল্যায়ন ৪৮
হিরো কাহিনির শুরু ৫০
স্বদেশি সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ও মুসলিম ছাত্রদের মুখে যখন পিঁয়াজের গন্ধ ৫১
রবীন্দ্রনাথ, গিরীশ ঘোষ, ডি এল রায় ও মুকুন্দ দাসদের ভূমিকা ৫২
'স্বদেশি যাত্রা' ও 'বন্দে মাতরম' ৫৩

📖 দ্বাদশ অধ্যায় :

▶ প্রথম পরিচ্ছেদ : উনিশশ পাঁচ সালের খামার বাংলায় নতুন সূর্যোদয় ৫৫
১৬ অক্টোবরের ঢাকা ও প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম ৫৬
নতুন প্রদেশের প্রতি ভাই গিরিশচন্দ্রের সমর্থন ৫৬
আমির আলির দাবি স্বতন্ত্র নির্বাচন ৫৭
সিমলা ডেপুটেশন ও মুসলিম কনফেডারেসি গঠনের পরিকল্পনা ৫৭
উপমহাদেশীয় মুসলিম নেতাদের ঢাকা সম্মেলন ৫৮
নতুন প্রদেশের নতুন রাজধানীতে জন্ম নিল নতুন সংগঠন মুসলিম লিগ ৫৯
মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠায় স্পষ্ট হলো জাতি-স্বাতন্ত্র্য ৫৯
কথা বলার মঞ্চ পেল পূর্ব বাংলা ৬০
পূর্ব বাংলার মুসলিমরা নতুন প্রদেশ সমর্থন করল কেন ৬১
নতুন প্রদেশ ও ফজলুল হকের রাজনৈতিক জন্ম ৬২
নতুন প্রদেশবিরোধী কয়েকজন মুসলিম ৬৩
ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলায় নব নির্মাণের নতুন যুগ ৬৫
যেন আলাদিনের প্রদীপ ঘষে ৬৫

শিক্ষাক্ষেত্রে জাগরণের ঢেউ ৬৬
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি ৬৭
শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে উন্নতি ৬৭
মুসলিম শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসার ৬৮
সক্রিয় জীবনের পথে ৬৮
চাকরিতে বঞ্চনা অবসানের সুযোগ সৃষ্টি ৬৮
পাটচাষীদের ভাগ্যের চাকা ঘুরল ৬৯
▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বঙ্গভঙ্গ রদ থেকে ভারত ভাগের সূচনা ৭০
নাক কেটে যাত্রাভঙ্গের নির্লজ্জ ঘটনা যেভাবে ঘটল ৭০
ওয়াকারুল-মুলকের প্রতিক্রিয়া ও নতুন কর্মপন্থা ৭১
সলিমুল্লাহর আট দফা দাবি ৭২
আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দির প্রতিক্রিয়া ৭৩
সলিমুল্লাহর বিদায় ও মুসলিম তরুণ নেতৃত্বের উদ্ভব ৭৪
মুসলিম লিগের নতুন কর্মপন্থা ৭৪
বঙ্গভঙ্গ রদ প্রমাণ করল—'আটশ বছর তারা আলাদাই ছিল' ৭৬
▶ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিপক্ষ যখন কলকাতা ৭৮
মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি ছিল ১৯০৬ সাল থেকে ৭৮
লর্ড হেয়ার ও বেইলির কাছে ১৯১১ সালের মানপত্র ৭৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ৮০
কলকাতার প্রতিক্রিয়া : 'পূর্ব বাংলার চাষাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার নেই' ৮০
প্রতিপক্ষে কলকাতা : 'অভ্যন্তরীণ বঙ্গভঙ্গ' ৮১
রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের এক সুর ৮২
আশুতোষের চতুরালি ৮২
স্যাডলার কমিশনের কাছে আশুতোষের ধরনা ৮৩
আশুতোষকে নওয়াব আলির চ্যালেঞ্জ ৮৪
ক্যালকাটা বাবুরা নতুন করে যে পুরোনো গীত গাইলেন ৮৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব অনুমোদন ও নাথান কমিটি গঠন ৮৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা ৮৫
সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরি ও ফজলুল হকের অবদান ৮৭
কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হলো জানি না তা ৮৮
জন্ম থেকেই পঙ্গু রাখার চেষ্টা ৮৯
'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' ৯০

▸ **চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অখণ্ড হিন্দু ভারতে সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ ৯১**
মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ১৯১৬ সালের লখনৌ চুক্তি ৯১
জিন্নাহ : 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত' ৯২
উনিশ সালের ভারত শাসন আইন ও মুসলিম প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ৯২
অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িকতার মুখ ও মুখোশ.....৯৪
স্কুল-কলেজ বয়কটের কর্মসূচি ও মুসলিমদের 'না' ৯৫
সাম্প্রদায়িকতা ও আবু জাফর শামসুদ্দীনের একটি অভিজ্ঞতা..... ৯৫
বেঙ্গল প্যাক্ট ও হিন্দু-মুসলিম শুভেচ্ছার দলিল ৯৭
'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর শর্তসমূহ ৯৮
চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ৯৮
'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর অনুমোদন সংকট..... ৯৯
হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও স্বরাজ্য পার্টির কিছু সাফল্য.....১০০
বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল ও কবি নজরুল লিখলেন 'কান্ডারি হুঁশিয়ার' ১০০
মাওলানা আজাদ ও জিন্নাহর প্রতিক্রিয়া ও দেশ বিভাগের 'প্রথম বীজ' ১০১
কংগ্রেসের কলকাতা সম্মেলনে লখনৌ চুক্তি বাতিল : জিন্নাহর চোখে পানি. ১০১
হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ফর্মুলা ও জিন্নাহর চৌদ্দ দফা ১০২
হিন্দু-মুসলিম মিলনের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো.....১০৩
কৃষক-প্রজা সমিতির জন্ম ১০৪
কৃষক-প্রজা সমিতির ইশতিহার ১০৫
সাইত্রিশ সালের প্রজা-লীগ শাসন ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক..... ১০৭

📖 **ত্রয়োদশ অধ্যায় :**

▸ **প্রথম পরিচ্ছেদ : সূর্যসেনের অস্ত্রাগার লুট : কে নায়ক কে ভিলেন? ১০৯**
যে কারণে গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন ১০৯
কংগ্রেস তখন যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিল ১০৯
চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুট ও সূর্যসেন নায়ক না ভিলেন? ১১০
সূর্যসেন : কংগ্রেস কর্মী ও 'বন্দে মাতরমের সৈনিক' ১১১
সূর্যসেনদের কাছে 'গান্ধিরাজ' ও 'রামরাজ্য' ছিল সমার্থক ১১২
ব্রিটিশবিরোধিতা ও মুসলিমবিরোধিতা : তিন নেতার দৃষ্টিতে.....১১৩
অস্ত্রাগার লুটের দায় মুসলিমদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা.....১১৪
মুসলিমরাই ছিল সূর্যসেনদের আন্দোলনের প্রতিপক্ষ.....১১৫
খুন হলেন খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ ১১৬
বাঙালি হিন্দু যুবক ও 'মারাঠা মেইড' সন্ত্রাস.....১১৭

▸ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ১৯৪০ পথ যখন ভাগ হলো ১১৯**
ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব : পটভূমি ১১৯
পৃথক জাতীয়তার প্রশ্ন ১১৯
আল্লামা ইকবালের চিন্তা ১২০
ক্যামব্রিজে পাকিস্তান ন্যাশনাল মুভমেন্ট এবং প্রথম 'পাকিস্তান' ব্যবহার ..১২১
ফজলুল হকের মুসলিম লিগে যোগদান ও লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন.....১২২
লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে *দৈনিক আজাদ* ১২২
▸ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার মুসলিমদের অবদান ১২৫**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নজির আহমদের শাহাদাত বরণ.....১২৫
১৯৪৬-এর নির্বাচনে বাংলার মুসলিমদের ভূমিকা ১২৬
দৈনিক আজাদ, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও আব্বাস উদ্দিন ১২৭
ছেচল্লিশের দিল্লি প্রস্তাব ১২৮
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন স্বাধীনতা তুলে দেবো কার হাতে? ১২৯
বাংলাকে ভাগ করার দাবি জানাল কংগ্রেস ১৩০
বঙ্গীয় কংগ্রেসে মতপার্থক্য.....১৩০
হিন্দু-মুসলিম পৃথক মনস্তত্ত্ব ১৩০
মুসলিম লিগ ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা ১৩১
নুরুল আমিনের ঘোষণা ও বাংলা হবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ১৩১
অবিভক্ত বাংলার পক্ষে তফসিলি ও মুসলিমদের যৌথ আন্দোলন.....১৩১
তফসিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সাংবাদিক সম্মেলন ১৩২
বাংলাকে ভাগ করার জন্য পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা ১৩২
নাজিমুদ্দিনের বিবৃতি : 'বাংলা ভাগ বাঙালির পক্ষে মারাত্মক হবে' ... ১৩৩
'বঙ্গভঙ্গ' ও ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্য দাঙ্গা-সন্ত্রাস.....১৩৪
অখণ্ড বাংলার প্রশ্নে অনড় জিন্নাহ.....১৩৪
সোহরাওয়ার্দীর হুঁশিয়ারি : 'খণ্ডিত পশ্চিম বাংলা পশ্চিম ভারতের কলোনি হবে' ..১৩৫
জিন্নাহর বিবৃতি : বাংলা ভাগের দাবি ঘৃণা ও বিদ্বেষপুষ্ট দুরভিসন্ধিমূলক ১৩৬
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার জন্য বঙ্গীয় মুসলিম লিগের কমিটি.....১৩৭
যুক্ত বাংলার খসড়া সংবিধান রচনার জন্য যুক্ত কমিটি ১৩৭
গান্ধীর কাছে শরৎ বসু, আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর ধরনা ১৩৮
যুক্ত বাংলার পক্ষে জনমত সংগ্রহ ও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভিন্ন চিত্র...১৩৮
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তার ও ইংরেজদের ওপর স্নায়বিক চাপ..... ১৩৮
মাউন্টব্যাটেনের কূটচাল ১৩৯
কলকাতার হিন্দু পত্রপত্রিকার তথ্যসন্ত্রাস..... ১৩৯

সোহরাওয়ার্দী বললেন : 'এখনো আশা ছাড়িনি' ১৪০
অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার খসড়া সংবিধান প্রণয়ন ১৪১
খসড়া চুক্তির পাঁচটি মূল বিষয় ১৪১
শরৎ বসুকে গান্ধীর জবাব ১৪২
গান্ধীর চিঠির জবাবে শরৎ বসু ১৪৩
জিন্নাহকে শরৎ বসুর চিঠি ১৪৪
অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জিন্নাহর নির্দেশ ১৪৫
শরৎ বসুকে তিরস্কার করে গান্ধীর চিঠি ১৪৫
গান্ধীকে শরৎচন্দ্র বসুর চ্যালেঞ্জ ১৪৬
গান্ধীর বিচিত্র নসিহত ও শরৎ বসুর জবাব ১৪৬
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান ১৪৭
মুসলিম লিগের জন্য 'শাখের করাত' ১৪৭
মাউন্টব্যাটেনের ফরমুলার অনন্যোপায় অনুমোদন ১৪৮
দৈনিক আজাদ-এর মন্তব্য ১৪৮
নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি ১৪৯
দ্রুত বদলায় দৃশ্যপট ১৪৯
প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেসের ভোটে বাংলা ভাগ হলো ১৫০
সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি : স্বাধীন বাংলার পিঠে ছুরি মারা হয়েছে ১৫০
সিলেট রেফারেন্ডাম ১৫১

📖 **চতুর্দশ অধ্যায় :**

▶ **প্রথম পরিচ্ছেদ : ১৯০ বছর পর স্বাধীনতা** **১৫৩**

'অখণ্ড ভারত' পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা ভারতের ১৫৩
জন্ম থেকেই অকার্যকর করার চেষ্টা ১৫৪

▶ **প্রথম পরিচ্ছেদ : সাতচল্লিশের ঢাকা : ফের শূন্য থেকে শুরু** **১৫৫**

চৌদ্দই আগস্টের নতুন ভোর : নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা ১৫৫
সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের অনুভূতি ১৫৬
সাতচল্লিশের ঢাকা : শূন্য থেকে শুরু ১৫৯
মেয়েদের ইডেন কলেজ ভবন হলো সচিবালয় : আলপিনের বিকল্প বাবলা কাঁটা ১৬০
মুলিবাঁশের দোচালা সেক্রেটারিয়েট : পাটিতে বসে অফিস করা ১৬১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে বসল পার্লামেন্ট ও ঢাকা কলেজে হাইকোর্ট ১৬১
জেলা শহর থেকে প্রাদেশিক রাজধানী ও ঢাকার 'পলাশি ব্যারাক'-এর কথা ১৬২

কৃষিজীবী আছে পেশাজীবী নেই ১৬২
একজনও বাঙালি মুসলিম আইসিএস অফিসার ছিল না.....১৬৩
সরকারি অফিসারদের জন্য মুলিবাঁশের ব্যারাক ১৬৩
স্বাস্থ্য অবকাঠামো ও জীবন যেন নতুন করিয়া শুরু হইল.....১৬৫
ভারত থেকে দাঙ্গা-তাড়িত হয়ে আসা মুহাজিরে ছেয়ে গেল ঢাকা....১৬৬
সাতচল্লিশে ঢাকার রাস্তাঘাট ও কাওরান বাজারের দোল খাওয়া পুল...১৬৭
এ কি ছিরি এয়ারপোর্টের.....১৬৭
কলকাতা ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে অস্বস্তিকর বৈষম্য বড় প্রকট হয়ে উঠল .১৬৮

▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঢাকায় পরিবর্তনের হাওয়া ১৬৯

সাতচল্লিশে ঢাকার শিক্ষার অবস্থা ১৭০
মেডিকেল ইমার্জেন্সি থেকে আজিমপুর ছাপড়া মসজিদ.....১৭০
উচ্চ শিক্ষা ও নারী শিক্ষায় পরিবর্তনের হাওয়া ১৭১
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, মোমেনশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা.....১৭২
সাতচল্লিশে ঢাকার মুদ্রণ প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা.....১৭২
এক বছর পর ঢাকায় এলো *দৈনিক আজাদ*.....১৭৩
ঢাকায় মুসলিম সাংবাদিকতার সূচনা ১৭৫
সাতচল্লিশের ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবন.....১৭৬
তখনকার ঢাকার বইয়ের বাজার ও নিজস্ব লেখকের নতুন বই চাই ...১৭৭
স্বাধীনতা এনে দিলো নতুন সাংস্কৃতিক জোয়ার ১৭৮
সাতচল্লিশের পূর্ব পাকিস্তান ছিল একটা বড় গ্রাম ১৭৯
সাতচল্লিশ সালে কৃষির হাল ১৮০
শিল্প ও কলকারখানা.....১৮০
ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ ১৮০
আমদানি-রফতানি বাণিজ্য ছিল হিন্দুদের কবজায়.....১৮১
আর্থসামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তনের হাওয়া.....১৮১
ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলায় দ্বিতীয় রেনেসাঁ.....১৮৩

▶ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ১৮৪

সাতচল্লিশ-পরবর্তী রেনেসাঁই জন্ম দিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ ১৮৪
স্বাধীন বাংলাদেশ ও দীর্ঘ সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন ধারা ১৮৫
'সাংঘাতিক মারাত্মক বিভ্রান্তি' ১৮৬
উনিশশ পাঁচ সালের 'বঙ্গভঙ্গ' বর্তমান বাংলাদেশের ভিত্তি ১৮৭
এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ.....১৮৭

📖 **পঞ্চদশ অধ্যায় :**

▶ **প্রথম পরিচ্ছেদ : ভাষার জন্য আন্দোলন : ভাষা আন্দোলনের ভেতর-বাহির ১৯৩**

এ দেশে ঘৃণার রাজনীতি কম্যুনিস্টদের দান ২০৪

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও তার স্বরূপ এবং জিন্নাহকে ভিলেইন প্রমাণের চেষ্টা ২০৮

▶ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্ববিরোধিতার সাতকাহন ২৪১**

এক ২৪১

দুই ২৪৫

ফিরে এলো 'ব্যাকরণ মঞ্জুসা' ২৫১

বাঙালি জাতিবাদী রাজনীতির ফাঁকি ২৫৭

ভাষা আন্দোলন ২৬৪

📖 **ষোড়শ অধ্যায় : 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'**

▶ **প্রথম পরিচ্ছেদ : স্লোগান বনাম বাস্তবতা ২৭৯**

গরমিলের রাজনীতি ২৮০

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে হঠকারিতা ২৮২

জাতীয় সংহতির সংকট ২৮৭

গরমিলের রাজনীতির প্রথম দশক ২৮৮

গরমিলের রাজনীতির দ্বিতীয় দশক ২৯১

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ২৯৬

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ২৯৭

▶ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অস্তিত্বের ভিত্তি : সেকালের স্মৃতি ৩০৩**

▶ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুক্তিযুদ্ধে আলেমদের ভূমিকা একটি সমুজ্জ্বল অধ্যায় ৩০৯**

গণমুখী রাজনীতি : আলেমদের বয়ান ৩১৩

একযোগে বঙ্গবন্ধু ও জমিয়তের লড়াই ৩২২

স্বাধীনতার জন্য ৩২৯

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ও আলেমসমাজ একটি গবেষণার ফলাফল ৩৪২

একটি পরিসংখ্যান : পূর্ব পাকিস্তানের মোট ভোটারের শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছিল ৩৪৩

বাংলাদেশের উলামা : ১৯৭০-৭১ খ্রি. ৩৪৪

বাংলাদেশের উলামা ৩৪৫

কওমি ধারার উলামা ৩৪৭

আলিয়া ধারার উলামা ৩৪৭

পির-মুরিদি ধারার উলামা ৩৪৮

তরিকা-খানকাহ-সিলসিলা ধারার উলামা ৩৪৮
আহলে হাদিস উলামা ৩৪৮
তাবলিগ জামায়াত উলামা ৩৪৮
বাংলাদেশের উলামা মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা ৩৪৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুক্তিযুদ্ধকালীন আলেমদের নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রেক্ষাপট ও কারণ ৩৫৭
আওয়ামী লীগ ও ভারতভীতি ৩৫৭
ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি ৩৫৮
সব দলকে সাথে রাখতে আওয়ামী লীগের অনীহা ৩৬৩
জনগণের করণীয় ও স্বাধীনতা বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা ৩৬৪
স্বাধীনতা ঘোষণায় সমাজতন্ত্রীদের অতি উৎসাহ ৩৬৬
যুদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থতা ৩৬৮
পাকিস্তান প্রীতি ৩৭৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আমাদের মিলিত সংগ্রাম ৩৭৬
জাতি-স্বাতন্ত্র্য প্রশ্নে সাময়িক বিভ্রান্তি ৩৭৬
মূলে সন্দেহ ৩৭৯
জনতার মিলিত সংগ্রাম ও মাওলানা ভাসানী ৩৮১
জাতিসত্তা ও সংবিধান ৩৮৪
পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন ও সিপাহি-জনতার বিপ্লব ৩৮৬
১৯৭৫ রক্তাক্ত ধানমণ্ডি ৩৮৭

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আঠারোশ একাত্তর

[১৮৭১]

আপসহীন ধারার অবক্ষয়

সৈয়দ আহমদ খান, আবদুল লতিফ ও আমির আলির আবির্ভাব

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর সমগ্র ভারতে ইংরেজ ও তাদের সহযোগী শক্তির যৌথ হামলার শিকার মুসলিমগণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় মুসলিমগণ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোনো দল বা সংস্থার অধীনে সংগঠিত ছিলেন না। একশ বছরের কোম্পানি শাসনের সবটা ধকল সহ্য করে পূর্ব বাংলার অবস্থা তখন ছিল সবচেয়ে করুণ।

উনিশ শতকের সত্তর দশকের কলকাতায় এমন সরকারি অফিস ছিল না বললেই চলে, যেখানে মুসলিম চাকরি প্রার্থীরা বয়-বেয়ারা, আর্দালি, দোয়াতে কালি ভরার বা পেন্সিল কাটার কাজের চাইতে ভালো কোনো কাজ আশা করতে পারত। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলিমদের স্বতন্ত্র অবস্থান এভাবেই চিহ্নিত ছিল।

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের অধিকারসহ সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজ প্রতিবেশীদের সাংস্কৃতিক হামলার মোকাবিলা করার যোগ্যতা হারিয়েছিল। হারিয়েছিল হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের সচেতন প্রয়াসে জাগ্রত হওয়ার সামর্থ্য। মুসলিমদের এই দুর্দিনে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮) মুসলিমদের ইংরেজবিরোধী প্রত্যক্ষ লড়াই থেকে বিরত হয়ে শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। বিশেষ করে তিনি ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলার মুসলিমদের মধ্যে এ ধারণার প্রবক্তা হিসেবে মুসলিমদের উজ্জীবিত করার জন্য এগিয়ে আসেন নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) ও সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮)। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতো বাংলার এই

নেতৃত্বও সরকারের সাথে বিরোধের পরিবর্তে সহযোগিতা ও আনুগত্যের নীতি অনুসরণই পশ্চাৎপদ মুসলিমদের এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ বলে মনে করতেন। সাইয়েদ আহমদ শহিদ বেরেলবির জিহাদ আন্দোলনের সহচর মাওলানা কেরামত আলি জৌনপুরিও (মৃত্যু ১৮৭৩) এ সময় ইংরেজদের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ থেকে বিরত হয়ে মুসলিমদের বৈষয়িক সক্ষমতা অর্জন-উন্নয়নের প্রতি আহ্বান জানান।

১৮৭১ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যশ্রেণি মোটামুটি একটি অবয়ব নিতে শুরু করে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত মুসলিমদের আপসহীন বিদ্রোহসমূহের অবসানের পটভূমিতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলির নেতৃত্বে মুসলিমদের যে 'আলোকপ্রাপ্ত' নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে, সেটাই ছিল মুসলিম মধ্যবিত্ত বিকাশের ভিত্তিভূমি।

মোহাচ্ছন্ন হিন্দু মধ্যশ্রেণি

কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সীমাহীন চাহিদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের শেষ পাদে তাদের মান-অভিমান ও বিরোধের সূচনালগ্নে বাঙালি মুসলিমদের সদ্য বিকাশমান মধ্যশ্রেণি সুযোগ-সুবিধার কিছুটা ভাগ পাওয়ার আশায় সোচ্চার হতে শুরু করে। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় একচেটিয়াভাবে অগ্রগতির চূড়ায় পৌঁছে বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণি যখন বঙ্কিম-বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় মোহাবিষ্ট, যুক্তির বদলে সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে কুসংস্কার, উদারতার বদলে অনুদারতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করে গুরুবাদ, ভক্তিবাদ ও অবতারবাদের কুহেলিকার অন্ধকারে অন্ধ জাত্যাভিমানে তলিয়ে যাচ্ছিল, সে পটভূমিতেই স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ, আমির আলি ও মাওলানা কারামত আলির নিরলস চেষ্টায় বাঙালি মুসলিমদের একটি মধ্যশ্রেণি দৃষ্টিসীমায় ধরা দিচ্ছিল।

শত বছরের আপসহীন বিদ্রোহের পথ ছেড়ে, সরাসরি সংঘর্ষের পথ বাদ দিয়ে মুসলিমরা এ সময় ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য আলোচনা ও আবেদনের রাজনীতির পথে অগ্রসর হয়। উনিশ শতকের আশির দশকে জামাল উদ্দিন আফগানির আবির্ভাব, তার প্যান ইসলামি আদর্শের আকর্ষণ এবং উনিশ শতকের আশির দশকে তাঁর কিছু সময়ের কলকাতা উপস্থিতি চিন্তাশীল ও তরুণ মুসলিমদের মনে জাগরণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। এই পটভূমিতেই বাংলা বিভাগের ফলে তাদের মনে নতুন আশাবাদ জন্ম লাভ করে।

নবচেতনার হাতছানি

এই সময়কার আরও কিছু ঘটনা মুসলিম সমাজকে আত্মসচেতন হতে সাহায্য করে। ১৮৬৮ সালে ইংরেজ সিভিলিয়ান ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার-এর

'এ্যানালস অব দি রুরাল বেঙ্গল' বা পল্লি বাংলার ইতিহাস এবং ১৮৭১ সালে তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' প্রকাশিত হয়। এই বই-দুটিতে বাংলার মুসলিমদের অধঃপতিত দশার করুণ চিত্র ফুটে ওঠে।

১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদমশুমারি এবং ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাংলার মুসলিমদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হতে সাহায্য করে। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, বর্ধমান প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জনসংখ্যার ৫০.১৬% মুসলিম এবং ৪৮.৪৫% হিন্দু। ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয়, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলিমগণ প্রতিবেশী সমাজের হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে।

মহসিন ফান্ড পুনরুদ্ধার

হাজী মুহাম্মদ মহসিনের (১৭৩২-১৮১২) দান করা যে বিশাল তহবিল ইংরেজরা ১৮১৬ সালে আত্মসাৎ করেছিল, নওয়াব আবদুল লতিফের চেষ্টায় ১৮৭৩ সালের ২৯ জুলাই থেকে তা পুনরায় মুসলিমদের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়। ঢাকা, হুগলি ও চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা থেকে বেরিয়ে আসা আলেমগণ এ সময় বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলিম গণ-জাগরণের লক্ষ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে থাকেন। তাদের সাথে যুক্ত হন অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারের ইংরেজি শিক্ষিত সন্তানগণ।

এই সময় বাংলার জাগরণকামী মুসলিমদের মধ্যে নানা ধরনের সংগঠন কায়েম, সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ ও সাহিত্যক্ষেত্রে এগিয়ে আসার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ১৮৬৩ সালের ২০ এপ্রিল নওয়াব আবদুল লতিফের (১৮২৮-৯৩) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি'। ১৮৭৫ সালে কলকাতা মাদরাসার ছাত্ররা গড়ে তোলেন 'মাদরাসা লিটারারি অ্যান্ড ডিবেটিং ক্লাব'। ১৮৭৮ সালের ১২ মে সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) ও সৈয়দ আমির হোসেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় মুসলিমদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'। ১৮৭৯ সালে ঢাকা মাদরাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দি সোহরাওয়ার্দী কায়েম করেন 'সমাজ সম্মিলনী সভা'। হিন্দু-সমাজের বহু-সংখ্যক পত্রিকার ভিড়ে ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে 'মোহাম্মদী আখবার'-সহ চারটি মুসলিম সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ পায়। বাংলার মুসলিমদের সাময়িকপত্র প্রকাশের সূচনা বলা চলে এ সময় থেকেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ ও কলকাতার বিরোধিতার ছয় কারণ

ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ ও কলকাতার বিরোধিতার ছয় কারণ

'বঙ্গমাতা'র অখণ্ডতার প্রশ্ন তুলে কলকাতার বর্ণহিন্দুরা নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে হিন্দু জনতাকে ধর্মীয়ভাবে উন্মত্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিরোধিতার আসল কারণ ছিল ভিন্ন। সরকারি নথিপত্র, পত্রপত্রিকার সামসময়িক বিবরণ এবং বিভিন্ন গবেষণাগ্রন্থের আলোকে নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতার ছয়টি প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায় :

এক. জমিদারদের স্বার্থে আঘাত

ইংরেজদের নতুন ভূমিব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট বর্ণহিন্দু ভূমি-বিচ্ছিন্ন, অনুপস্থিত নব্য জমিদারগোষ্ঠী প্রজা-শোষণের নানা কৌশলের মাধ্যমে অর্জিত উদ্বৃত্ত অর্থে কলকাতায় বিলাসী জীবন কাটাচ্ছিলেন। বাংলা বিভাগের মধ্যে তারা তাদের আশু স্বার্থহানির বিপদ দেখতে পান।

প্রথমত, নিয়মিত খাজনা আদায়ের জন্য ঢাকায় এখন আলাদা অফিস বসাতে হবে। ফলে খরচ বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-প্রজা মুসলিম, অন্যদিকে জমিদাররা হিন্দু। এ কারণে নতুন প্রাদেশিক ব্যবস্থায় শক্তি সঞ্চয় করে সেই মুসলিম প্রজারা এখন জমিদারদের জুলুমের প্রতিবাদ এবং খাজনা কমানোর আন্দোলন শুরু করতে পারে।

তৃতীয়ত, আসামের ভূমিব্যবস্থা বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে আলাদা ছিল। প্রতি ত্রিশ বছর পর রাজস্ব হার পুনর্নির্ধারণ করা হতো। এই নতুন ব্যবস্থা বাংলার জমিদারদের কায়েমি স্বার্থের অনুকূল ছিল না।

দুই. ব্যবসাকেন্দ্র স্থানান্তর

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহার হবে তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা। ফলে অনেক ব্যবসা চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কলকাতার ব্যবসায়ীরা এটিকে তাদের স্বার্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিবেচনা করে।

তিন. আইনজীবীদের মক্কেল হারাবার ভয়

কলকাতার বর্ণহিন্দু আইনজীবীদের ভয় ছিল, ঢাকায় নতুন হাইকোর্ট স্থাপিত হলে তাদের জীবিকার ক্ষেত্র সংকুচিত হবে। তাদের বহু মক্কেল হাতছাড়া হয়ে যাবে।

চার. পত্রিকার বাজার ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য খর্ব

কলকাতার সংবাদপত্রের মালিকগণ ভয় পাচ্ছিলেন, নতুন প্রদেশ স্থাপিত হওয়ার কারণে বিকাশমান ঢাকাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তরা নতুন নতুন পত্রপত্রিকা প্রকাশ করবেন। ফলে মুসলিম জন-অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় কলকাতার পত্রপত্রিকার বিরাট বাজার ও তাদের সাংস্কৃতিক একাধিপত্য নষ্ট হবে।

পাঁচ. বর্ণহিন্দুদের রাজনৈতিক কায়েমি স্বার্থ নাশ

কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু রাজনীতিকগণ শঙ্কিত ছিলেন, নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশের ভরকেন্দ্র স্থানান্তরিত হলে বর্ণহিন্দুদের কায়েমি স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে।

ছয়. নতুন প্রদেশে বঞ্চিত মুসলিম কৃষক-প্রজারা মাথা তোলার মওকা পাবে

হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক তৎকালীন রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। সে কারণে তারা মনে করেছিলেন, নতুন প্রদেশ সৃষ্টির ফলে দেড়শ বছরের বঞ্চনার শিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম কৃষক-প্রজারা তাদের একাধিপত্যের জোয়াল ভেঙে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির কাছে এটা ছিল একেবারেই অসহ্য।

'ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠাতা, কলকাতার শীর্ষস্থানীয় বর্ণহিন্দু নেতা, কংগ্রেসপন্থি রাজনীতিবিদ ও বাংলা বিভাগ নস্যাৎ আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বিষয়টি রাখ-ঢাকা ছাড়াই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

'For it was openly and officially given out that eastern Bangal & Assam was to be a Mohamedan Province; and that credal distinctions were to be recognised as the basis of the new policy to be adopted in the Province.'[১২৫]

ঢাকায় রাজধানী ও কলকাতার বিরোধিতার মনস্তত্ত্ব

বস্তুত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অভিজাত মুসলিমদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কারণে বরাবরই মুসলিমদের সন্দেহের চোখে দেখত। তারা শঙ্কিত ছিল, মুসলিমরা সুযোগ পেলেই ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

১২৫. A Nation in Making, London, P-187-88.

করবে। এ কারণে তারা একেবারে শুরু থেকেই 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি অনুসরণ করে।

অন্যদিকে হিন্দু অভিজাত শ্রেণিটিও গোড়া থেকেই ইংরেজদের ক্ষমতা লাভে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কৃতজ্ঞচিত্তে মেনে নিয়েছে।

ইঙ্গ-হিন্দু সম্পর্কের অবস্থা তুলে ধরে ১৮১৩ সালে সিলেকট কমিটির সামনে প্রদত্ত বক্তৃতায় স্যার জন ম্যালকম বলেছেন :

'আমাদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের অনুরক্তি আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রধান উৎস।'[১২৬] ক্যাপ্টেন টি মাকান বলেছেন :

'যদি মুসলিমরা এরূপ সামান্যতম আশাও দেখতে পায় যে, অন্য কোনো ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে যোগ দিলে তারা আমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে, তাহলে তারা সে সুযোগ গ্রহণ করতে ইতস্তত করবে না। মুসলিমদের চেয়ে হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত।'[১২৭]

কর্নেল টমাস মনরো বলেছেন : 'যতদিন হিন্দু জনসাধারণ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত থাকবে, ততদিন মুসলিমরা অসন্তুষ্ট থেকেও কোম্পানির সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।'[১২৮]

১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরা লিখেছেন :

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই (মুসলিম) জাতি আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং হিন্দুদের আস্থা অর্জন করা আমাদের শাসননীতির লক্ষ্য।'[১২৯]

এর অনেক আগেই ১৭৬৮ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসকে একটি চিঠিতে লর্ড ক্লাইভ লিখেছিলেন :

'এটা আপনি ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেন, আমাদের কাছ থেকে সহৃদয় ব্যবহার পেলেও মুসলিমরা কখনো আমাদের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবে না। তাদের নিজেদের বিপদের আশঙ্কাই কেবল তাদের চুক্তি বজায় রাখতে বাধ্য করতে পারে।'[১৩০]

ইংরেজদের শাসননীতিতে তাদের এই মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল। হিন্দুরা তাদের এই নীতিকে স্বাগত জানিয়েছিল। এ সবকিছুই এখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল।

---

১২৬. এম এ রহিম : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ৫৮।
১২৭. এম এ রহিম : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ৫৮।
১২৮. এম এ রহিম : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ৫৮-৫৯।
১২৯. A.R. Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal, P-64.
১৩০. আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৮৩, পৃষ্ঠা : ২১।

কলকাতা নগরীকে ঘিরে ইংরেজদের প্রসাদপুষ্ট বর্ণহিন্দুদের ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বার্থতাড়িত যে মনস্তাত্ত্বিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশবিরোধী মারমুখো মনোভঙ্গি ছিল তারই প্রত্যক্ষ ফল। রেভারেন্ড জেমস লঙ তাঁর 'পিপস ইন টু সোশ্যাল লাইফ অব ক্যালকাটা' বইতে লিখেছেন :

'কলকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সাথে বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; জলাভূমি, জঙ্গল ও গ্রাম থেকে কীভাবে কলকাতা ধীরে ধীরে আধুনিক শহর ও মহানগরে পরিণত হয়েছে, সে কাহিনি লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে সযত্নে রক্ষিত প্রায় এক লক্ষ সরকারি নথিপত্রের মধ্যে সবিস্তারে লেখা রয়েছে।'

'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন প্রশ্নে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য কলকাতা নগরীর ক্রমবিকাশের ধারার প্রতি নজর ফেরাতে হবে। ১৭৭৪ সাল থেকে দেড়শত বছর ধরে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুরা শোষণ-সাফল্যের একেকটি স্তর উতরিয়ে একেবারে শীর্ষচূড়ায় ওঠে গেছে। তাদের সেই উত্থান-আরোহণের কার্যকারণরূপে পূর্ব বাংলার গরিষ্ঠ মুসলিম কৃষক-প্রজা-সাধারণ পতনের একটির পর একটি ধাপ বেয়ে নেমে গেছে অধঃপাতের অতল অন্ধকারে।

একদিকে বর্ণহিন্দুদের অবাক উত্থান, অন্যদিকে মুসলিমদের পাতাল-পতন। এ সবকিছুরই মধ্যবিন্দুতে কলকাতা। বাংলা বিভাগ-বিষয়ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কার্যকারণ কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙালি বর্ণহিন্দুদের সেই দ্রুত বিকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমিতেই তালাশ করতে হবে।

নতুন প্রদেশ ও 'বিক্রমপুরের বাবুগণ'

বাংলা বিভাগের এ প্রক্রিয়াকে মুসলিম জনগণের স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করে বর্ণহিন্দুরা শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর বিরোধিতা শুরু করে। তা ছাড়া ছিল কায়েমি স্বার্থ নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন। ইংরেজ সরকার ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব কার্যকরী করার আগেই কলকাতার জমিদার, বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণির মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গবেষক সুমিত সরকার ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'দি স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-১৯০৮)' নামক বইতে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিসলের ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারির একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে বলেছেন :

'বিক্রমপুরের বাবুগণ এই ভেবে সন্ত্রস্ত হবেন যে, অধস্তন সরকারি চাকরিতে তাদের এতদিনকার আধিপত্য বুঝি বিলুপ্ত হলো, প্রস্তাবিত ভাগরেখার দু-পাড়েই যেসব জমিদারের ভূসম্পত্তি আছে, তাদের দুই সেট করে প্রতিনিধি ও উকিল

নিয়োগ করতে হবে। ভাগ্যকুলের রায়েরা—কলকাতার হাটখোলাকে কেন্দ্র করে যাদের কাঁচা পাট ও চালের বিরাট ব্যবসা—ভীত হয়েছে এ জন্য যে, চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বিকল্প বাণিজ্য পথ খোলা হবে; কলকাতার আইন ব্যবসায়ীদের ভয়, শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের এখতিয়ার অনেকটা হ্রাস পাবে; চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে (পূর্ব বাংলা ও আসাম) অবস্থান করতে হলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদগণ ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন; আর কংগ্রেস রাজনীতিতে কলকাতা এবং বাংলার (বর্ণহিন্দুদের) ক্ষমতা ও আধিপত্য নিশ্চয়ই এক চরম সুপরিকল্পিত আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।'

১৯০৫ সালে প্রস্তাবিত নতুন প্রদেশের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন কলকাতায় বসবাসকারী পূর্ব বাংলার বর্ণহিন্দু জমিদার গোষ্ঠী। এঁরা অন্য সকল ব্যাপারে ইংরেজ শাসকদের অনুগত ছিলেন। কিন্তু নিজেদের বড় রকমের স্বার্থহানির আশঙ্কায় তারা নতুন প্রদেশ প্রশ্নে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার ঝুঁকি নিয়েছেন।

ড. অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন ৪ গতি সঞ্চার করে। ...

'বিচিত্র উপাদান এবং নানাবিধ বৈষয়িক স্বার্থ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে জমিদার শ্রেণি—যাদের পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রদেশেই জমিদারি ছিল—এই ভাবনায় চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় তারা এ পর্যন্ত যেভাবে লাভবান হয়ে আসছিলেন বাঙলা বিভাগের ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা! কারণ, আসামে সাময়িক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো এবং ত্রিশ বছর মেয়াদে এর পুনর্বিন্যাস করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আসামের সঙ্গে পূর্ব বাংলা সংযুক্ত হলে পূর্ব বাংলার জমিদারদের রাজস্ব খাতে আয় হ্রাস নিশ্চিত। তার ওপর বাংলা বিভক্ত হলে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চাকরির সম্ভাবনা ও পরিধি সংকুচিত হবে, এরূপ বাস্তব আশঙ্কায়ও অনেকেই বিচলিত ছিলেন। এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কারণ আইন ব্যবসায়, সরকারি চাকরি, শিক্ষাক্ষেত্র ইত্যাদি ইতিমধ্যেই জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। ...সুতরাং বেকারির ভয় বাস্তব।'[১৩১]

'স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি সংকুচিত হয়ে গেল'

নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক বি বি মিশ্র তার 'দি ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাসেস' বইতে লিখেছেন :

'...এই বিভাগের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দারুণ ক্ষতি হলো এবং তারা প্রায় সবাই বর্ণহিন্দু। তাদের স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি বিভাগের ফলে আরও

[১৩১]. রবীন্দ্রনাথ-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃষ্ঠা : ১২১-১২৩, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮২।

সংকুচিত হয়ে গেল; বিশেষত তখন বিধানসভাগুলির সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তারা স্বাভাবিভাবেই ভীত চক্ষে দেখল, উভয় বাংলার বিধানসভায় তারা একেবারেই সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে—পূর্ব বাংলায় অসমীয়া ও মুসলিমদের দ্বারা এবং পশ্চিম বাংলায় বিহারি ও উড়িয়াদের দ্বারা—এ জন্য তারা ক্রোধে পাগল হয়ে উঠল।

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হওয়ার পর বর্ণহিন্দু রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্য শিক্ষিতশ্রেণি ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাদের কার্যক্রমে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গোড়া থেকেই ইংরেজদের বাংলা বিভাগ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বললেন :

'গোপনে এই বঙ্গভঙ্গ চিন্তার সূত্রপাত, গোপনে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে আর গোপনেই এর চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।'

কংগ্রেসের এককালের সভাপতি মোমেনশাহীর আনন্দমোহন বসু নতুন প্রদেশ বানচালের প্রকাশ্য শপথ ঘোষণা করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ৬ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে এ সকল প্রতিবাদ বিশেষ শ্রেণির হিন্দুদের মধ্যেই সীমিত ছিল। এ সম্পর্কে বিমলানন্দ শাসমল লিখেছেন :

'বাংলা বিভাগের প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৯০৩ থেকে। সেই বছরই মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতি লালমোহন ঘোষ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করে প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব পাকাপাকিভাবে ঘোষণা করা হয়। সেইদিন থেকেই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব নিয়ে দেশময় প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে যে প্রতিবাদ সভা হয় তাতে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন : 'On behalf of the people of Bengal I declare that the partition of Bengal is not a settled fact but a settled failure.' 'বাংলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি যে, বাংলা বিভাগ একটি সম্পাদিত ঘটনা নয়, একটি সম্পাদিত ব্যর্থতা।'

'তারপরে ২২শে সেপ্টেম্বর ও ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ সভা হয়। ১৬ই অক্টোবর ফেডারেশন হলে প্রতিবাদ সভা হয়। এই সকল প্রতিবাদ সভায় কোনো মুসলিম নেতা বা কর্মী বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন বলে কোনো ইতিহাসে উল্লেখ নেই, বাংলা ও ভারতের প্রবল হিন্দু জনমতের কাছে

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ পরিত্যক্ত হওয়ায় মুসলিমদের মনে যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে মুসলিম লিগের জন্ম হয়।'[১৩২]

দেড়শ বছরের 'গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়'

অন্যদিকে বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণিস্বার্থের প্রতিভূ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে একটি গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়রূপে চিহ্নিত করা হয়। একই গোষ্ঠীর 'হিতবাদী' পত্রিকায় লেখা হয় :

'গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতি এই রকম দুর্দিনের সম্মুখীন হয়নি।'

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : '১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ৩০০০ জনসভায় নতুন প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। এসব সভায় ৫০০ থেকে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।'[১৩৩]

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে কাশিমবাজারের জমিদার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ সভা। বাংলাকে ভাগ করা হলে বিলাতি পণ্য বর্জন করা হবে বলে সভায় ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি তার বক্তৃতায় বলেন :

'নতুন প্রদেশে মুসলিমদের প্রাধান্য স্থাপিত হবে। বাঙালি হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্টে পরিণত হবে। আমাদের নিজেদের দেশে আগন্তুকের মতো থাকতে হবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে কী কী হবে তা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি।'

প্রতিপক্ষ রবীন্দ্রনাথ ও 'আমার সোনার বাংলা'

পূর্ববঙ্গের জমিদারির টাকায় ফুলে ফেঁপে ওঠা কলকাতার ঠাকুর পরিবারের কনিষ্ঠ উত্তরাধিকারী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সময় ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিরুদ্ধে জনমতকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য তার সকল শক্তি নিয়োজিত করেন। কাজী আনওয়ারুল হক লিখেছেন :

'কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন এই আন্দোলনকে উৎসাহ জোগানোর জন্য এবং বাংলা ভাষাভাষীদের একতাবদ্ধ করে বঙ্গভঙ্গ রহিত করার জন্য তাঁর বিখ্যাত গান 'আমার সোনার বাংলা' রচনা করেন। গানটি কলকাতা টাউন হলের জনসভায় ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট প্রথমবারের মতো গাওয়া হয়।'[১৩৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সময় নতুন প্রদেশ ঠেকানোর জন্য আয়োজিত অন্তত দুটি জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। এ সভায় ঢাকাকেন্দ্রিক 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নতুন প্রদেশ কার্যকর করার দিন অর্থাৎ ১৬ই অক্টোবরকে 'রাখিবন্ধন' দিবস

---

১৩২. বিমলানন্দ শাসমল : স্বাধীনতার ফাঁকি, আল-ইত্তেহাদ পাবলিকেশন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা : ৬৫।

১৩৩. আধুনিক ভারত, প্রথম খণ্ড।

১৩৪. কাজী আনওয়ারুল হক : তিন পতাকার তলে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা : ৪৮।

ঘোষণা করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিনে কলকাতার কালিঘাটের বিখ্যাত কালিমন্দিরে হিন্দুরা বাংলাকে ভাগ করার কারণে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার 'রক্ত শপথ' নেয়।

নতুন প্রদেশ রদ আন্দোলনের শ্রেণিচরিত্র বিশ্লেষণ করে আসহাবুর রহমান 'বঙ্গভঙ্গ ও ভদ্রলোক শ্রেণি' শিরোনামে লিখেছেন :

'উচ্চ বর্ণভুক্ত ভদ্রলোক শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি ধর্মীয় চরিত্র আন্দোলনের ঘটনাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের রণ হুংকারে পরিণত হয়েছিল। ভদ্রলোক শ্রেণির শক্তিপ্রতীক ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ স্বদেশিকে হিংস্রতা অবলম্বনে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। ১৯০৫-এর ২৮ সেপ্টেম্বর ছিল মহালয়া। ওই দিনটিতে কালী ঘাটের বিখ্যাত কালী মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেওয়া হয়েছিল। ২৪ ও ২৭ সেপ্টেম্বরের দুটো সভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বাংলা বিভাগ বাস্তবায়নের দিন ১৬ই অক্টোবর 'রাখিবন্ধন' দিবস ঘোষণা করলেন...।'[১৩৫]

নতুন প্রদেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২২তম অধিবেশন বসে কলকাতায়। দাদাভাই নওরোজির সভাপতিত্বে এই অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা , তার মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল নবগঠিত ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিরুদ্ধে। একটি প্রস্তাবে কংগ্রেস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নতুন প্রদেশ গঠনের প্রতিবাদ জানায় এবং এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। অপর প্রস্তাবটিতে কংগ্রেস বাংলা ভাষাভাষী সব মানুষকে অভিন্ন প্রশাসনের অধীনে রাখার দাবি জানায়।

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে যেমনই, একইভাবে ১৯০৬ সালেও কংগ্রেস ছিল সম্পূর্ণরূপে একটি হিন্দু প্রভাবিত সংগঠন। কংগ্রেসের সদস্য পদের জন্য একটি শর্ত ছিল ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা। এই শর্তের মারপ্যাঁচের কারণে কংগ্রেসে মুসলিম সদস্যসংখ্যা ছিল একেবারেই সীমিত।

'সেটেলড ফ্যাক্ট'-কে 'আন সেটেলড' করতে সাহিত্য-বন্যা

কলকাতার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও কলামিস্ট পশ্চিমবঙ্গের সাবেক অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে তখনকার ঘটনাপ্রবাহকে 'শোরগোল' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন :

---

১৩৫. আসহাবুর রহমান : বঙ্গভঙ্গ ও ভদ্রলোক শ্রেণি; মাসুদ মজুমদার : 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ ও ঢাকাকেন্দ্রিক জাতিসত্তার নব উত্থান' শীর্ষক প্রবন্ধ—২০০২ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত।

'কার্জনের বাংলাভাগের এই ঘোষণায় শোরগোল শুরু হলো। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাঙালি রাজনীতিবিদরা বাংলাভাগের 'সেটেলড ফ্যাক্ট'-কে 'আন সেটেলড' করার জন্য শপথ করলেন, 'ওই ঘোষণাকে তারা বানচাল করবেনই। এই রাজনীতিবিদদের সাথে যোগ দিলেন জমিদাররা। তাদের ভয় ছিল, নতুন প্রদেশে জমির ওপর তাদের অবাধ অধিকার বা মালিকানা স্বত্বের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ আন্দোলনকে ঔজ্জ্বল্য দিয়ে প্রভাববিশিষ্ট করে তুলেছিল এর আবেগপ্রবণ দিক। এমন প্রচারণা চলে যে, মাতৃহত্যার প্রতিবাদ জানাতে বাঙালিদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বিশাল এক সাহিত্য-বন্যা শুরু হয়। এর মধ্যে ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ডজনখানেক দেশাত্ববোধক কবিতা ও স্তোত্র।'[১৩৬]

[১৩৬]. অশোক মিত্র : 'বঙ্গভঙ্গ রদ : বাঙালি হিন্দুর গর্বকথা, না সর্বনাশের পাঁচালী?' প্রবন্ধ, নয়াদিগন্ত, ১৬ অক্টোবর ২০০৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

‘বঙ্গভঙ্গ’ রুখতে ‘স্বদেশি’ শোরগোল

স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা ও বিলাতি পণ্য বর্জনের ডাক

ঢাকাকে রাজধানী করে ‘পূর্ব বাংলা ও আসাম’ নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ‘স্বদেশি’ নামে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করা হয়। সে আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে বিলাতি পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়।

১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই বাগেরহাটে এক জনসভায় বিলাতি পণ্য বর্জন-সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, যতদিন নতুন প্রদেশ বাতিল না হবে, ততদিন ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা হবে। পরবর্তী ছয় মাস সব ধরনের আনন্দ অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণ বন্ধ রাখা হবে।

কলকাতার রিপন কলেজে দু-দিনব্যাপী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিলাতি পণ্য পোড়ানোর আহ্বান জানানো হয়। এবং সেখানে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে মহেন্দ্রনাথ নন্দীর সভাপতিত্বে বাংলার বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলা থেকে ৪৬ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। সভায় প্রস্তাবে বলা হয় :

‘বঙ্গবিচ্ছেদ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহার করা হবে না। বিলাতি পণ্য বয়কটের পাশাপাশি বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ স্বদেশি মাল ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, কর্মচারীদের অফিস বর্জন, সরকারের কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ‘আমার সোনার বাংলা নামক বিখ্যাত গানটি প্রথম গাওয়া হয়’।’

কংগ্রেসের মারাঠি নেতা বালগঙ্গাধর তিলক হিন্দু জাতীয়তাবাদদের উত্থানে নতুন প্রদেশ গঠনের ঘটনাকে কাজে লাগাতে শিবাজি উৎসব আয়োজনের ডাক দেন। হিন্দুত্ববাদের মোড়কে মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার প্রমত্ততা এ সময় সকল যুক্তি ও বুদ্ধিকে গ্রাস করে।

১৯০৫ সালের আগস্ট মাসের শেষদিকে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাবু অনুদাচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অংশগ্রহণ করেন। এর কয়েক দিন পর বড় লাটের কাছে নতুন প্রদেশ রদের দাবিতে প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়।

স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতাদের নায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৮৪-১৯২৫), তার সহযোগী ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২), আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯০৫), মোমেনশাহীর অনাথবন্ধু গুহ, বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯২২), কলকাতার অরবিন্দ বোস (১৮৭২-১৯৫৯), আনন্দমোহন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

স্বদেশি আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' ১৫৯টি শাখার মাধ্যমে বরিশাল জেলায় স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন সংগঠিত করে।[১৩৭]

মহারাজা গিরিজানাথের সভাপতিত্বে দিনাজপুরে এক সভায় বছরব্যাপী জাতীয় শোক পালন এবং জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভা থেকে সকল সদস্যের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বরিশালে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে যুদ্ধ-মন্ত্রের মতো 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হয় এবং বিভক্ত বাংলা-মায়ের পুনঃসংযোজন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক সরল চট্টোপাধ্যায় 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন :

'বাংলা বিভাগ পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর অসংখ্য সভা-সমিতি সারা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৪-এর জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৫০০ সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৯০৫ পর্যন্ত ছোট-বড় এবং অতি বিশাল প্রায় দু-হাজার বঙ্গভঙ্গবিরোধী সভায় বঙ্গের নরমপন্থি নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। ...১৯০৫-এর অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবে বলে সরকার ঘোষণা করে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান অনুযায়ী এই দিনকে 'রাখিবন্ধন' দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ১৬ অক্টোবর প্রতি বছর 'রাখিবন্ধন' উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই দিন শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং পথের দু-ধারে সবার হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। রাখিবন্ধন উৎসব বাংলা বিভাগবিরোধী রাজনৈতিক উৎসবে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, ১৯০৫-এর ২৫ আগস্ট বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে টাউন হলে (কলকাতা) এক বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত 'অবস্থা ব্যবস্থা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।'

---

[১৩৭]. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আধুনিক ভারত।

স্বদেশি আন্দোলন ও উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা

স্বদেশি আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতির একজন প্রথম সারির নেতা, 'অগ্নিযুগের বিপ্লবী' নামে খ্যাত মোমেনশাহী জেলার মহারাজ ত্রৈলোকনাথ (বাবা-মায়ের দেওয়া নাম ত্রৈলোক্যমোহন চক্রবর্তী) স্বদেশি আন্দোলনকে ভারতের 'নবজাগরণ' আখ্যায়িত করে লিখেছেন :

'স্বদেশি আন্দোলন ভারতের নবজাগরণ। এই জাগরণ হঠাৎ একদিনে হয় নাই, জাতি যখন জাগে আস্তে আস্তে জাগে, পেছনে থাকে বহু লোকের দান। রাজা রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অর্ধ শতাব্দীব্যাপী সাধনার ফল ভারতের নবজাগরণ। ...বিগত ২০ বৎসরের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপ্রয়াস ও আবেদন-নিবেদনের বিফলতার ফলে, জাতির মধ্যে যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই স্বদেশি আন্দোলনরূপে দেখা দিলো...। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর মোতাবেক ৩০ আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ হয়। এই বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়াই স্বদেশি আন্দোলনের জন্ম। জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের কৃতিত্ব এই, তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করিতেন, তবে এত বড় আন্দোলন হইত না। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতার প্রথম সোপান।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে ৩০ আশ্বিন রাখিবন্ধন ধার্য হইল। একদিকে যেমন বিদেশি বর্জন, আবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি গ্রহণ সংকল্পও গ্রহণ করা হয়। ...যুবকের দল স্বদেশি গান গাইতে গাইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত। তখন অনেক স্বদেশি গান রচিত হইয়াছিল, গানগুলি ছিল সময়োচিত এবং তাহা দ্বারা স্বদেশি প্রচার বেশ সহজ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে অরন্ধন ছিল, সারাদিন উপবাস থাকিয়া প্রার্থনা করা হইত, বৈকালে শোভাযাত্রা ও সভা হইত। সন্ধ্যার পর অনশন ভঙ্গ হইত। সেই সময় বহু স্বদেশি প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় বিদ্যালয় গড়িয়া ওঠে।'[১৩৮]

স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান নেতাগণ

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ কলকাতা, ঢাকা, মোমেনশাহী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, দিনাজপুর, বহরমপুর, রংপুর, যশোর, মেদিনীপুর ও বর্ধমান এলাকার স্বদেশি আন্দোলনের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের একটি তালিকা দিয়ে জানাচ্ছেন : 'স্বদেশি আন্দোলনের সময় যাহারা বাংলাদেশকে নানাভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেন, তাহাদের মধ্যে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পি, মিত্র, ভূপেন বসু, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, কালীপ্রসন্ন

১৩৮. মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ : জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠা : ৬-৭।

কাব্যবিশারদ, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, রাধাকুমুদ মুখার্জি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, এ. রসুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। ঢাকায় আনন্দচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র পাকড়াশী, ললিতমোহন রায়, ত্রৈলোক্য বসু, পি. সি. সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, রসিক চক্রবর্তী, কুঞ্জলাল নাগ, যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, যোগেন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, দীনবন্ধু মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (উকিল), মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, পুলিনবিহারী দাস, কবি হরিচরণ আচার্য্য, রজনীকান্ত বসাক, হরকুমার গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। ময়মনসিংহে মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য্য, অনাথ বন্ধু গুহ, ডা. বিপিন সেন হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য্য, কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (গোলকপুর), ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, অমর ঘোষ প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। ফরিদপুরে অম্বিকাচরণ মজুমদার, বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, দুর্গামোহন সেন, সুরেন সেন, কবি মুকুন্দদাস। চট্টগ্রামে যাত্রামোহন সেন, কুমিল্লার বসন্ত মজুমদার, হরদয়াল নাগ, উপেন্দ্রমোহন মিত্র, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। নোয়াখালীতে যশোদা ঘোষ, রাজশাহীতে কিশোরী মোহন চৌধুরী, সুদর্শন চক্রবর্তী সুরেন্দ্র মৈত্র, দিনাজপুরে যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রংপুরে উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ঈশান চক্রবর্তী, যশোহরে যদুনাথ মজুমদার, মেদিনীপুরে উপেন্দ্রনাথ মাইতি; নরেন্দ্রলাল খাঁ, নোরাজোলের মহারাজা, বর্ধমানে আবুল কাসিম, নলিনাক্ষ বসু প্রধান ছিলেন।

যুবক-বৃদ্ধ-জমিদার সব যেখানে একাকার

ত্রৈলোক্যনাথ স্বদেশি আন্দোলনের সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'১৯০৫ সনে বাংলাদেশে স্বদেশি আন্দোলনের জন্ম হয়। স্বদেশি আন্দোলনের প্রবল বন্যায় সমগ্র বাংলাদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, সেই বন্যায় আমার ক্ষুদ্র জীবনতরিখানাও ভাসিয়া যায়। স্বদেশি আন্দোলনের সময় বাংলার যুবক বৃদ্ধ, জমিদার, সকলেই স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া ওঠে...। স্বদেশি আন্দোলনের নেতাগণ নির্দেশ দিয়াছেন, বিদেশি দ্রব্য বয়কট করিতে হইবে, দেশের সর্বত্র বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানাইতে হইবে। বাংলাভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে দেশের সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা হইতে লাগিল, হাট-বাজারে পিকেটিং চলিতে লাগিল। আমি তখন ধলা স্কুলে পড়ি এবং স্কুল-বোর্ডিংয়ে থাকি। স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ ধলায় আসিয়া পৌঁছিল, জমিদার বাড়িতে তাঁত, চরকা বসিল, সভা, শোভাযাত্রা পিকেটিং চলিতে লাগিল। যুবকের দল ডন, কুস্তি, কুচকাওয়জ করিতে লাগিল—লোকের মনে কী উৎসাহ! ধলাতে যাহারা

আন্দোলনে মাতিয়াছিল, আমি তাহাদের মধ্যে একজন স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ আমাদের ক্ষুদ্র (কাপাসাটিয়া) গ্রামেও পৌঁছিয়াছিল। ...পর বৎসর আমার ছোড়দা (চন্দ্রমোহন চক্রবর্তী) আমাকে সাটিরপাড়া স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। সাটিরপাড়া স্কুলের সম্পাদক পরলোকগত ললিতমোহন রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আমি স্কুল বোর্ডিং-এ থাকিতাম। কিছুদিন পর বিজয় বাবু সাটিরপাড়া স্কুলের হেড মাস্টার হইয়া আসেন। সাটিরপাড়াতেও স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল। সাটিরপাড়ার জমিদার ললিত বাবু স্বদেশি আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি ঢাকাতে ওকালতি করিতেন। ললিত বাবুর ভাই মোহিনীবাবু বাড়িতে থাকিতেন। মোহিনী বাবু এবং ব্রাহ্মণদীর কামিনি মল্লিক মহাশয় ওই অঞ্চলের স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আমি অল্পদিনের মধ্যেই সকলের সহিত পরিচিত হইলাম এবং উৎসাহী কর্মীদের একজন হইয়া উঠিলাম।'[১৩৯]

ষোলোই অক্টোবরের কলকাতা ও ধর্মঘট, গঙ্গাস্নান ও রাখিবন্ধন

দেড় শতাব্দীকালের একান্ত প্রভুভক্ত বর্ণহিন্দু সমাজের প্রতিবাদ আর হুমকির তোয়াক্কা না করে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ভারত সচিবের অনুমোদনক্রমে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নতুন প্রদেশ গঠন করে ঢাকাকে এই প্রদেশের রাজধানী ঘোষণা করা হয়। এ প্রসঙ্গে অশোক মিত্র লিখেছেন :

'বাংলার প্রভাবশালী তৎকালীন হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণির কাছে এ পদক্ষেপ ছিল তাদের মর্যাদাবোধের ওপর চরম আঘাত এবং এক অশুভ সংকেত। বাংলা ভাগের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নামটি উচ্চারিত হয় সেটি হলো ভারতের ভাইস রয় ও গভর্নর জেনারেল জর্জ নাথানিয়াল কার্জন-এর। তিনি ছিলেন দৃঢ়তাসম্পন্ন একজন আত্মগর্বী মানুষ। সেইসঙ্গে কলকাতায় বাঙালি জমিদার ও আইনজীবীদের যে ভিড় একত্রিত হয়েছিল—কার্জন তাদের ভীষণভাবে অপছন্দ করতেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এই প্রজাতির লোকেরা সম্পূর্ণভাবে এক অকর্মণ্য গোষ্ঠী। ভূমির মালিক জমিদারদের তিনি রক্তশোষকের দল বলে মনে করতেন, যারা সহজে অর্জিত উদ্বৃত্ত অর্থে আয়েশি জীবনযাপন করে। এই জমিদার শ্রেণিকে চিরস্থায়ী প্রথা সুযোগ এনে দিয়েছিল অসহায় এবং মূলত বাঙালি মুসলিম কৃষককুলকে নিংড়ে নেওয়ার। শোষিত এই কৃষকরা ছিলেন প্রধানত পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। কলকাতাকেন্দ্রিক আইনজীবীরা ছিল আরও ভয়ানক। তারা নিজেদের অর্থহীন ছিদ্রান্বেষণের দ্বারা শাসনপ্রক্রিয়ায় অনবরত হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করত। ভাইস রয় কার্জন এই দুটি দলেরই শ্বাসরোধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি বাংলা ভাগ করার পরিকল্পনা নিলেন। এর দ্বারা হিন্দু

[১৩৯]. মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ : জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠা : ২১-২৩।

বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করা যাবে বলে তাঁর ধারণা ছিল। কারণ সে ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশে অবস্থিত জেলাগুলি থেকে জীবনধারণ ও বিলাস-ব্যাসনের টাকা-কড়ি আসা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। লর্ড কার্জন কিন্তু ভান করলেন, তাঁর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। আর তা হলো আদি ও খণ্ডিত—এই দুই প্রদেশেই উন্নত প্রশাসন প্রণালি ও আরও কার্যক্ষম শাসন কায়েম করা।'[১৪০]

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার প্রথম দিনে ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নর্থব্রুক হলের সভাস্থলে মিলিত হয়ে যখন নতুন প্রদেশের উন্নয়নে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছেন, কলকাতার চেহারা সেদিন ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। এ সম্পর্কে এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন :

'১৬ই অক্টোবর এদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ধর্মঘট, গঙ্গাস্নান এবং রাখিবন্ধন। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করতে হয় যে, এদিন কলকাতায় যে শোভাযাত্রা হয়েছিল অন্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও তার পুরোভাগে ছিলেন এবং তিনি অসংখ্য পথচারীর হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে রোগজর্জর আনন্দমোহন বসু 'মিলন মন্দিরের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের জন্য ইংরেজিতে যে ভাষণ লিখে এনেছিলেন তা পড়ে শুনালেন আশুতোষ চৌধুরী এবং বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সেই আমলের সম্পাদক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিকেলের জনসভায় ঘোষিত শপথ বাক্যের বাংলায় তর্জমা করেও পাঠ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'[১৪১]

'বাংলার মাটি বাংলার জল...'

রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর 'রাখিবন্ধন' আয়োজনের একপর্যায়ে গঙ্গাস্নানের পূর্বে প্রার্থনা সংগীত গেয়েছিলেন :

'বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা

---

১৪০. অশোক মিত্র : 'বঙ্গভঙ্গ রদ ও বাঙালি হিন্দুর গর্বকথা, সর্বনাশের পাঁচালি?', নয়াদিগন্ত, ১৬ অক্টোবর : ২০০৫।
১৪১. কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, পৃষ্ঠা : ২১৩।

সত্য হউক
সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান।'

এই প্রার্থনা সংগীতের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ 'একক বঙ্গমাতা'র অস্তিত্ব ঘোষণা করেন এবং সেই একক 'বঙ্গমাতা'র অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে তিনি 'বঙ্গমাতা'র সন্তানদের উদ্‌বুদ্ধ করেন। ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে এর আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'আমার সোনার বাংলা' গান রচনা করেন। চরমপন্থি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ উল্লেখ করেছেন, কলকাতাকেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'যুগান্তর পার্টির' দলীয় গোপন পত্রিকার নামও ছিল 'সোনার বাংলা'।

অনুশীলন সমিতি ও ঢাকাবিরোধী বোমা রাজনীতি

সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর গোষ্ঠীর জন্ম

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নতুন প্রদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর ১৯০৬ সাল থেকে বাংলাদেশে সহিংস চরমপন্থি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। সৃষ্টি হয় গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর'। এ দুটি ছাড়াও আরও কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ বোমাবাজি ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

এ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের টার্গেট ছিল মূলত মুসলিম জনগোষ্ঠী। বিমলানন্দ শাসমল তার 'ভারত কী করে ভাগ হলো' শীর্ষক বিখ্যাত বইতে লিখেছেন :

'বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল সন্দেহাতীতভাবে মুসলিমবিরোধী এবং গভীরভাবে মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থি। এই আন্দোলনের তাগিদে যেসকল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদী নেতা কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত হলেন, তারা সকলেই ছিলেন গভীরভাবে মুসলিমবিরোধী।'

বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস আর স্বামী বিবেকানন্দের 'নবহিন্দুবাদ'-এ 'দীক্ষাপ্রাপ্ত' বর্ণহিন্দুরা এ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, শরীর চর্চার আখড়া স্থাপন এবং কালী মন্দিরকে ঘিরে শক্তির সাধনায় মত্ত হয়ে ওঠে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম লিখেছেন :

'শাসনকার্যে সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলাকে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নূতন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়। ঢাকা হয় নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী, ঢাকার নূতন শহর বা রমনা অঞ্চল তখনই গড়ে ওঠে। একই সময় পাঞ্জাবের একটি অংশকে উত্তর-পশ্চিম এলাকার সঙ্গে জুড়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ গঠন করা হয়। সেখানে এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ না হলেও বাংলাদেশে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ঢাকার নবাব বাহাদুর স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অচিরেই চরমপন্থিদের প্রাধান্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ১৮৯৭ সালে বম্বেতে তিলক আয়োজিত শিবাজি উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। কলকাতায় 'শিবাজি উৎসব' আন্দোলন শুরু করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৯০৪ সালে। ১৯০৬ সালে কলকাতায় 'শিবাজি উৎসবের' আয়োজন করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল ভবানী পূজা। শিবাজি উৎসব ও ভবানী পূজা উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্র থেকে তিলক, খাপার্দে ও মুঞ্জেকে কলকাতায় আনা হয়। লোকমান্য তিলক এই উৎসবের উদ্‌বোধন করেন। তিলক একদিন ত্রিশ হাজার লোক নিয়ে গঙ্গাস্নানে যান, সেই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিল একখানি ভারত মাতার ছবি। বস্তুত এই আন্দোলনের নেতা তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র। ব্রহ্মবান্ধবদের জাতীয়তাবোধ পৌরাণিক হিন্দুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই পথ বঙ্কিম প্রদর্শিত ও অনুপ্রাণিত। অরবিন্দ ও তার দলের জাতীয়তার মূলে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ভাবনাই প্রধান। তাই 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'স্বদেশি আন্দোলন', 'শিবাজি উৎসব' বা 'ভবানী পূজার' রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এই কারণেই বাংলার মুসলিম সমাজ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনরূপে গ্রহণ করতে পারেনি।

প্রতিক্রিয়ার শেষ এখানেই হয়নি, ১৯০৭ সালেই বাংলাদেশে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়, পূর্ব বাংলার নানা স্থানে যেমন জামালপুর, কুমিল্লা, পাবনায় দাঙ্গা হয়। ১৯০৭ সাল থেকেই সন্ত্রাসবাদীরা 'অনুশীলন

সমিতি' ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক হত্যা, লুণ্ঠন শুরু করে আর এই সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ইংরেজবিরোধী ছিল না, তারা মুসলিমবিরোধীও ছিল।'[১৪২]

অনুশীলন সমিতি : মুসলিমদের যেখানে প্রবেশ নিষেধ

নতুন প্রদেশ গঠনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম আরও লিখেছেন :

'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বা 'টেররিস্ট'রা খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। বরোদা রাজ কলেজের অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৬ সালে বরোদার কাজ ছেড়ে কলকাতায় আসেন। তিনি এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ উভয়ে বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলাদেশে এসে বিপ্লবী তৎপরতা শুরু করেন। বাংলার বিভিন্ন শহরের 'অনুশীলন সমিতি'গুলির মধ্যে তারা সংযোগ সাধন করেন। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মুখপত্র যুগান্তর' প্রকাশিত হয়। পূর্ব বাংলা ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রধান কার্যস্থল, কারণ বাংলাভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারিপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, রাজশাহীতে তারা খুবই তৎপর ছিলেন। ঢাকায় অনুশীলন সমিতির নেতা ছিলেন পুলিন বিহারী দাস। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির পাঁচশত শাখার সভ্য ছিল ত্রিশ হাজার। এই সব সমিতিতে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার ছিল না এবং ঢাকার অনুশীলন সমিতি যুগপৎ মুসলিম ও ইংরেজ বিদ্বেষী ছিল। পূর্ববঙ্গে বহু দুঃসাহসী ডাকাতির নায়ক অনুশীলন সমিতি। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় একই আদর্শে অনুপ্রাণিত সমিতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বরিশালের 'বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি', ময়মনসিংহের 'সুহৃদ ও সাধন সমিতি'। ১৯১০ সাল পর্যন্ত ঢাকায় সন্ত্রাসবাদীরা খুবই তৎপর ছিল।'[১৪৩]

এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন :

'কলকাতা এবং ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়াই এই বিপ্লব আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলকাতার বিপ্লববাদীরা 'যুগান্তর' এবং ঢাকার বিপ্লববাদীরা 'অনুশীলন' নাম দিয়া তাহাদের সমিতি গঠন করে। সাধারণত এই দুইটি সমিতির সদস্যগণই বোমা তৈরি ও আগ্নেয়াস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করিতেন। ইহার পর অন্যান্য নামেও মফস্সলের কোনো কোনো স্থানে গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু উহারা কোনো সময় বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। কারণ, অস্ত্রশস্ত্রের জন্য সবসময় তাহাদিগকে কলকাতার ওপর নির্ভর করিতে হইত। কলকাতা বন্দরে আগত বিদেশীয় জাহাজের লোকজনের নিকট হইতে

---

১৪২. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৮-৯।

১৪৩. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১০।

সাধারণত উচ্চ মূল্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইত। সময় ফরাসি শাসনাধীন চন্দনগর হইতেও পিস্তল, রিভলভার ইত্যাদি খরিদ করা হইত।'[১৪৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' থেকে 'অনুশীলন সমিতি'

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে অনুশীলন সমিতির বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরে জানাচ্ছেন :

'বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন হইতে মিত্র মহাশয় (পি. মিত্র) 'অনুশীলন' নাম গ্রহণ করেন। অনুশীলন নামের মধ্যেই অনুশীলনের মতবাদ নিহিত আছে।'

'অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা ও নেতা ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র (পি. মিত্র) পশ্চিমবঙ্গের অনুশীলন সমিতির ভার সতীশচন্দ্র বসুর ওপর এবং পূর্ববঙ্গের ভার পুলিন বিহারী দাসের ওপর ন্যস্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্র কলকাতা ও পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র ঢাকা ছিল, পুলিনবাবু ও সতীশ বাবু অনুশীলন সমিতির যুক্ত সম্পাদক ছিলেন। কলকাতা কেন্দ্রের কর্মক্ষেত্র বেশি বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু ঢাকার কেন্দ্রই সমগ্র বাংলাদেশ ও পরে সমগ্র ভারতে ও ব্রহ্মদেশে বিস্তার লাভ করে। কিছুদিন পর মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু হয় এবং পুলিনবাবুই কার্যত অনুশীলন সমিতির নেতা হন। পুলিনবাবু দেশের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তি জাগরণের জন্য অসি খেলা, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও ড্রিল শিক্ষা প্রচলন করেন। স্বদেশি আন্দোলন দেশের মধ্যে একটা নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিলে জনসাধারণের মধ্যে একটা বীরত্বের ভাব সঞ্চারিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়িল অসিখেলা ও ড্রিল শিক্ষার উপর। এই সময় কোনো কোনো স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হইল এবং অনুশীলন সমিতির সভ্যেরা বীরত্বের সহিত উহার সম্মুখীন হইল; ফলে সমিতির ওপর সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়া আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিল।

...পুলিনবাবুর বাড়ি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত লোনসিং গ্রামে। পিতা জমিদার ছিলেন এবং তাঁহাদের বাড়ি ডেপুটি বাড়ি বলিয়া খ্যাত ছিল। পুলিনবাবু ঢাকা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করিতেন। ঢাকা শহরে অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল ৫০ নং ওয়ারী, ইহা সমিতির বাড়ি ছিল। ৫১ নং ওয়ারি ছিল জাতীয় বিদ্যালয়। ইহাও সমিতির কেন্দ্র ছিল। ক্রমে ক্রমে সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দক্ষিণ মৈশন্ডী 'ভূতের বাড়ি' ভাড়া করা হয়। এই ভূতের বাড়িতে অনুশীলন সমিতির আরেকটি কেন্দ্র ছিল। এখানে প্রায় ২০০ বাড়িঘর-ছাড়া সভ্য থাকিত, তাহাদের ব্যয়ভার সমিতি বহন করিত। এই 'ভূতের বাড়ি' সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল যে, এই বাড়িতে কেহ বাস করিতে পারিত না, ভূতের উপদ্রবে পলায়ন করিত। এজন্য এই বাড়িতে কোনো ভাড়াটিয়া আসিত

[১৪৪]. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ : আমাদের মুক্তিসংগ্রাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ১৮০।

না, বাড়ি খালি পড়িয়া থাকিত। এই বাড়িটি ছিল একটি প্রকাণ্ড বাড়ি। পুলিনবাবু এই বাড়িতে সমিতির বোর্ডিং স্থাপন করেন।

...দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, যাঁহারা বিবাহ বা সংসারধর্ম পালন করিবেন না, সমিতির জন্য সর্বক্ষণ কাজ করিবেন, এরূপ বাড়িঘর-ছাড়া কর্মীগণই (IPhole-tine worker) এখানে স্থান পাইতেন। এই কর্মীদিগকে অনুশীলনের আদর্শে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হইত। এখানে একটি বেশ বড় লাইব্রেরি ছিল, শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানে লাঠিখেলা ও ড্রিল শিক্ষা করিয়া কর্মীদিগকে মফস্‌সলে যাইয়া শাখা-সমিতির সভ্যদিগকে শিক্ষা দিতে হইত।

...দেশে অস্ত্র-আইন থাকায় সমিতির সভ্যগণ প্রকাশ্যে বন্দুকচালনা শিক্ষা করিতে পারিত না, গোপন ব্যবস্থা করিতে হইত। সমিতির সহানুভূতিশীল সভ্যদের মধ্যে যাহাদের বাড়িতে পাশ করা বন্দুক ছিল, তাহাদের বাড়ি যাইয়া বন্দুকচালনা অভ্যাস করিতে হইত। অনুশীলন সমিতির ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিলোনিয়া এবং উদয়পুর পাহাড়ের মধ্যে দুইটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। বিলোনিয়া কেন্দ্র কিছুদিন পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উদয়পুরই প্রধান কেন্দ্র ছিল। উদয়পুর কেন্দ্রের বাড়ি নোয়াখালী জিলার লামচর গ্রামের শ্রীযুক্ত দ্বারিকা রায় মহাশয়ের নামে ছিল। দ্বারিকবাবু পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আমি কালীচরণ চক্রবর্তী নামে দ্বারিকাবাবুর অংশীদার হিসেবে সময় সময় সেখানে থাকিতাম। বিক্রমপুরের ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী (বাগু) আমার ছোট ভাই হিসেবে স্থায়ীভাবে সেখানে থাকিত। দ্বারিক বাবু মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া থাকিতেন। দ্বারিকবাবুর নামে একটা পাশ করা দোনালা গাঁদা বন্দুক ছিল। বিনা পাশে বন্দুক-পিস্তলও সেখানে ছিল। একটা পাশ করা বন্দুক থাকিলে বিনা পাশে কতকগুলি বন্দুক রাখিতে অসুবিধা হয় না, বিশেষত নির্জন পাহাড়ের মধ্যে। আমাদের বাসস্থান উদয়পুর কালীবাড়ি হইতে অল্প দূরেই ছিল। তখন সেখানে লোকজনের বসতি খুব কম ছিল, কোনো ভদ্রলোকের বসতি ছিল, কয়েক ঘর মুসলিম কৃষক ছিল। উদয়পুর কুমিল্লা হইতে ৩২ মাইল দূর এবং পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইত। সেখানে সময় সময় হাতির উপদ্রব হইত, বাঘের উপদ্রবও ছিল।

...কুমিল্লা শহরে রমেশ ব্যানার্জীর বাড়ি আমাদের একটি আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। সমিতির যেসব সভ্য উদয়পুর শিক্ষাকেন্দ্রে যাইত, তাহারা প্রথমে রমেশ ব্যানার্জির বাড়িতে উঠিত। সাধারণত স্কুল-কলেজের ছাত্ররাই শিক্ষাকেন্দ্রে যাইত। সমিতির কাজে যাহারা পরীক্ষিত এরূপ সভ্যকেই উদয়পুর পাঠানো হইত। উদয়পুর যাত্রীরা সোনামোড়া পৌঁছিয়া রাস্তায় পোশাক পরিবর্তন করিয়া মজুর বেশে উদয়পুরে পৌঁছিত।

...সেখানে গিয়া পরিচয় দিত বাবুর দেশ হইতে আসিয়াছে। সেইখানে তাহাদের মজুর বেশেই থাকিতে হইত। উদয়পুরে আমাদের অনেক জমি ছিল এবং একটি কৃষি ফার্ম ছিল। আখের আবাদ খুব ভালো হইত। আমাদের ধানজমি মুসলিম বর্গাদার চাষ করিত। আখের চাষ নিজেরাই করিতাম। খাদ্যদ্রব্য বিশেষ কিছু পাওয়া যাইত না, শুধু ডালই ছিল সম্বল, তখন এক ডালভাতেই সকলে সন্তুষ্ট ছিল। বাগু মাঝে মাঝে কালীমন্দির হইতে পাঁঠার মাথা লইয়া আসিত, মোহন্তর সহিত তাহার ভাব ছিল। রন্ধনকার্য নিজেদেরই করিতে হইত।

...উদয়পুর শিক্ষাকেন্দ্রে অলসের কোনো স্থান ছিল না, সকলেরই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। দেশে তখন চা'র প্রচলন ছিল না, প্রাতে জাউভাত, পান্তাভাত বা চিড়া খাইয়া জমিতে কাজ করিতে হইত, দ্বিপ্রহরে স্নান-আহার ও বিশ্রামের পর বন্দুক লইয়া জঙ্গলে বাহির হইতে হইত এবং সন্ধ্যার পূর্বেই সকলকে বাসায় ফিরিতে হইত। রাত্রে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ, আলোচনা ও নিদ্রা। উদয়পুর পাহাড়ের গভীর অরণ্যে যেখানে লোকজনের বসতি ছিল, সেখানে সমিতির সভ্যরা বন্দুকচালনা শিক্ষা করিত। সেখানে রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। পাহাড় অঞ্চলে রাস্তা ঠিক করিয়া চলা খুবই কঠিন। জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয়, বিশেষত সাপের ভয় খুব ছিল। উদয়পুর কেন্দ্রে বন্দুক ও রিভলবার মেরামত হইত এবং বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা চলিত।

...১৯১২ সনে রমেশ ব্যানার্জী, ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী (বাগু), আদিত্য দত্ত, দেবেন্দ্র বণিক্য প্রভৃতি দশজন সভ্য কুমিল্লা শহরে ধৃত হয় এবং পরে তাহাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির ষড়যন্ত্র মামলা চালানো হয়। ওই মামলায় প্রত্যেকের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। বাগুর সহিত ডাকাতির কোনো সম্বন্ধ ছিল না, পূর্বদিন সে উদয়পুর হইতে কুমিল্লা আসিয়াছিল, বাগু রাত্রে যে বাসায় শুইয়াছিল সেই বাসা ঘেরাও করিয়া সকলকে গ্রেপ্তার করে। ওই সময় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী প্রিয়নাথ তাহার স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিল, উদয়পুর পাহাড়ে অনুশীলন সমিতির একটি গুপ্ত কেন্দ্র আছে এবং কালীচরণ সেখানে থাকে। তখন কালীচরণের (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী) নামে ওয়ারেন্ট ছিল এবং পুরস্কার ঘোষণা ছিল। আমরা পূর্বেই আভাস পাইয়া উদয়পুর কেন্দ্র পরিত্যাগ করিলাম। ইহার কিছুদিন পরই পুলিশ সদলবলে সেখানে উপস্থিত হয়। তাহারা সেখানে যাইয়া দেখিল সব শূন্য খাঁচা পড়িয়া আছে, পাখি নাই। ইহার পর ব্রিটিশ পুলিশ তিন বৎসর সমানে বোমার কারখানা ও বন্দুকের কারখানার অনুসন্ধানে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গল তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করে, কিন্তু কোথাও কোনো সন্ধান পায় নাই।

...অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্রের অধীনে জিলা-সমিতি, মহকুমা সমিতি, পরগনা সমিতি ও গ্রাম্য সমিতি ছিল। প্রত্যেক সমিতির একজন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক থাকিত। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ করা হইত। সমিতির সভ্যদিগকে প্রত্যহ বৈকালে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও ড্রিল শিক্ষা করিতে হইত। খেলার মাঠে নামডাকা হইত এবং অনুপস্থিত সভ্যদিগকে কারণ দর্শাইতে হইত। যে-সকল সভ্য বহুদিন অনুপস্থিত থাকিত এবং সমিতির কাজে যাহাদের কোনো নিষ্ঠা থাকিত না, তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইত, সমিতির সাধারণ সভ্যদিগের মধ্য হইতে যাহাদিগকে কর্মঠ, চরিত্রবান, সাহসী ও দেশপ্রেমিক বলিয়া মনে হইত তাহাদিগকে আদ্য প্রতিজ্ঞা করানো হইত।'[১৪৫]

রমনা ও সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য প্রতিজ্ঞা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী আরও লেখেন :

'আদ্য প্রতিজ্ঞা : আমি এই সমিতি হইতে কখনো বিচ্ছিন্ন হইব না, আমি আমার চরিত্র সর্বদা নির্মল ও পবিত্র রাখিব। আমি সকল সময়ই সমিতির বিধিনিষেধ মানিয়া চলিব। আমি সমিতির কর্তৃপক্ষের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব। আমি আমার নেতার নিকট কোনো বিষয় গোপন করিব না এবং মিথ্যা বলিব না।

...এইসব সভ্যের মধ্য হইতে আবার বাছাই করিয়া যাহাদিগকে বিপ্লবী দলের উপযুক্ত বলিয়া মনে হইত, তাহাদিগকে মধ্য প্রতিজ্ঞা করানো হইত।

...মধ্য প্রতিজ্ঞা : আমি সমিতির অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে অযথা আলোচনা বা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আমি পরিচালকের নির্দেশ ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইব না। যদি কোনো সময় সমিতির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হই, তাহা হইলে অবিলম্বে পরিচালককে জানাইব এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব। আমি যেকোনো অবস্থায়, যেকোনো সময়ে পরিচালকের নির্দেশ পালন করিব।

আবার এইসব সভ্যের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া অন্ত্য প্রতিজ্ঞা করানো হইত।

অন্ত্য প্রতিজ্ঞা : আমি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইহার বেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর স্নেহ, গৃহের মোহ সমস্ত ত্যাগ করিব। আবার এইসব সভ্যের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞা করানো হইত।

বিশেষ প্রতিজ্ঞা : আমার জীবন ও ঐহিকের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে আমি সমিতির প্রসারের কার্যে আত্মনিয়োগ করিব। সমিতির কোনো গোপন বিষয়

---

১৪৫. মহারাজ ত্রৈলোকনাথ ও জেলে ত্রিশ বছর।

লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিব না, অথবা আমার বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিব না। ইহা ছাড়া কোনো বিষয়ে সমিতির কোনো সভ্যের নিকট কোনো প্রকার অযথা প্রশ্ন করিব না।

...প্রতিজ্ঞাকরণের সময় সাধারণত কোনো দেবী মন্দিরে লইয়া গিয়া দেবীর সম্মুখে দীক্ষা দেওয়া হইত। পুলিনবাবু পি. মিত্রের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণ-প্রণালি এইরূপ ছিল—পূর্বদিন এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া সংযমী হইয়া, পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। দেবীর সম্মুখে ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য সাজাইয়া, বৈদিকমন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইত। পরে প্রত্যালীঢ় আসনে বসিয়া (বাম হাঁটু গাড়িয়া শিকারোদ্যত সিংহের প্রতীক) মস্তকে গীতা স্থাপন করা হইত। গুরু শিষ্যের মস্তকে অসি রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শিষ্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে দুই হাতে প্রতিজ্ঞাপত্র ধরিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিতেন। আমি বাহা ডাকাতির পূর্বে, পুলিনবাবুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি।

...পুলিনবাবু ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগকে রমনা-সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে বা বুড়া শিবের মন্দিরে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষা গ্রহণের পর প্রত্যেক সভ্যকে দুধ, ঘি, চিনিমিশ্রিত এক গ্লাস শরবত পান করিতে দেওয়া হইত। আদ্য প্রতিজ্ঞার সভ্যগণ প্রাথমিক সভ্য এবং বিশেষ প্রতিজ্ঞার সভ্যগণ পূর্ণ সভ্য (full-fledged innerber) বলিয়া গণ্য হইত। কেহ ইচ্ছা করিলেই যখন খুশি অনুশীলন সমিতির সভ্য হইতে পারিত না। আবার যখন ইচ্ছা দল ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। অনুশীলন সমিতির নিয়মাবলিতে ছিল, কেহ দলত্যাগ করিলে সমিতির সম্পর্কে তাহার জ্ঞান নষ্ট (Knowledge destroy) করিতে হইবে, অর্থাৎ দলত্যাগ করিয়া পাছে সে দলের অনিষ্ট করে বা গুপ্ত খবর প্রকাশ করে এজন্য তাহাকে সরাইয়া দেওয়া হইবে। অবশ্যই অনুমতি লইয়া গৃহী সভ্য হিসেবে থাকিতে পারিত। আমরা ১৯১২ সনের পর প্রতিজ্ঞা উঠাইয়া দিই। প্রতিজ্ঞাপত্রগুলি গভর্নমেন্ট ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলার দলিল হিসেবে ব্যবহার করিয়াছিল।

...স্বদেশি আন্দোলন যখন প্রবল বেগে চলিতে লাগিল, গ্রামে গ্রামে লাঠিখেলা ও সামরিক ড্রিল শিক্ষা, কৃত্রিম যুদ্ধ ব্যাপক হইয়া উঠিল, তখন গভর্নমেন্ট ১৯০৮ সনের নভেম্বর মাসে শ্রী অশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধ মল্লিক, মানোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জীকে তিন আইনে গ্রেফতার করিয়া বিভিন্ন জেলে আটক রাখিলেন।

...গভর্নমেন্ট ১৯০৯ সনের জানুয়ারি মাসে অনুশীলন সমিতি (ঢাকা), স্বদেশ বান্ধব সমিতি (বরিশাল), ব্রতী সমিতি (ফরিদপুর), সুহৃদ সমিতি

(ময়মনসিংহ), সাধনা সমিতি (ময়মনসিংহ), বেআইনি ঘোষণা করিলেন। ...প্রকাশ্য সমিতি গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হইল।

...অনুশীলন সমিতির কাজ কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পি. মিত্র ও বারীন বাবুর সহিত কর্মপন্থা লইয়া মতভেদ ঘটে। বারীন বাবু প্রভৃতি একদল যুবক হিংসাত্মক কাজকর্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু প্রবীণ নেতা মিত্র মহাশয় গঠনমূলক কাজের ওপর জোর দেন। ফলে অনুশীলন সমিতির মধ্যে ভাঙন ঘটে, বারীন বাবুর দল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈয়ার ও হিংসাত্মক কাজে মনোনিবেশ করেন। এই দলের মুখপত্র ছিল 'যুগান্তর'। ১৯০৬ সনের ১৮ মার্চ *যুগান্তর* পত্রিকা বাহির হয়। *যুগান্তর*-এর সম্পাদক ছিলেন ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। লেখকদিগের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কিরণচন্দ্র মুখার্জি প্রভৃতি ছিলেন। ওই সময় *যুগান্তর*-এর লেখনী হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। *যুগান্তর* পত্রিকা ওই সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। গভর্নমেন্ট *যুগান্তর* পত্রিকা প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেন, কিন্তু *যুগান্তর* বন্ধ হইল না, গোপনে বাহির হইতে লাগিল, সকল দলের লোকই *যুগান্তর* পত্রিকা নিজের মতো মনে করিয়া প্রচার করিত।'[১৪৬]

চিনিশপুরের হিন্দু মেলা : পাঁঠাবলি ও মুসলিমবিরোধী কুচকাওয়াজ

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত হওয়ার স্মৃতি রোমন্থন করে লিখেছেন :

'একদিন শনিবার বৈকালে সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ঢাকা হইতে একজন ভদ্রলোক আসিলেন। তাঁহার বাড়ী সাটিরপাড়ারই নিকট এবং তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র বরদাকান্ত দেব মহাশয়ের পরিচিত। বরদাবাবুকে তিনি বলিলেন যে সাটিরপাড়ায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করিতে হইবে। বরদাবাবু আমাকে ডাকিয়া আমার মত জিজ্ঞাসা করিলে আমি সম্মত হইলাম। আগন্তুক ভদ্রলোকটি তখন বরদাবাবু ও আমাকে সমিতির প্রতিজ্ঞা করাইলেন এবং সামান্যকিছু লাঠিখেলা শিক্ষা দিলেন। পরদিন যাত্রাকালে তিনি সমিতির নিয়মাবলি ও প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, আমরা যেন সর্বদা মনে করি আমাদের জীবন দেশের জন্য। প্রতিজ্ঞাগুলি ছিল অতি সাধারণ, যেমন :

১. আমি কখনো এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।

২. সর্বদা আমি আমার চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিব।

৩. নেতার আদেশ আমি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব।

---

[১৪৬]. মহারাজ ত্রৈলোকনাথ : জেলে ত্রিশ বছর, পৃষ্ঠা ১২-২০।

আমার গুরুদেবের বিদায়কালীন বাণী আমি সর্বদা মনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি—প্রতিজ্ঞাগুলিও পালন করিয়াছি। কিন্তু আমার গুরুদেব তাঁহার নিজের জীবনে তাহা পালন করেন নাই—কিছুদিন পর বিবাহ করিয়া তিনি অর্থোপার্জন করিতে আরম্ভ করেন এবং শেষ বয়সে অসুখে ভুগিয়া মারা যান।

...বরদাবাবু ও আমি ১৯০৬ সনে সাটিরপাড়াতে প্রথম অনুশীলন সমিতির সভ্য হইলাম। অতঃপর আমাদের মধ্যে কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে হইল। বরদাবাবু আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। অগত্যা আমাকেই সম্পাদক হইতে হইল, বরদাবাবু হইলেন সহকারী সম্পাদক। বরদাবাবু ও আমার চেষ্টায় সাটিরপাড়ায় সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার পর আমরা বিভিন্ন গ্রামে যাইয়াও শাখা-সমিতি স্থাপন করিতে লাগিলাম। কাহারও অসুখ হইলে আমরা যাইয়া সেবা করিতাম, গ্রামে চোরের উপদ্রব হইলে রাত্রে আমরা পাহারা দিতাম। মেলার সময় জলসত্র খুলিতাম, যাত্রীদের সাহায্য করিতাম ও শান্তিরক্ষা করিতাম। ক্রমে সাটিরপাড়াতে ফুটবল খেলা বন্ধ হইয়া গেল, তাহার পরিবর্তে আরম্ভ হইল লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ডন কুস্তি ও ড্রিল শিক্ষা। প্রথমে সমিতির বোর্ডিং হইতে লোক আসিয়া আমাকে শিখাইয়া যাইত। পরে আমি সকলকে শিক্ষা দিতাম। পুলিনবাবু দুই একবার সাটিরপাড়া আসিয়া শাখা-সমিতি পরিদর্শন করিয়া যান।

...এক চৈত্র সংক্রান্তিতে সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালীবাড়িতে মেলা বসিয়াছে। মেলাটি তিন দিন থাকিবে। আমরা মেলায় জলসত্র খুলিয়াছি। নিজেরাই কলসে করিয়া জল আনিয়া বড় বড় মাটির জালা পূর্ণ করিয়া রাখিতাম। জল আনিবার সময় যাহাতে অপর কেহ স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য সকলকে রাস্তা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ জানাইতাম। কারণ আমরা না মানিলেও সমাজে অস্পৃশ্যতা দোষ তখনও প্রবল ছিল, স্পর্শদোষ হইলে অনেকে আমাদের জল পান করিয়া জাতি নষ্ট করিতে রাজি হইবে না...!

...সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালীবাড়ি অবস্থিত। ইহা প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। সম্ভবত বৈশাখ মাসে কোনো এক তিথিতে (অমাবস্যা), সেখানে হাজার হাজার লোক পূজা দিতে আসে। এই পূজায় চার-পাঁচশ পাঁঠা এবং পাঁচ-সাতটা মহিষ বলি পড়ে। একবার গুজব রটিল যে, এই পূজার দিন মুসলমানেরা কালীবাড়িটি আক্রমণ করিবে। আমি মফস্সল সমিতির সম্পাদকগণকে সংবাদ দিলাম, সেইদিন প্রাতে লাঠিসহ সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। প্রায় পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক ওই দিন উপস্থিত হইল। প্রথমে তাহাদিগকে কুচকাওয়াজ করাইলাম, পরে যাত্রীদের সুবিধার জন্য তাহাদের নানা কাজে বিভক্ত করিয়া দিলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই এবং যাত্রীরা সকলে বিদায় হইলে আমরাও প্রত্যাবর্তন করিলাম।

...সাটিরপাড়া ছিল মফস্‌সল সমিতির একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে প্রায় দেড় শত সভ্য ছিল। এই কেন্দ্রের অধীনে পঞ্চাশটি শাখা সমিতি ছিল। আমরাই গ্রামে-গ্রামে যাইয়া ওই সকল শাখা-সমিতি স্থাপন করি।'[১৪৭]

'স্বদেশি'দের বোমাবাজি, সিন্দুক ভাঙা ও খুনখারাবি

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর বিবরণ থেকে 'স্বদেশি' সন্ত্রাসীদের সংগঠন অনুশীলন সমিতির অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উৎস, তাদের বোমাবাজি, ডাকাতি ও খুনখারাবির অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তার থেকে দু-একটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

'স্বদেশি আন্দোলনের প্রথমদিকে ফরাসি চন্দননগরে অস্ত্র আইন ছিল, সেখান হইতে অস্ত্র সংগ্রহ সহজ ছিল, অবশ্যই পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ফিরিঙ্গিদিগের নিকট হইতে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছে। বিপ্লবীদিগের বন্দুক-পিস্তল আমদানি হইয়াছে বিদেশ হইতে, বিদেশগামী জাহাজের মারফত। দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতেও কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। আবার দেশেও বন্দুক-পিস্তল তৈয়ারের চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই।

...তখন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদিগের বন্দুক-পিস্তল ক্রয় করার লাইসেন্সের প্রয়োজন হইত না, তাহারা বিনা লাইসেন্সেই ক্রয় করিতে পারিতেন। আমাদের কাপাসাটিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার রায় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে ১৯১০ সনের কথা, আমি তখন পলাতক ছিলাম। কৃষ্ণকুমার রায় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের নামে কলকাতার এক বন্দুক-বিক্রেতা সাহেব কোম্পানির ঠিকানায় একটি মশার পিস্তল ও দুইশত কার্তুজের অর্ডার গেল। ঠিকানা দেওয়া হইল ঢাকার একটি বাসার। এ ঠিকানায় মাল পাঠানোর সংবাদ (intimation) আসিল। মাল আনিতে হইবে সদর পোস্ট অফিস হইতে, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের নিজের। আমাদের একজন সভ্য, আড়াই হাজারের জনৈক জমিদারপুত্র ধীরেন্দ্র চৌধুরী অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণকুমার রায় সাজিয়া, একখানা ভালো ঘোড়ার গাড়িতে মাল খালাসের জন্য সদর পোস্ট অফিসে গেলেন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী দূর হইতে গতিবিধি লক্ষ করিতেছিলেন, কোনো গুপ্তচর পেছন লইয়াছে কি না। ধীরেন্দ্র চৌধুরী অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট 'কৃষ্ণকুমার রায়' নাম দস্তখত করিয়া নিরাপদে মাল লইয়া আসিল, মাল সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ স্থানে চলিয়া গেল। ইহার পর যখন পিস্তলের অনুসন্ধান হইল, তখন পুলিশ জানিল, কৃষ্ণকুমার রায় ইহার কিছুই জানেন না, নাম দস্তখতও তাঁহার নয়। পুলিশ বুঝিয়া ফেলিল ইহা ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগের

---

১৪৭. মহারাজ ত্রৈলোকনাথ ও জেলে ত্রিশ বছর।

কাণ্ড। তখন মশার পিস্তল বা কার্তুজের সন্ধানে বহু বাড়ি তল্লাশি হইল কিন্তু মশার পিস্তল বা কার্তুজের কোনো সন্ধান পাইল না। এরূপভাবেও কিছু পিস্তল আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

...বিপ্লবীদের কয়েকটি বোমার কারখানা ছিল, তন্মধ্যে চন্দননগরের বোমার কারখানাই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই চন্দননগরের বোমা দিল্লিতে বড়লাটের ওপর পড়িয়াছিল, লাহোর হইতে মৌলভীবাজার (শ্রীহট্ট) পর্যন্ত বহু স্থানে এই একই জাতীয় বোমা ব্যবহৃত হইয়াছিল...।'[১৪৮]

'...বিপ্লবী দল চালাইতে, সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিতে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এখন এই টাকা আসিবে কোথা হইতে? স্বদেশি আন্দোলনের প্রথমদিকে বিপ্লবী দলের নেতারা কোনো কোনো বড়লোকের নিকট হইতে বিপ্লবের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন, কিন্তু আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলার পর ১৯০৮ সনে, নরেন গোস্বামির স্বীকারোক্তির ফলে, আর কোনো বড়লোক অর্থ সাহায্য করিতে সাহসী হইতেন না। সুতরাং বিপ্লবীদিগকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে অপর পথ গ্রহণ করিতে হইত, তাহা আবেদনের নয় আদায়ের পথ। এই কাড়িয়া লওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি এই, ইহা দ্বারা বিপ্লবীদিগের সামরিক শিক্ষা হইবে। তাহারা ডাকাতি করার সময় চোরের মতো কিছু করে নাই, বীরের মতোই সাড়ম্বরে ডাকাতি করিয়াছে। ডাকাতি বা action-এর সময় একজন নেতা থাকিতেন। তিনি সেই দলের অধিনায়ক, সকলে তাহার নির্দেশ অনুসারে চলিবে। তিনি সকলের নিরাপত্তার জন্য অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকিতেন। তিনি এই দলটিকে কয়েকটি উপদলে ভাগ করিয়া বিভিন্ন কাজের ভার দিতেন। প্রত্যেক উপদলের একজন নেতা থাকিতেন। এই উপদলের মধ্যে থাকিত ১. রক্ষীদল, ২. মশাল দল, ৩. সিন্ধুক ভাঙা দল, ৪. অর্থ সংগ্রহ দল...।'[১৪৯]

'...আমরা যাহাকে হত্যা করিয়াছি, সে চলিয়াছে আপন মনে, কত কিছু সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, একমুহূর্ত পূর্বেও সে কল্পনা করে নাই মৃত্যু তাহার নিকটবর্তী। হঠাৎ পিস্তল গর্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে দেশদ্রোহী ধরাশায়ী, তাহার প্রহরী ভীত-কম্পিত পলায়মান। প্রহরীর পিস্তল বাহির করার কথা স্মরণ নাই। আমি যাহাকে হত্যা করিয়াছি, প্রথমগুলির সঙ্গে সঙ্গে আততায়ী ধরাশায়ী হওয়ার পর আবার গুলি করিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছি, সে যাহাতে কষ্ট না পায়। কয়েক সেকেন্ডের কাজ, নিহত ব্যক্তি টেরই পাইল না কী ঘটিয়া গেল। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল, হত্যাকারীও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া দৌড়াইতে লাগিল, পরে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া পিস্তল

---

১৪৮. মহারাজ ত্রৈলোকনাথ : জেলে ত্রিশ বছর, পৃষ্ঠা ৪০-৪১।

১৪৯. মহারাজ ত্রৈলোকনাথ : জেলে ত্রিশ বছর, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

রাখিল। পিস্তল সেই রাত্রেই সেই স্থান হইতে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে চলিয়া গেল। হত্যাকারী ভালো মানুষ সাজিয়া, শহরের সকলের সহিত মিশিয়া, হত্যাকাণ্ডের গল্পগুজব শুনিতে লাগিল। দিল্লিতে বড়লাটের ওপর বোমা পড়ার পর রাসবিহারী বসু দেরাদুনে প্রকাশ্য সভা করিয়াছিলেন, তিনিই ছিলেন সেই সভার সভাপতি এবং সেই সভায় হত্যার চেষ্টার জন্য নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল। কাহাকেও হত্যা করার সময় সাধারণত আক্রমণকারীর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করার জন্য দুইজন পিস্তলধারী লোক থাকিত।

...বিপ্লবীরা নিজ দলের লোককেও হত্যা করিয়াছে। চরিত্রহীনতার জন্য কেহ কেহ নিহত হইয়াছে, আবার যাহাদিগকে পুলিশের গুপ্তচর বলিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হইয়া কাহাকেও হত্যা করা হয় নাই। কাহারও ওপর সন্দেহ হইলে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তাহার পেছনে লোক লাগানো হইত। পুলিশের গুপ্তচর প্রমাণ হইলে তাহাকে গুম করা হইত অর্থাৎ কোনো নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া হত্যা করা হইত।

...আমি পরাধীন ভারতে বহু ডাকাতি করিয়াছি, খুন করিয়াছি, চুরি করিয়াছি, নোট জাল করিয়াছি, কিন্তু যাহা কিছু করিয়াছি, সবই দেশের স্বাধীনতার জন্য—কর্তব্যের দায়ে। আমরা বিদ্বেষ ভাব হইতে বা ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য কিছুই করি নাই। আমি যাহাকে হত্যা করিয়াছি, তাহার আত্মার কল্যাণ কামনাই করিয়াছি, তাহার পরিবারের শুভ চিন্তাই করিয়াছি...।'[১৫০]

এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন সহিংস কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক. ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের লে. গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা।

খ. পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর স্যার ফ্রেজারকে বোমা মেরে হত্যার চেষ্টা।

গ. কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা।

হিন্দুদের সম্পাদিত পত্রপত্রিকাগুলি এ সময় মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগের চাইতে আরও উগ্রভাবে হামলা চালাতে থাকে। ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থিরা বাংলা বিভাগ প্রশ্নে নরমপন্থিদের সাথে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। হিন্দু ধর্মরাজ্যে বিশ্বাসী মারাঠা ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে মারামারি হয়।

---

১৫০. মহারাজ ত্রৈলোকনাথ : জেলে ত্রিশ বছর, পৃষ্ঠা ১২-২০।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'স্বদেশি' সন্ত্রাস ও 'ক্ষুদ দিয়ে কেনা ক্ষুদিরাম'

কে এই ক্ষুদিরাম!

ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ বানচালের লক্ষ্যে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা। এজন্য সন্ত্রাসী নেতারা দুই কিশোরকে নিয়োজিত করে। তারা কিংসফোর্ড মনে করে বোমা নিক্ষেপ করে দুই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার ওপর। দুই শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে খুন করে পালাতে চেয়েছিল প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু। প্রফুল্ল চাকি গ্রেফতার এড়াতে সায়ানাইড পানে আত্মহত্যা করে। ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হয় এবং বিচারে তার ফাঁসি হয়।

এই ক্ষুদিরামকে তুলে ধরা হয় বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের একজন 'হিরো'রূপে। তার ফাঁসিকে ঘিরে বর্ণহিন্দুরা কবিতা ও গান দিয়ে সারা বাংলায় একধরনের উন্মাদনা সৃষ্টি করে। তার নামে গ্রাম ও শহরে যাত্রাপালা শুরু হয়। ক্ষুদিরামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গাওয়া হয় : '...হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী।'

ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে ঝোলার ছবিসংবলিত ক্যালেন্ডার শোভা পায় ঘরে ঘরে। কে ছিল এই ক্ষুদিরাম?

ক্ষুদিরামের জন্ম হয় ১৮৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর মেদিনিপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে। পরপর দুই সন্তানের মৃত্যুর পর জন্মের কারণে তৎকালীন হিন্দু সমাজের সংস্কার অনুযায়ী মা নবজাতক সন্তানকে তিন মুঠ ক্ষুদের বিনিময়ে বেচে দেন। সেই থেকে তার নাম হয় ক্ষুদিরাম। সাত বছর বয়সে বাবা ত্রৈলোক্যনাথ বসু আর তার ছয় মাস পর মা লক্ষ্মীপ্রিয়া মারা গেলে বিড়ম্বনা আর গঞ্জনার মধ্যে শৈশব কাটে ক্ষুদিরামের। পাতানো ভাই আর ভাইপত্নী বিনা পয়সার চাকর হিসেবে তাকে যথেষ্ট খাটাত। সেই ক্ষোভ নিয়ে বেড়ে ওঠা কিশোর ক্ষুদিরাম গালাগাল, মারধর আর নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম সইতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বোন অপরূপার কাছে আশ্রয় নেয়। ভগ্নিপতি অমৃতলাল তাকে মেদেনিপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করান। কিন্তু ক্ষুদিরামের উড়নচণ্ডী স্বভাব স্কুলে লেখাপড়ার সাথে তাল মেলাতে পারল না। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াকালেই সন্ত্রাসবাদীদের খপ্পরে পড়ে যায় এই কিশোর।

ভবানীমন্দিরে ক্ষুদিরামের দীক্ষা

মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'ইতিমধ্যে মেদিনিপুরে ১৯০২ সালেই বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-প্রতিষ্ঠান ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারও আগে সত্যেন বসু করেছিলেন Secret Society। এ সত্যেন বাবুই ক্ষুদিরামকে তার কাছে টেনে নিলেন। ভবানীমন্দিরের কাজে সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে পড়লেন ক্ষুদিরাম। অরবিন্দই যতীন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন সারা ভারতবর্ষে ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠার। যতীন্দ্রনাথ আন্দোলনের সদস্যদের ধর্মের নামে তরবারি ছুঁয়ে দীক্ষা দানের রেওয়াজ চালু করেন। এটা যারা মানবে তারাই দেশমাতৃকার সেবক বলে পরিচিত হবে। ১৯০৩ সালে কিশোর ক্ষুদিরাম শপথ নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করলেন মেদিনিপুরে সত্যেন বসুরই নির্দেশনায়। চৌদ্দ বছরের বালক ক্ষুদিরাম কী জানি কোন দুঃখে কিংবা মনের আবেগে বা দুর্বার আকর্ষণে দীক্ষিত হলেন গুপ্ত সমিতিতে। তরবারি স্পর্শ করে বললেন : "শপথ নিলাম, আমি শ্রীভগবানের নামে এই তরবারি স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, আমার দেশের শৃঙ্খল মোচনের দায়িত্বে আমার নেতৃবৃন্দের নির্দেশে আমি প্রয়োজনবোধে আমার জীবনকেও বলিদান করিতে দ্বিধা করিব না..."।'[১৫১]

কালীর কৃপায় পাঁঠা খাওয়া মেদিনিপুর

তখনকার স্বদেশি সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতির অন্যতম কেন্দ্র মেদিনিপুরের চিত্র তুলে ধরে সানাউল্লাহ আখুঞ্জী লিখেছেন :

'শহরের পাড়ায় পাড়ায় লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা, ডন বৈঠক, রামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী, বিবেকানন্দ উৎসব, দরিদ্র নারায়ণ সেবা ইত্যাদির অনুষ্ঠান চলত। সত্যেন বসুর বাড়ির পাশে গুপ্ত সমিতির চক্র ও কালীমন্দির ছিল। সে সময় হিন্দুবাংলা যেন অসাধারণ কালীভক্ত হয়ে উঠল। কালীমাতার সামনে সাদা পাঁঠা বলি দেওয়া একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অকস্মাৎ কালীমূর্তি স্থাপনের এই জোয়ার দেখে এর কারণ জানতে চাইলে সত্যেন বাবু জবাব দিতেন, "সকলেই এরকম কিছু একটা চায়।" কিশোর ক্ষুদিরামের মুখরোচক জবাব : "আর যা-ই হোক, কালির কৃপায় পাঁঠা খাওয়া যায়, আর পাঁঠার লোভে ভক্তও জোটে।"

...বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে এসব গুপ্ত সমিতি মুখ্য ভূমিকা পালন করে, বাংলায় যার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তারই সৃষ্ট সাহিত্য অনুপ্রেরণায় বাঙালি হিন্দুদের তেজোদীপ্ত করার জন্য স্বদেশি আন্দোলনে ভবানীমন্দির, কালীমূর্তি স্থাপন ও পাঁঠা বলি দেওয়ার ধুম পড়ে যায়।'[১৫২]

---

১৫১. মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী : ক্ষুদ দিয়ে কেনা ক্ষুদিরাম, উপমা ডাইজেস্ট, ডিসেম্বর ১৯৯১।

১৫২. মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী : ক্ষুদ দিয়ে কেনা ক্ষুদিরাম, উপমা ডাইজেস্ট, ডিসেম্বর ১৯৯১।

ক্ষুদিরাম সম্পর্কে অতিকথন ও একটি মূল্যায়ন

ক্ষুদিরামকে বাংলাদেশে একজন 'হিরো' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে। সে প্রচেষ্টা আজও থেমে যায়নি। এ প্রসঙ্গে ওসমান গনী লিখেছেন :

'বর্তমান শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে আমাদের প্রতিবেশী সমাজ ক্ষুদিরামকে কেন্দ্র করে যে মতলবি কল্পকাহিনি গড়ে তুলেছিল, এ দেশের অনেকেই তা এখনো বোধ হয় সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করেন। ক্ষুদিরাম একজন বিপ্লবী দেশপ্রেমিক ছিলেন, ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক ছিলেন, বড় লাটকে (মতান্তরে ছোট লাটকে) খুন করার জন্য চলন্ত ট্রেনের কামরায় বোমা মেরেছিলেন, কিন্তু তাতে আসলে একজন ভারতবাসী (মতান্তরে ইংল্যান্ডবাসী) মারা যায়, তিনি ধরা পড়েন, তাঁর ফাঁসি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই হচ্ছে সেই মতলবি কল্পকাহিনির মূল কথা। এই কিংবদন্তি সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে প্রধানত একটি গানের কারণে। "একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি"—গানটি বোধ হয় অনেকেই শুনেছেন। এই সেদিনও ঢাকার মগবাজারে রিকশায় যাওয়ার সময় শুনতে পেলাম চায়ের দোকানের ক্যাসেটে গানটি বাজছে। বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক, ইংরেজের দড়িতে ফাঁসি এইসব বিশেষণ স্বভাবতই সকলের মনে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে। ফলে ক্ষুদিরাম অতি সহজেই 'শহিদ' খেতাবে ভূষিত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেই লোকটি আসলে কে ছিলেন? তার কার্যকলাপ কী ছিল?

...রাজধানী কলকাতাকেন্দ্রিক অবিভক্ত বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণ নানাভাবে নির্মম বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। শিক্ষাদীক্ষা, ব্যাবসাবাণিজ্য, চাকরিবাকরি, চিকিৎসা-যোগাযোগ প্রভৃতি কোনো ব্যাপারেই তারা কোনো সুযোগ-সুবিধা পেত না। অথচ প্রদেশের সরকারি রাজস্বের অধিকাংশই জোগাত তারা। ...ধান-পাট, মাছ-ডাল, চা-কমলা, বেত-কাঠ প্রভৃতি কাঁচামাল এবং বেহারা-খানসামা, দারোয়ান-চৌকিদার প্রভৃতি চাকর-বাকর সস্তায় সরবরাহকারী এই সমৃদ্ধ এলাকাটিকে তারা কলকাতার অভিজাত হিন্দু সমাজের তাঁবেদারি থেকে মুক্ত করতে চাইলেন না। তখন অধিকাংশ হিন্দু জমিদার বাস করতেন কলকাতায় এবং তাদের জমিদারি ছিল পূর্ববঙ্গে। সুতরাং তারাও তাদের সহজ যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। শুরু হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন।

...মুসলিম স্বার্থবিরোধী এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যেদিন ওই নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারি ফরমান জারি হয় (১৬ অক্টোবর) সেইদিন কলকাতায় শোকদিবস পালন করা হয়। কলকাতা টাউন হলে কাশিমবাজার মহারাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ

সভায় বাংলা 'মা'-কে কোনোমতেই দ্বিখণ্ডিত করতে দেওয়া হবে না বলে শপথ গ্রহণ করা হয় এবং 'মায়ের অঙ্গহানি' প্রতিরোধের জন্য তার সন্তানদের প্রতি মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আন্দোলনের অংশ হিসেবে কালীঘাটের কালীমন্দিরে পূজা দেওয়া, রাখিবন্ধন, অরন্ধন বা নির্জলা উপবাস প্রভৃতি হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। প্রভাতফেরি অর্থাৎ স্নান করে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে খালি পায়ে গঙ্গাযাত্রার জন্য যে বিরাট মিছিল করা হয় তাতে নেতৃত্ব দেন খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বর্গি অর্থাৎ মারাঠাদের জুলুম-জবরদস্তি, লুটতরাজ ও নারী-নির্যাতনের সেই বিভীষিকা তখনও বাংলার মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও সেই মারাঠাদের নেতা, মোগলসম্রাট জিন্দাপির আলমগির আওরঙ্গজেব যাকে 'পার্বত্য মূষিক' বলে অভিহিত করতেন, সেই শিবাজির নামে কলকাতায় 'শিবাজি-উৎসব' চালু করা হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিবাজি-উৎসব' কবিতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই নির্ভেজাল হিন্দুধর্মীয় উন্মাদনাকে 'বাঙালির নবজাগরণ' এবং 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ' বলে প্রচার করা হয়।

...আন্দোলন যখন ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায় তখন তা দমন করার জন্য সরকার ধরপাকড় শুরু করেন। ফলে আন্দোলনকারীদের একটি অংশ গোপন সংগঠন গঠন করে গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদ শুরু করে দেয়। অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তর পার্টি নামে এইরূপ দুইটি সন্ত্রাসবাদী দল গঠিত হয়। ক্ষুদিরাম স্কুলের শেষ ধাপে পৌঁছানোর আগেই যুগান্তর পার্টিতে জড়িয়ে পড়েন। সন্ত্রাসবাদীগণ চুরি-ডাকাতি, ডাক বিভাগের মেল ব্যাগ লুট প্রভৃতি অপকর্মের মারফত দলের খরচ সংগ্রহ করত। এই কারণে সাধারণ মানুষের কাছে তারা 'স্বদেশি ডাকাত' নামে পরিচিত ছিল। ক্ষুদিরাম প্রথমে এই ডাকাত দলের সদস্য হিসেবে হাত পাকান। একবার দলীয় গোপন পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বেচতে গিয়ে পুলিশে ধাওয়া করলে ইট মেরে একজন পুলিশের মাথা ফাটিয়ে দেন। আদালত নাবালক বলে তাকে বিনা সাজায় ছেড়ে দেন। হাত পাকা হলে কিছুদিন পর ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মি. কিংসফোর্ডকে খুন করার জন্য তাকে মুজাফফরপুর পাঠানো হয়। সেখানে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসা একখানি গাড়ির ওপরে তিনি বোমা মারেন। ফলে গাড়িতে থাকা মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা নিহত হন। স্পষ্টতই মি. কিংসফোর্ড তখন অন্যত্র ছিলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং আদালতের রায় মোতাবেক ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়।

...এই কাহিনিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ, দেশপ্রেমিক বিপ্লবী বীর, অগ্নিযুগের সূর্যসন্তান এসব কথা বলার সুযোগ কোথায়? অথচ তা-ই বলা হয়ে থাকে। ওই 'ক্ষুদিরাম' যা করেছিলেন তা হচ্ছে মুসলিম স্বার্থের

বিরোধিতা এবং সেই কাজের অংশ হিসেবে করেছিলেন জঘন্যতম অপরাধ নারীহত্যা। ওই যে গানের কথা বলেছি তার এক জায়গায় আছে—'বড় লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম ইংল্যান্ডবাসী।' কোথায় বড় লাট লর্ড কার্জন, কোথায় একজন সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড, আর কোথায় অসহায় নিরপরাধ নারী মিসেস ও মিস কেনেডি। কিন্তু কাউকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে হিরো বানাতে হলে বোধ হয় এমন মিথ্যাচারেরই আশ্রয় নিতে হয়।

...উল্লেখযোগ্য যে, ওই আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে পূর্ববঙ্গের নতুন প্রদেশ উঠে যায় এবং রাজধানী ঢাকা থেকে আবার কলকাতায় ফিরে যায়। অনেকদিন পরে ১৯৪৭ সালে বাংলা আবার ভাগ হয় এবং রাজধানী ঢাকায় আসে। সেই এলাকা এখন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। অথচ ঢাকার মঞ্চে এখন 'ক্ষুদিরামের দেশে' নামক নাটক অভিনয় হচ্ছে। গণছায়া নামে একটি সংগঠন সম্প্রতি ক্ষুদিরামের জন্মবার্ষিকী পালন করেছে। সেদিন এক রঙ্গিলা পত্রিকায় দেখলাম, ভারতের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় 'ক্ষুদিরামের ফাঁসি' নামে সিনেমা তৈরির জন্য বাংলাদেশের একজন প্রযোজক কলকাতা সফরে গিয়েছেন। এদিকে গত বছর কলকাতার 'ঋষি বংকিম পরিষদ'-এর লোকেরা যশোরে এসে প্রচারপত্র বিলি করে বলেছে 'বাংলা মা'-কে দ্বিখণ্ডিত থাকতে দেবো না। এক করেই ছাড়ব। দ্বিজাতিতত্ত্ব নেই সুতরাং বর্ডারও আর থাকবে না। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন তাহলে আবার নতুন করে শুরু হয়ে গেল নাকি?'[১৫৩]

হিরো কাহিনির শুরু

যেখানে ১৯০৭ সালে ছিল বাংলা বিভাগবিরোধী আন্দোলনের চরম পর্যায়। ১৯০৭ সালে খোদ লাট সাহেবের গাড়ি বোমার আঘাতে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ওই বছরেই ২৩ ডিসেম্বর ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এলেনকে গুলি করা হয়। এরপর পাদরি হিকেনের ওপর গুলি চলে। ১৯০৮ সালের ১১ এপ্রিল চন্দননগরের মেয়র ভার্দিভ্যালের বাড়িতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বিভিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতার দায়ে মামলা হয় কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে।

কিংসফোর্ড টার্গেট হন সন্ত্রাসীদের। তিনি বদলি হয়ে চলে গেলেন বিহারের মুজাফফরপুর। কিংসফোর্ডকে হত্যা করার দায়িত্ব অর্পিত হলো দুজন কিশোরের ওপর। তারই একজন ক্ষুদিরাম বসু, অপরজন প্রফুল্ল চাকী।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে বোমা ও রিভলবার নিয়ে দুই কিশোর রওনা হলো। মুজাফফরপুর পৌঁছে তারা এক ধর্মশালায় উঠল। ৩০ এপ্রিল তাদের

---

১৫৩. কাজীর দরবার : উপসম্পাদকীয় : দৈনিক ইনকিলাব, ২০ অক্টোবর, ১৯৮৬।

বোমা হামলায় সরকারি কর্মকর্তা কিংসফোর্ডের পরিবর্তে কলকাতার একজন নামকরা ব্যারিস্টার মি. কেনেডির স্ত্রী মিসেস কেনেডি ও তার কন্যার মৃত্যু হলো। নিরীহ দুই গৃহিণী মহিলাকে খুন করে পালাল ক্ষুদিরাম। আত্মহত্যা করল প্রফুল্ল চাকী। পরের দিন ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হলো মুজাফফরপুর থেকে ১৫ মাইল দূরে রেলস্টেশনের কাছে এক বাজারে।

বিচার শুরু হলো ২১ মে। ২৫ মে মুজাফফরপুর বোমা মামলা দায়রা আদালতে পাঠানো হয়। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হয়। হাইকোর্টের বিচারে ফাঁসির হুকুম বহাল থাকে। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট মোজাফফরপুর জেলে তার ফাঁসি কার্যকরী হয়। আড়ালে থেকে যায় এই সন্ত্রাসবাদী দলের মূল নায়কেরা।

তখনকার সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ মন্তব্য করেছেন :

'অনভিজ্ঞতার দরুন ব্যর্থতার ভেতর দিয়া বাংলার বিপ্লববাদীরা তাহাদের আদর্শ রূপায়ণে অগ্রসর হয়। এ কারণে তাহারা পূর্ব বাংলা ও আসামের লে. গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এবং পশ্চিম বঙ্গের লে. গভর্নর স্যার ফ্রেজারকে বোমার আঘাতে হত্যার চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারে নাই। অবশ্য তাহাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় নারায়ণগড় স্টেশনের নিকট পশ্চিম বঙ্গের লে. গভর্নরের ট্রেনের কয়েকখানি বগি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।'[১৫৪]

স্বদেশি সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ও মুসলিম ছাত্রদের মুখে যখন পিঁয়াজের গন্ধ

'স্বদেশি' সন্ত্রাসীদের প্রতি সবচেয়ে জোরালো সমর্থন জোগাল বর্ণহিন্দুদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন। নিরপরাধ দুই নারীকে বোমা মেরে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলল ক্ষুদিরাম। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক বর্ণহিন্দুদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট উত্তপ্ত হলো। তাদের প্রচারণায় নারীহত্যা করে হিরোর মর্যাদা পেল ক্ষুদিরাম। অর্বাচীন কিশোরদের ধর্মীয় উন্মাদনায় মাতিয়ে, তাদের হাত থেকে বই-খাতা কেড়ে নিয়ে সেই হাতে বোমা ও রিভলভার তুলে দিয়েছিলেন যারা, এভাবেই তারা হলেন সফলকাম।

বাংলার শহর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে কিশোর ক্ষুদিরামকে নিয়ে রচিত হলো অসংখ্য গান, কবিতা, যাত্রা, নাটক আর পালাগান। এসবের মধ্যে সবচেয়ে সাড়া জাগানো একটি গান :

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী
মাটির বোমা তৈরি করে

[১৫৪]. আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১।

ফেলেছিলাম গাড়ির পরে
বড় লাটকে মারতে গিয়ে
মারলেম ইংল্যান্ডবাসী।
দশ মাস দশ দিন পরে
জন্ম নেব মাসির ঘরে
চিনতে যদি না পারি মা
দেখবি গলায় ফাঁসি।'

১৯০৯ সাল পর্যন্ত এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা অব্যাহত থাকে। নতুন প্রদেশ রদ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, বারিন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের চেষ্টায় বর্ণহিন্দু লেখক কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের হিন্দু জাতীয়তাবাদমূলক রচনা ও প্রচারণায় এ আন্দোলন সরকারবিরোধিতার সাথে সাথে মুসলিমবিরোধী আন্দোলনের রূপ লাভ করে।

রাখিবন্ধন, কালি মন্দিরে শপথ গ্রহণ, 'বন্দে মাতরম' স্লোগান এবং এমনই অসংখ্য হিন্দু-আচার এই আন্দোলনের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের নিদারুণ অবনতি ঘটানো হয়। সর্বত্র বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা সহপাঠী মুসলিম ছাত্রদের সাথে একত্রে বসতে অস্বীকার করে। তাদের মুখে নাকি পিঁয়াজের গন্ধ! ক্লাসে মুসলিম ছাত্রদের জন্য পৃথক শাখার ব্যবস্থা করতে হয়।[১৫৫]

রবীন্দ্রনাথ, গিরীশ ঘোষ, ডি এল রায় ও মুকুন্দ দাসদের ভূমিকা

'বঙ্গভঙ্গ'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তথাকথিত 'স্বদেশি' আন্দোলনের সাথে যুক্ত তখনকার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পর্ক তুলে ধরে নিতাইদাস লিখেছেন :

'বর্তমান শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বদেশি আন্দোলনকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে আলোড়িত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ (১৮৬১-১৯৪১) অনেক কবি-সাহিত্যিকই এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন এবং আন্দোলনের পক্ষে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কবিতা, গান ও নাটকের মধ্য দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের স্রোতধারা বেগবান হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের ধারায় সৃষ্ট সাহিত্য ব্যাপক-সংখ্যক গণমানুষকে নাড়া দিয়েছিল যা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর ঘটেনি।

...স্বদেশি আন্দোলনের তীব্রতার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্রা', 'কল্পনা' ও 'নৈবেদ্য'-এর নির্বাচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশ করেন 'স্বদেশ' (১৩১২) কাব্যগ্রন্থ। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কবি যেভাবে সাময়িক উত্তেজনার দ্বারা আলোড়িত

১৫৫. নিরোদচন্দ্র চৌধুরী : অটোবায়োগ্রাফি অব এন আননোন ইন্ডিয়ান, পৃষ্ঠা ২৩৭।

হয়েছিলেন তার ছাপ এই কাব্যে বর্তমান। আন্দোলনের ফসল হিসেবে তাঁর গান নিয়ে প্রকাশিত হয় 'বাউল' (১৩১২) ও 'গান' (১৩১৫)। এই সময়ে লেখা গানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে...', 'সার্থক জনম আমার...', 'আমার সোনার বাংলা...', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' ও 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে...' প্রভৃতি।

...এই সময়ে লেখা গিরীশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) 'ছত্রপতি শিবাজি' (১৩১৪) ও 'স্বদেশি গান' এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) কাব্য 'আলেখ্য' (১৯০৭), নাটক 'প্রতাপ সিংহ' (১৩১২), দুর্গাদাসের (১৩১৩), 'মেবার পতন' (১৩১৫), ও গান 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা...', 'বঙ্গ আমার জননী আমার...' প্রভৃতি দেশবাসীকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। স্বদেশি আন্দোলনের ধারায় আরও কয়েকজন সাহিত্যসাধক হচ্ছেন অমৃত লাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) প্রমুখ।

...সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা চরম আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাদেরকে নিয়েও অনেকে সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। এই ধারায় সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'পথের দাবি', মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' ইত্যাদি।'[১৫৬]

'স্বদেশি যাত্রা' ও 'বন্দে মাতরম'

কংগ্রেসপন্থি ভারতীয় গবেষক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, বাংলা-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের সময় বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস অশ্বিনী কুমারের সাথে সাথে থাকতেন এবং 'স্বদেশি যাত্রা'র প্রবর্তক হিসেবে এ সময় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতার *বসুমতি সাহিত্য মন্দির* পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুকুন্দ দাস গ্রন্থাবলি'তে উল্লেখ করা হয়েছে :

'বরিশালের উপকণ্ঠে কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার সকল স্বপ্ন, সকল সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সংগঠন সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 'আনন্দ আশ্রম'। ...'মাতৃপূজা' তাহার প্রথম প্রকাশ্য যাত্রাভিনয়।'

পূর্ব বাংলা ও আসাম-প্রদেশ-বিরোধী আন্দোলনের সামসময়িক অন্যান্য যাত্রাগানেও সকলেই 'বন্দে মাতরম'-এর জয়গান গেয়েছেন এবং সনাতন হিন্দুধর্মের প্রশস্তির লক্ষ্যে বীর পূজা চালু করেছেন। এর মধ্যে মথুর সাহার 'পদ্মিণী ও ভরতপুরের 'দূর্গজয়', ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা', শশী অধিকারীর 'প্রতাপাদিত্য', ভূপেন নারায়ণ রায়ের 'রামলীলাবসান', 'মনিপুরের গৌরব',

---

১৫৬. নিতাই দাস : পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা; বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১১-১২।

'মনোজয়ের মহামুক্তি', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রনজিত রাজার জীবযজ্ঞ' উল্লেখযোগ্য।

ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন-প্রদেশ-বিরোধী আন্দোলনে আগাগোড়াই লক্ষণীয় বিষয় হলো বর্ণহিন্দু নেতাদের সাংস্কৃতিক প্রেরণা। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক বক্তব্যের চাইতেও সাংস্কৃতিক বিবেচনা বরাবর প্রাধান্য পেয়েছে। এ আন্দোলনের যা কিছু অর্জন, তা এসেছে এই পথেই। আর তাদের এই সংস্কৃতির বাতাবরণ ও অন্তরাত্মা পুরোপুরি হিন্দু।

এ সময়ের হিন্দু-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির সাম্প্রদায়িক চেহারা সম্পর্কে ১৯০৮ সালে মুসলিম লিগের অমৃতসর অধিবেশনে সৈয়দ আলী ইমাম সভাপতির ভাষণে বলেন :

'I can not say what you think, but when I find the most advanced province of India put forward the sectarian cry of 'Bande Mataram' as the national cry, and the sectarian Rakhibandhan as a national observance, my heart is filled with despair and disappointment; and the suspision that under the cloak of nationalism, Hindu nationalism is preached in India, becomes a conviction.'[১৫৭]

[১৫৭]. Sharifuddin Pirzada : Foundation of Pakistan, Vol-1, P-51.